হে বিজয়ী বীর

[উপন্যাস]

বুদ্ধদেব বসু

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

রচনা কাল ১৯৩৩
নূতন সংস্করণ ১৯৫৩
তিন টাকা আট আনা

মুদ্রাকর : শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি. এ.
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬
প্রচ্ছদসজ্জা : অজিত গুপ্ত

প্রথম পরিচ্ছেদ : নীলবন	.	.	১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : গাড়ি	.	.	১৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদ . অপব্যয়	.	.	২৯
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : অন্ধকারে আলাপ	.	.	৪৫
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : প্রদর্শনীতে এক সন্ধ্যা	.	.	৫৮
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : রোজালিণ্ড	.	.	৭৫
সপ্তম পরিচ্ছেদ : বিপ্লব	.	.	৯৫
অষ্টম পরিচ্ছেদ . সকাল ও সন্ধ্যা	.	.	১১২
নবম পরিচ্ছেদ : রীতিমতো বিয়ে	.	.	১৪৭
দশম পরিচ্ছেদ : পারিবারিক	.	.	১৮৮
একাদশ পরিচ্ছেদ : পরিপূর্ণতা	.	.	২০৫
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : উপসংহার	.	.	২১৪

এক

নীলবন

এককালে এখানে ছিলো বন—জাম আর কাঁঠালে আর মাদারে গা-ঘেঁষাঘেঁষি, প্রকাণ্ড অশথ বাতাসে মর্মরিত—তার ডালের খোপে-খাপে বাসা বেঁধেছে শকুন-পরিবার, আকাশের দিকে মাথা-উঁচোনো তাল—সন্ধ্যার আবছায়ায় হঠাৎ ভূতের মতো দেখতে: সন্ধ্যার পর অন্ধকার থমথম করতো সেখানে, গাছের সবুজে নিবিড় সেই বনে; গাছের ফাঁকে-ফাঁকে আঁকাবাঁকা সরু রাস্তা বিসর্পিত—দু-ধারে তার লম্বা ধারালো ঘাস—সেখান দিয়ে সকালবেলায় গ্রাম থেকে ব্যাপারিরা আসতো শহরের দিকে, বাজারে নিয়ে যেতো তরকারি বেচতে, আর দুধ আর ফল, পাড়া-গেঁয়ে ভাষায় কথা বলতে-বলতে, কাঠবিড়ালিকে চমকে দিয়ে; হলদে রঙের ছোটো পাখি লাফাতে-লাফাতে যেতো তাদের সঙ্গে-সঙ্গে—ফিরে যখন যেতো, সূর্য তখন মধ্য আকাশে, কি হেলে পড়েছে একটু পশ্চিমে, গাছগুলো রোদে শ্রান্ত, পাখিরা নীরব—আর তারপরে আর সন্ধে পর্যন্ত মানুষের পা সেখানে পড়তো না, রাত্রি নামতো গম্ভীর, তারাময়: কোনো সন্ধ্যায় এক দুঃসাহসী ছোটো ছেলে হয়তো খেলার মাঠ থেকে আসতো তার প্রান্তে, রমনার ধূসর, নির্জন রাস্তা দিয়ে, ধূসর সন্ধ্যায়, কাছে এসে আর ঢুকতে সাহস হ'তো না, চেয়ে দেখতো, দূরে সব রাস্তায় জ্ব'লে উঠেছে ইলেকট্রিকের আলো, কিন্তু সেখানে ছায়া নিবিড়, সে-রাস্তায় আলো নেই; অন্ধকার রাস্তায় বাজতো তার দ্রুত পায়ের শব্দ, দ্রুত তার

হে বিজয়ী বীর

হৃৎপিণ্ড—দু-দিকে শুধু ফাঁকা মাঠ সন্ধ্যার ম্লান আকাশের নিচে—রুদ্ধ-শ্বাসে কয়েক মিনিট হেঁটে ডাকবাংলোর কাছে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতো, যেখানে রাস্তায় আলো, আর লোকজন আর কথাবার্তা—খেলার মাঠে ছেলেদের ভিড় তখনো হয়তো একেবারে ভাঙেনি, কেউ-কেউ চা খাচ্ছে মাঠের মাঝখানে বটগাছের নিচে বেঞ্চিতে ব'সে, গনি মিঞার দোকানে—যেখানে ব'সে সেই বন দেখা যায় একটা নীল রঙের পোঁচ—আরো একটু এগিয়ে রেল-লাইনের লেভেল ক্রসিং—গেটটা এখন আবার বন্ধ না থাকলে হয়, বাড়ি ফিরতে এমনিই দেরি হ'য়ে যাবে : সেখানে রমনার সীমানা, তার দক্ষিণেই আরম্ভ পুরোনো শহর, দাঁত-বার-করা রাস্তা, রাস্তায় একটা মিশোল গন্ধ—সেখানে দাঁড়িয়ে সেই বন দেখা যায় একটা নীল রহস্য—তা যেন অনেক দূরের, তা যেন অন্য-কোনো জগতের—নীল অঞ্জন লাগতো শহুরে লোকদের ক্লান্ত চোখে, দুরাশা দোলা দিয়ে যেতো ছোটো ছেলের মন—সেই নীলবন, যেন বেড়া দিয়ে রেখেছে শহরকে কোনো বিস্ময় থেকে, আড়াল ক'রে রেখেছে কোনো আশ্চর্য আবিষ্কার—লোকের মুখ থেকে মুখে তার নাম ঘোরাঘুরি হ'লো নীলবন, হ'তে-হ'তে তার উপর পড়লো গণ-অনুমোদনের ছাপ, সেটা গেলো চলতি হ'য়ে।

এখনো তার নাম নীলবন। যদিও এখন আর বনের কোনো চিহ্ন নেই, এক প্রান্তে পাশাপাশি দাঁড়ানো দুটো অশথ গাছ ছাড়া, পাড়ার প্রহরী-দৈত্যের মতো, আর পশ্চিম কোণ ঘেঁষে মুদি-দোকানের পাশে একটা তালগাছ, যে এখনো ইঙ্গিত করে আকাশের তারার দিকে, বনের স্মৃতিকে। পদ্মার ভাঙনে পূর্ববঙ্গের অনেক লোকের বাড়ি গেলো ভেসে,

নীলবন

তারা এসে ভিড় করলে শহরে, শহর বাড়লো। কেটে ফেলা হ'লো বন, সমস্ত জায়গাটাকে টুকরো-টুকরো ক'রে সরকার শস্তায় দিতে চাইলে তার চাকুরেদের : পেন্সন-নেয়া কি নেবো-নেবো ডিপটি-মুনসেফরা সে সুযোগ ছাড়লেন না—এক মাসের মধ্যে সব প্লট বিক্রি হ'য়ে গেলো। উঠলো বাড়ি, তৈরি হ'লো রাস্তা, বসলো জলের কল আর ইলেকট্রিসিটির তার : অন্ধকার বড়ো রাস্তায় একদিন আলো জ্ব'লে উঠলো—বিকেলে সেখানে মেয়ে-পুরুষের—মেয়েরই বেশি—ভিড। দেখতে-দেখতে—বছর পাঁচেকের মধ্যে, নীলবন হ'য়ে উঠলো উঁচুদরের, প্রায় বড়োলোকি এক পাড়া—সব সুদ্ধু খান পঁচিশ বাড়ি, তাদের জানলায় ঝুলছে শৌখিন ছিটের পরদা, রাস্তা থেকে বসবার ঘরের সোফার ফুল-আঁকা অ্যান্টিমাকাসারের আভাস পাওয়া যায় কখনো বা, কারো-কারো সামনে একটু ফুলের বাগান, সেখানে সকালবেলায় কোনো মেয়ে হয়তো বই নিয়ে পাইচারি করে, নেহাৎই শোভনতার খাতিরে. সন্ধের সময় গাড়ি এসে দাঁড়ায় এখানে-ওখানে, চায়ের পেয়ালা টুংটাং করে, বাজে গ্রামোফোন। শহরের উত্তর প্রান্তে এই পাড়া—কোনো বড়ো গোছের চাকুরে বদলি হ'য়ে এসে প্রথম সেখানেই বাড়ি খোঁজে, তার এমন একটা রেসপেকটেবল ভাব। সমস্ত পাড়ায় নিরেট মধ্যবিত্ততার, প্রাদেশিক কেতাদুরস্তপনার ছাপ : বাড়িগুলোর চেহারা দেখেই মনে হয় যে তাদের কর্তারা বিকেলে একত্র হ'য়ে ইনভেস্টমেণ্ট আলাপ করেন, আর গিন্নিরা হিশেবের খাতা না-মিলিয়ে কখনো শুতে যান না, আর মেয়েরা ব্লাউজের হাতা আরো আধ ইঞ্চি তোলবার জন্য তাকিয়ে থাকে কলকাতার মুখের দিকে, আর দু-একবার পীড়াপীড়ির পর গাইতে পারে—এবং গেয়ে থাকে—

হে বিজয়ী বীর

'নটরাজে'র কোনো-না-কোনো গান—এমনকি, তাদের ছোটো বোনেরা হয়তো, কিছুই বলা যায় না, নাচতেও পারে। আরামের, আত্ম-পরিতৃপ্ত স্বাচ্ছন্দ্যের আবহাওয়া—তার চেয়েও বেশি ভারি ওজনের, ইংরিজিতে যাকে বলে সলিডিটি। ভারি ওজন, লম্বা ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউণ্ট—ছোটোখাটো, নিশ্ছিদ্র এক চক্র, তার মধ্যে সবাই বন্দী, তার মধ্যে অন্ধ।

বড়োরাস্তা থেকে নীলবনে ঢুকেই প্রথম দক্ষিণ-মুখো যে-দোতলা বাড়ি, তার নিচের ঘরে, শ্রাবণ মাসের এক সকালবেলায়, এক যুবক ব'সে ছিলো। তার সামনে একটি সেক্রেটারিয়েট টেবিল, তার উপর কালো মলাটের, পাঠ্য-বই চেহারার এক মোটা বই খোলা। পাশে প'ড়ে আছে একটা লাল-নীল পেন্সিল। যুবকটির ডান-হাতি গোটা দুই বুক-কেস বইয়ে ঠাশা, বাঁ দিকে গোল একটি টিপয়ের উপরে ফুলদানিতে এক গুচ্ছ বাসি রজনীগন্ধা। ঘরটি রাস্তার দিকে: পুবের জানলা দিয়ে মেঘ-ছেঁড়া তীব্র রোদ ভিতরে এসে পড়ছে। দক্ষিণের জানলার ধারে চামড়ায় মোড়া একটি কাউচ, তার পাশে আর-একটি টিপয়ে গোটাকয়েক মাসিকপত্র সযত্নে পর-পর সাজানো। সমস্ত ঘরটিতে একটু বিশৃঙ্খলা নেই। ঝকঝক করছে লাল সিমেণ্টের মেঝে; আসবাবপত্রের কালো বার্নিশে ঠিকরে পড়ছে আলো।

যুবকটির বয়স বাইশের বেশি হবে না, কিন্তু যে-ভাবে সে বসেছে, যে-ভাবে সে মাঝে-মাঝে তাকাচ্ছে চোখ তুলে, তা থেকেই বোঝা যায় যে সে-ই বাড়ির কর্তা। দ্রুত, কালো তার চোখ, চশমাও তা একেবারে নষ্ট ক'রে দিতে পারেনি; ম্লান আর সুন্দর তার মুখ। অত্যন্ত ছোটো তার মাথার চুলের সঙ্গে সে-ম্লানতা ঠিক মানাচ্ছে না:

ও-রকম রঙের সঙ্গে বড়ো বড়ো কালো চুল—একটু শেলি-ভাব। বস্তুত, ছোটো চুলে তার মুখশ্রী অনেকটা চাপা প'ড়ে গিয়েছিলো। আশ্চর্য মনে হ'তে পারে, শেলি-ছাঁচের যার মুখ, সে অমন পালোয়ানি চুল রাখবে। কিন্তু মাস দুই হ'লো তার পিতৃবিয়োগ হয়েছে: শ্রাদ্ধের পরে তার চুল এটুকুর বেশি বাড়তে পারেনি। তার বাবা ছিলেন সব-জজ—এমন বাবা কারো হয় না, তাঁর মৃত্যুর পরে, এক দুর্বল মুহূর্তে যুবকটি ভেবেছিলো। তখনকার মতো, সে তাতে প্রায় বিশ্বাস করেছিলো। বাবার মৃত্যু লেগেছিলো তার মনে; সে, এমনকি, একটু কেঁদেছিলো। তার মা এখনো মাঝে-মাঝে কাঁদেন—বেচারা! ব্যাপারটা ঘটেছিলো একটু হঠাৎ—তারা কেউ প্রস্তুত ছিলো না। আর, ব্যাপারটা কী হচ্ছে, তা ভালো ক'রে উপলব্ধি না-করতেই সে হঠাৎ দেখতে পেলো নিজের অন্য-এক চেহারা, এক রূপান্তর। হঠাৎ নিজেকে দেখতে পেলো, এই বাড়ির, ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের হাজার পঞ্চাশেক টাকার—তাছাড়া কোম্পানির কাগজের, এটা-ওটা শেয়ারের সে-ই মালিক। তার আর ভাই ছিলো না—বোনেদের বিয়ে হ'য়ে গেছে। সে ভেবে অবাক হ'লো, এক জীবনের উপার্জনে তার বাবা কী ক'রে এত রেখে যেতে পারলেন। বাবার প্রতি তার শ্রদ্ধা বেড়ে গেলো।

তার নতুন সংজ্ঞার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে তার কিছু সময় লাগলো, কিন্তু খুব বেশি নয়। কয়েকদিনের মধ্যেই সে ফুটে উঠলো, সে হ'য়ে উঠলো। বড়ো অল্প সময়ে, বাইরের কোনো দর্শকের মনে হ'তে পারতো। এতদিন সে ছেলেমানুষ ছিলো, এই সেদিনও

হে বিজয়ী বীর

ছেলেমানুষ ছিলো। তার বাবা তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করবেনই, যেন সে ছেলেমানুষ। মনে-মনে সে ক্ষুণ্ণ হ'তো, বিরক্ত হ'তো, কিন্তু বাইরে বিদ্রোহ করতে সাহস পেতো না। বিদ্রোহ করা তার স্বভাবই নয়। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে বিরোধ তার পক্ষে অসহ্য: সে বরং হার মানবে। বাবার কাছে সে বিনীত হ'য়ে থাকতো, ছোটো হ'য়ে। তিনি ছিলেন কড়া মেজাজের লোক; অনেক সময় অবিচার, অন্যায় সইতে হ'তো। সইতো। তারপর হঠাৎ, যেন কোনো জাদুতে, সে বড়ো হ'য়ে উঠলো। তার চারদিকে মুক্তি: নিজের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে সে ছড়িয়ে গেছে সবখানে। সবখানে। ওঃ, মুক্ত হওয়া, নিজের উপর সম্পূর্ণ দখল পাওয়া—তা মস্ত জিনিশ। এতদিন সে ছিলো রঞ্জন, কেবলি রঞ্জন, যার ভাবনা ভাববে অন্য লোকে, যাকে যত্ন করবে অন্য সবাই; সাবধানী যত্নের বেড়া দিয়ে ঘেরা, নিরাপদ নিশ্চিন্ততায় যে থাকবে। তার নিজের কোনো ইচ্ছে নেই, তার নিজের কিছু করবার নেই। আর এখন সে তার নিজের সত্তা, তার আছে নিজস্ব একটা কেন্দ্র, নিজস্ব গতি-পরিধি। সে সম্পূর্ণ, সে স্বাধীন। এ যেন আর-একবার জন্মাবার মতো। সেই ছেলেমানুষ-রঞ্জন—সে কি কখনো ছিলো? ভালো ক'রে মনে করতে পারে না। তাকে সে ত্যাগ করলে অতি সহজে, ছেড়ে ফেললে তাকে পুরোনো কাপড়ের মতো, ছাড়িয়ে উঠলো তাকে ফল যেমন ক'রে ফুলকে ছাড়িয়ে ওঠে—, শুধু আকারে নয়, প্রকৃতিতে। সাবালকত্বে, স্বয়ম্প্রতিষ্ঠ পৌরুষে তার এই পরিবর্তন একটু আকস্মিক, একটু কঠিন। তা যেন তার মুখের নরম রেখাগুলোকেও একটু কঠিন ক'রে দিয়ে গেছে, যে তাকে বরাবর

দেখে আসছে, তার কাছে তা-ই মনে হ'তে পারতো। তার সমস্ত ধরন-ধারন যেন বদলে গেছে; এমনকি, তার কণ্ঠস্বর—তাও যেন একটু গম্ভীর হ'য়ে উঠেছে, একটু বেশি মসৃণ। চিরকাল সে একটু মৃদু স্বরে কথা কইতো; কিন্তু সেই মৃদু স্বরে লাগলো এক নতুন ঝংকার—তাতে যেন শক্তির চেতনা, আকাঙ্ক্ষার, অধিকারের শক্তির।

রঞ্জন রায় এম. এ. পড়ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে। বরাবরই সে চৌকশ ছাত্র, জলপানি পেয়ে এসেছে বরাবর। বাংলাদেশে সেই ছেলেরই জয়, পরীক্ষায় যে ভালো পাশ করতে পারে। রঞ্জনকে তার অগুনতি আত্মীয়রা, তার প্রতিবেশীরা—সবাই খাতির করতো। তার বাবারও মনে-মনে একটু গর্ব ছিলো ছেলেকে নিয়ে। কিন্তু সে নিজে যেন তার কৃতিত্ব থেকে কোনো সুখ পেতো না। সে পরিশ্রম করতো কর্তব্য-বোধের খাতিরে, অন্য-সবাই খুশি হবে ব'লে, অন্য সবাই তার কাছ থেকে যা আশা করে, তা করবার জন্যে। এটা তার জীবনের একটা অংশ: সে যে পরীক্ষায় ভালো পাশ ক'রে যাবে, এটাই নিয়ম। এ-নিয়মের ব্যতিক্রম করবার অধিকার তার নেই। নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধা ছিলো তার মজ্জাগত; ছেলেবেলায় সে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের আত্ম-জীবনী পড়েছিলো। তার জীবনকে সে ফেলেছিলো নিয়মের কঠিন ছাঁচে; সে কখনো উদ্দাম হয়নি—না, প্রথম যৌবনেও না—কখনো ঝোঁকেনি উচ্ছৃঙ্খলতার দিকে। নানা কর্তব্য আর আমোদের মধ্যে সে সব সময় বজায় রেখে এসেছে নিখুঁত ব্যালেন্স; নিজেকে সে ভাগ ক'রে নিয়েছিলো বিভিন্ন খোপে, একটার সঙ্গে আর-একটার কখনো ছোঁয়াছুঁয়ি হয় না। তার মাথা সব সময় ঠাণ্ডা—বড়ো বেশি ঠাণ্ডা, অনেকের মনে হ'তে পারতো।

হে বিজয়ী বীর

তার চরিত্রের অনেকগুলো দিক ছিলো : বন্ধুদের মধ্যে তার খ্যাতি ছিলো রসিক ব'লে, তার একটা গোপন ভালোবাসা ছিলো কবিতার প্রতি, নিজেও মাঝে-মাঝে লিখতো টুংটাং ছন্দের মিষ্টি পদ্য, এবং সে একবার প্রেমেও পড়েছিলো, স্বপ্নময়, আত্মময়, কিশোর প্রেমে—আর পরে, বয়স যখন একটু বাড়লো, মেয়েদের সম্বন্ধে সে দু-একটা জিনিশ জানতে আরম্ভ করলো। কিন্তু কোনো জিনিশ কখনো তাকে উতলা করতো না—কখনো কোনো সংঘাত ছিলো না তার মনে, কোনো বিক্ষোভ ; স্বচ্ছন্দ, যন্ত্র-মসৃণতায় দিনের পর দিন কেটে যেতো তার জীবন।

রঞ্জন একখানা বই পড়ছিলো behaviourism-এর উপর। তার গণিতে মাথা ছিলো, কিন্তু বি. এ.-তে অনার্স নেবার সময় সে শখ ক'রে নিয়ে ফেলেছিলো দর্শনশাস্ত্র—যা আজকালকার ছাত্ররা ঘোর সেকেলে ব'লে অবজ্ঞা করে। কিন্তু রঞ্জনের মনকে তা আকর্ষণ করেছিলো—তা তার মনে হয়েছিলো এমন গভীর, গম্ভীর—এমন শান্ত, ভাব-নিবিড় তার আবহাওয়া। আত্মীয়রা ছি করেছিলো—ও ছাইভস্ম প'ড়ে কী হবে, কোনো কাজেই তা লাগবে না ; কিন্তু তার বাবা—ছাত্রাবস্থায় তিনি বেণ্টাম আর কাণ্ট পড়েছিলেন, সেকালের প্রেসিডেন্সি কলেজের দারুণ নাস্তিকদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন—তার বাবা খুশি হয়েছিলেন। বিষয়টি তার লেগেছিলো ভালো : পরীক্ষায় সে ভালো ফার্স্ট ক্লাশ নিয়ে উৎরেছিলো। তার গণিত-ঘেঁষা মনের পক্ষপাত ছিলো অ্যাবসট্র্যাকশনের দিকে, বিশুদ্ধ মননক্রিয়ার দিকে। দর্শনশাস্ত্র মানুষের কোনো কাজে লাগে না ব'লেই তা তার মনে হয়েছিলো মানুষের চিত্তপ্রকর্ষের উচ্চতম প্রকাশ। কোনো ব্যবহারে এ কলঙ্কিত নয়, সাধারণ জীবনের উপর

কোনো প্রয়োগ একে ভালগার করে নি। তা যথেষ্ট দূর, যথেষ্ট বিচ্ছিন্ন : তার স্থান বিশুদ্ধ কল্পনার রাজ্যে, যেখানে মানুষের জ্ঞানের গূঢ়তম উৎস।

রঞ্জন মনে-মনে ভাবছিলো যে যদি কোনো শিশুর মুখে সন্দেশ গুঁজে দেবার সঙ্গে-সঙ্গে তার কানের কাছে বিদঘুটে আওয়াজ করা হয়—যদি যথেষ্ট বার এ-রকম করা হয়, যদি বিদঘুটে আওয়াজের সঙ্গত ছাড়া সে কখনো সন্দেশের স্বাদ জানতেই না পারে, তাহ'লে বড়ো হ'য়ে সে সন্দেশ দেখলেই আঁৎকে উঠবে, এমনকি, মিষ্টি স্বাদের উপরই তার একটা মজ্জাগত ভীতি বর্তাতে পারে। কথাটা ভেবে তার একটু মজা লাগলো। আশ্চর্য—যা-কিছু আমরা অভ্রান্ত ব'লে জানি, মেনে নিই একটু চিন্তা না-ক'রে, যা-কিছু আমরা ধ'রে নিই, সবই, এঁরা বলছেন, দীর্ঘ অভ্যেসের ফল মাত্র ; অভ্যেস যদি বদলানো যায়, তার ফলও অন্য রকম হবে। কিন্তু এঁরা যতটা বলছেন, ততটাই কি সত্যি ? ধরা যাক, কোনো মানুষকে কি এমনভাবে 'কণ্ডিশন' করা যায়, যাতে ভালো গান শুনলেই সে খুন কি আত্মহত্যা করতে চাইবে ? আরো ধরা যাক, সে-লোক যদি জ'ন্মে থাকে সংগীতের প্রতিভা নিয়ে ? এ-সব নিয়ে যেটুকু পরীক্ষা হয়েছে, তা সামান্য। এর চেয়ে মজার পরীক্ষা আর কী হ'তে পারে—মানুষের মন নিয়ে এই কৌতূহল, দেখি না কী হয় —ব্যাঙের আর টিকটিকির আর পোকা-মাকড়ের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে-কেটে জোড়াতালি লাগানোর চাইতে ঢের, ঢের বেশি মজার। আপসোস শুধু এই যে তেমন বিস্তৃতভাবে পরীক্ষা করা এখন পর্যন্ত সম্ভব হচ্ছে না। রঞ্জনের মন ছড়িয়ে যাচ্ছিলো ; বই থেকে চোখ তুলে সে তাকালো তার সামনে। দরজার পরদাটা হাওয়ায় ঈষৎ

হে বিজয়ী বীর

নড়ছে : দক্ষিণের জানলা দিয়ে তার চোখ গিয়ে পড়লো তাদের বাগানে, এক গুচ্ছ লাল গোলাপের উপর—তা পার হ'য়ে বড়ো রাস্তার দু-ধারে প্রসারিত রোদে-ঝলমল সবুজ মাঠে, চ'লে গেলো, অবাধ, দূরের অস্পষ্ট রেল-রাস্তা পর্যন্ত। সামনে তার কোনো বাড়ি নেই, সমস্ত পল্টনের মাঠ তার দৃষ্টির অন্তর্গত। রঞ্জন জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকতে ভালোবাসতো—এত শান্ত, যেন কোনো নিহিত শক্তিতে ভরা, ছবির মতো শান্ত-সুন্দর। অশথের পাতাগুলো ঝিরঝির করছে হাওয়ায়, ঘাসের ডগাগুলো যেন খাড়া হ'য়ে সূর্যের আলো ভ'রে নিচ্ছে শরীরের কোষে-কোষে। আত্ম-বিস্মৃত, রঞ্জন তাকিয়ে রইলো। আমরা যে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাতে ভালোবাসি, এ শুধু মানব-জাতির বহুশতাব্দী-ব্যাপী কোনো অভ্যেসের ফল কিনা, তাতে আর কিছু এসে যায় না। কিছু এসে যায় না, এমন ভাবে মানুষকে তৈরি করা যায় কি না যায়, যাতে সে ফুল দেখলে শিউরে উঠবে। এখনকার মতো, সে-সব কোনো কথা ওঠেই না। জানলার বাইরে আছে এই ছবি : কোনো কথা চলে না তার উপর। দূর থেকে ফিরে এসে রঞ্জনের চোখ আবার তাদের বাগানের লাল গোলাপের উপর পড়লো। বাগানের রাস্তায়, গোলাপ গাছের পাশ দিয়ে এক বিধবা মহিলা আস্তে-আস্তে এগিয়ে আসছেন, একটি যুবতী তাঁর সঙ্গে। কেউ এলো। অসহ্য কোনো স্ত্রীলোক বোধহয়, রঞ্জন ভাবলে, তার মা-কে সান্ত্বনা দিতে এসেছে। সান্ত্বনা তারা দেবেই—এখনো মাঝে-মাঝে দু-একজন আসে। তারা আসবেই, তার মা-কে আবার কাঁদাতে—এই কান্না-খাদক প্রেতেরা। ওঃ, মৃত্যুর চেয়েও এ খারাপ, মৃত্যুর চেয়েও। তার বাবা না-মরলেই ভালো হ'তো—রঞ্জন প্রায় তা-ই ভাবলে মনে-মনে।

নীলবন

স্ত্রীলোক দু-জন, এদিকে, বাগান পার হ'য়ে যাচ্ছে বাড়ির দিকে। যুবতীটি হঠাৎ একবার মুখ ফিরিয়ে তাকালো—রঞ্জন তাকে দেখে নিলে এক ঝলকে। মুখখানা মন্দ নয়। কিন্তু তার চলন অনিশ্চিত, অসমান: আর অমন বিশ্রী পাড়ের শাড়ি কি পরতেই হবে, রঞ্জন ভাবলে।

তারা অদৃশ্য হ'লো। রঞ্জন আবার চেষ্টা করলে বইয়ে মন দিতে। সে টের পেলো, তার ঘরের সঙ্গে যে-ছোটো বারান্দা, সেখানে তার মা বসেছেন আগন্তুকদের নিয়ে। কথাবার্তা হচ্ছে নিম্নস্বরে: রঞ্জনের কানে আসছে শুধু অস্ফুট স্ত্রীকণ্ঠ। মাঝখানকার পরদাটা মাঝে মাঝে একটু উড়ছে; হঠাৎ তার চোখে পড়ছে মেয়েটির মস্ত খোঁপা আর গ্রীবার একটু রেখা। এরা কা'রা? সে মনে করতে পারলে না এদের আগে কখনো দেখেছে ব'লে।

কাটলো খানিকক্ষণ। আস্তে-আস্তে আলাপের স্বর চড়ছিলো। অলসভাবে, শূন্য মনে সে শুনলো। শেষটায় একটা কথা স্পষ্ট হ'য়ে এলো তার কানে। তার মা বলছেন: 'আমি কী করতে পারি? আপনি আমার কাছে কেন এসেছেন, বুঝতে পারছি না।'

উত্তর হ'লো—নিশ্চয়ই বিধবা মহিলাটি বলছেন—'আমি ভেবেছিলাম—' শেষের দিকটা অস্পষ্টতায় মিলিয়ে গেলো।

'ও-সব ভেবেছিলেন, সে তো আর আমার দোষ নয়। এই সেদিন এমন সাংঘাতিক শোক পেলাম, সাংঘাতিক…' রঞ্জনের মা-র গলা ধ'রে এলো।

'সে তো…'

হে বিজয়ী বীর

'নিজেই দুঃখে-কষ্টে ম'রে আছি, এর মধ্যে আপনি এসেছেন…'

'আপনারা জ্ঞাতি, ঈশ্বর আপনাদের অজস্র দিয়েছেন…'

'অজস্র! পরের টাকা কি কেউ কম দ্যাখে—'

'বড় দুঃখে প'ড়েই…'

'দুঃখ আমারও। কে কার জন্য কী করতে পারে আজকালকার দিনে।'

একটু চুপচাপ। তার মা-র বিরুদ্ধে একটা মূক ক্ষোভ জ'মে উঠছিলো রঞ্জনের মনে, অন্ধ একটা রাগ। কী নির্বোধ তাঁর কথাবার্তা, নির্বুদ্ধিতায় কী নিষ্ঠুর। সে যেন দেখতে পেলো পরদার ওপাশে মা আর মেয়েকে, নীরব—প্রত্যাখ্যাত, অপমানিত। অনুভব করলে তাদের হৃদয়ের তিক্ততা—ধারালো, ক্ষয়কারী, তীব্র বিষের মতো। সে-তীব্র বিষে পুড়ে যাচ্ছে তাদের মন, যেন আগুনে। ওঃ, কিছু চাইতে হবার অবমাননা! আর এই প্রত্যাখ্যান—প্রত্যাখ্যান যে করে, এতে তারই তো লজ্জা, তারই অপমান। কেননা, যাকে চাইতে হয়, তার চরম আত্ম-যন্ত্রণা তো সেখানেই: তার বেশি, তার চেয়ে খারাপ আর কী হ'তে পারে। প্রত্যাখ্যান যে করে, সে-ই তো ক্ষত সৃষ্টি করে তার নিজের অঙ্গে।

'না-জেনে ভুল করেছিলাম…' রঞ্জন যথাসাধ্য চেষ্টা করলে কথার বাকি অংশটা শুনতে, পারলে না।

'…………..,' তার মা গতানুগতিক কিছু-একটা বললেন।

'কিছু মনে করবেন না।'

এখনো, রঞ্জন ভাবলে, এখনো সময় আছে। এখনো সেই ক্ষতমুখ

সারানো যায়, যদি তার মা ইচ্ছে করেন। নিজের মধ্যে এই ভাঙা জোড়া লাগানো যায় এখনো। কেন লোকের কঠিন মনে হয় না নিজেকে এ-রকম ঘা দেয়া। না, দয়া নয়। দয়ায় মানুষ বাঁচে না। দয়া—তা স্বর্গ থেকে শিশিরের মতো ঝ'রে পড়ে না ; তা তৃষ্ণা-শুষ্ক মুখের উপর কোনো তিক্ত, রুক্ষ পানীয়ের মতো—তা প্রাণ বাঁচায়, শুধু প্রাণকে বিনাশ করবার জন্য। না, দয়া নয়। দয়া যে করে, গ্রহীতার সঙ্গে-সঙ্গে সে-ও ছোটো হয় : দীনতার উপর দীনতার পুঞ্জ। তা-ও মনকে পাথর করে, ঘৃণারই মতো। কিন্তু পাথর সরিয়ে নেয়া দরকার, পাথর ভেঙে ফেলা দরকার : একটা সংস্পর্শ, নিজের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা ; যেন একটা বিদ্যুৎ-স্রোতের গতি-চক্র সম্পূর্ণ হ'লো : সম্পূর্ণতা। কী ক'রে মানুষ তা না-খুঁজে পারে, কী ক'রে মানুষ নিজেকে এমন শক্ত, অন্ধ ক'রে তুলতে পারে, এত আত্ম-বঞ্চনা কী ক'রে সহ্য হয় ?

শাড়ির খশখশানি শোনা গেলো : তা'রা উঠছে। একটু পরে রঞ্জন আবার তাদের দেখতে পেলো তার বাগানের রাস্তায়—মা আর মেয়েকে। আনত তাদের মাথা, শাদা তাদের মুখ : যেন কোনো শারীরিক আঘাতে তাদের প্রাণ নিষ্কাশিত। তবু তাদের যেতে হবে, এগিয়ে যেতেই হবে, যান্ত্রিক, মন্থর পা ফেলে। রঞ্জন তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে আনলে। তার মা নিশ্চয়ই ফিরে গেছেন তাঁর ঘরে। সে উঠে দাঁড়ালো, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। তার ঘর থেকে বেরোলেই ছোটো কাঠের দরজা : তার কাছাকাছি সে স্ত্রীলোক দু-জনের সঙ্গে এসে জুটলো। থমকে দাঁড়ালো দু-জনে তাকে দেখে।

হে বিজয়ী বীর

'আমি বলতে এলাম,' দ্রুতস্বরে সে আরম্ভ করলে, তারপর ভেবে পেলে না, কী বলবে। সেটা ছেড়ে দিয়ে আবার আরম্ভ করলে, 'কিছু মনে করবেন না আপনারা, বাবা মারা যাওয়ার পর মা-র মাথার ঠিক নেই। তিনি মুখে যা বলেছেন, সেটা তাঁর মনের কথা নয়।'

বিধবা মহিলাটি বিস্ময়ে বিমূঢ় চোখ মেলে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন—যেন ঠিক বুঝতে পারছেন না। মেয়েটি রইলো অন্য দিকে তাকিয়ে।

'আপনাদের যা দরকার,' রঞ্জন ভেবেছিলো, কথাটা খুব সাজিয়ে-গুছিয়ে মোলায়েম ক'রে বলবে, কিন্তু একটা ঠিক কথাও যেন সে খুঁজে পেলো না, 'আপনাদের যা দরকার,' সে তাড়াতাড়ি ব'লে গেলো, 'তা আমাকে বলতে পারেন—যদি কিছু মনে না করেন। আমাকে দিয়ে যদ্দূর সম্ভব—' কথাটা সে শেষ ক'রে উঠতে পারলে না।

মুহূর্তের জন্য ছলছলিয়ে উঠলো বিধবার চোখ; কোনো কথা তিনি বলতে পারলেন না।

'আপনারা থাকেন কোথায়?' রঞ্জন জিগেস করলে।

একটু পরে বিধবা জবাব দিলেন, 'বক্সিবাজার।'

'কত নম্বর?'

'সতেরো।—একটা পুকুর-ওলা বাগান আছে, দেখেছো—'

রঞ্জন কোনোকালেই গ্যাখেনি; তবু বললে, 'হ্যাঁ'।

'—তার ঠিক পরেই যে-দোতালা বাড়িটা, তার নিচের তলায়—'

'বুঝেছি। ঠিক বার করতে পারবো খুঁজে।' রঞ্জনের এই আলাপ

দীর্ঘ করবার কোনো ইচ্ছে ছিলো না; সে চায় না, কেউ দেখে ফেলে।

কিন্তু একবার ছাড়া পেয়ে বিধবার মুখ দিয়ে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো কথা: 'তুমি আমাকে কখনো ছাখোনি, তোমাকে আমি দেখেছি ছোটো। এক গ্রামেই আমাদের বাড়ি—জ্ঞাতি-সম্পর্কে আমি তোমার কাকিমা হই—'

'বুঝতে পেরেছি। আপনারা কি একাই এসেছেন?'

'না, একটি ছেলে এসেছে সঙ্গে—ঐ যে—' একটু দূরে রাস্তায় দাঁড়ানো একটি বোগামতো ছেলেকে বিধবা আঙুল দিয়ে দেখালেন।

'ও কী হয় আপনাদের?'

'কিছু হয় না; ওরা দোতলায় থাকে। ভারি ভালো ছেলেটি—'

মেয়েটি হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বললে, 'চলো, মা।' এই মেয়েটি প্রথম কথা বললে।

'চলো।—দেখলি, অতসী, আমি তোকে বলেছিলাম—'

রঞ্জন বাধা দিলে, 'এ-পাড়ায় তো গাড়ির আড্ডা নেই—'

অতসী সোজা রঞ্জনের চোখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'থাক, আমাদের গাড়ির দরকার হবে না।' রঞ্জন লক্ষ্য করলে, সে-চোখ গভীর কালো, কালো পাথরের মতো তাতে কঠিন দীপ্তি।

সঙ্গে যে-ছেলেটি এসেছিলো, এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলো উল্টো দিকের ছায়ায় দাঁড়িয়ে; সঙ্গীদের বেরোতে দেখে এগিয়ে এলো। উৎসুক স্বরে জিগেস করলে, 'কী হ'লো, মাসিমা ?'

হিরণ্ময়ী আরম্ভ করলেন, 'এমন চমৎকার ছেলে—'

তীব্র হ'যে বাজলো অতসীর স্বর, 'চুপ করো, মা।'

মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হিরণ্ময়ী আর কথা বলতে সাহস পেলেন না। সরোজও একবার আড়চোখে তাকালো অতসীর মুখে—তার সঙ্গে চোখোচোখি হবে, এই আশায়। কিন্তু তার মুখের ভাব লক্ষ্য ক'রে সে খুশি হ'লো তা হ'লো না ব'লে।

তিন জনে হাঁটতে লাগলো কালো রাস্তার উপর দিয়ে, কথা নেই কারো মুখে। রোদ চড়ছে, রাস্তার পিচ উঠছে তেতে। মেয়েদের কারো পায়ে জুতো নেই। অত্যন্ত শাদাশিধে তাদের পোশাক। অতসীর শাড়ির পাড়টা যে রঞ্জনের পছন্দ হয় নি, তার সহজ কারণ হচ্ছে এই যে সেটা তার নিজের নয়: তার মা-র। অন্তত কুড়ি বছরের পুরোনো একটি কাশী সিল্কের শাড়ি—তখনকার দিনে প্রচলিত ফুল-পাতা আঁকা তার পাড়—বছরে দু-একবার তা বা'র করা হয় বাক্স থেকে, খুব জরুরি কোনো উপলক্ষ্যে। অতসী মেয়েটি লম্বা—শাড়িটা ঠিক তার পায়ের গোড়ালি অবধি পৌঁছয়ও না; মোটের উপর, তাকে যে দেখতে খুব

ভালো হয়, এমন নয়। দিশি মিলের ছাপানো কাপড়ের একটা ব্লাউজ তার গায়ে, তার নিজেরই হাতে শেলাই করা। শেলাই সে করে খুব ভালো; ব্লাউজটা গায়ে ঠিক বসেছিলো—যদিও গলাটা সে যতটা নামাতে পারলে খুশি হ'তো, ততটা নামানো হয়নি: সে-বিষয়ে তার মা-র অত্যন্ত নির্দিষ্ট এবং কঠিন মতামত ছিলো। অন্য-একটা ব্লাউজ সে বার করেছিলো, কিন্তু তার মা সেটার উপর এমন কটাক্ষপাত করেন যে —থাক, তাঁর ইচ্ছেই বজায় থাক। তাঁর সঙ্গে বেরোচ্ছে ব'লে—অতসী জুতোটা একবার পায়ে দিয়েও আবার ছেড়ে এলো। মা-র সঙ্গে চলবার সময় জুতো পরতে সে অত্যন্ত সংকোচ বোধ করতো।

সে যা-ই হোক, ওতে কিছু এসে যায় না, ছোটো-ছোটো ঝকঝকে দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধ'রে অতসী ভাবলে, কিছুতেই কিছু এসে যায় না। ওঃ, এ-কথা ভাবতে সে লজ্জায় ম'রে গেলো না যে সে আজকালকার কেতাদুরস্ত পোশাক পরবে! তার অস্তিত্বও যে একটা লজ্জা, তার অস্তিত্ব যে একটা লজ্জাকর ক্ষতের মতো, যা ঢেকে রাখতে হয়, সাবধানে লুকিয়ে রাখতে হয় লোকের চোখ থেকে। কী ক'রে সে কাপড়-চোপড়ের কথা ভাবতে পারে! সে যদি তার দিদিমার আমলের গলাবন্ধ ফুল-হাতা জ্যাকেট পরে, তাতেই বা কী! এটা আশ্চর্য যে সে তার ব্লাউজ ছাড়া অন্য কোনো কথা ভাবতেই পারলে না—একদা তার যে ব্লাউজের গলা আর-একটু নামাবার শখ হয়েছিলো, সে-কথা ছাড়া। তার মনের সমস্ত অন্ধ, তীব্র রাগ জ'মে উঠতে লাগলো ঐ তুচ্ছ ব্যাপারকে ঘিরে। এমনি মানুষের মন। আসলে যে-ব্যাপারে আমরা আঘাত পাই, সেটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি

করতে মনের একটা স্বাভাবিক বিমুখতা আছে—সেটা আমাদের আত্ম-রক্ষার প্রবৃত্তির একটা অংশ। তা সহ্য করা সহজ হয় না, সুতরাং আঘাতের মূল উৎসটাকে আমরা এড়িয়ে যাই; অন্য-কোনো অবান্তর, অবজ্ঞেয় ব্যাপার উপলক্ষ্য ক'রে মন তার সমস্ত রুদ্ধ বিষ নিজের উপর ঝাড়তে যাকে। অতসীর চারদিকে যেন একটা অন্ধতার দেয়াল—আর কিছু সে দেখতে পাচ্ছে না; মনে করতে পারছে না, এইমাত্র যা-কিছু হ'য়ে গেলো। তার সমস্ত ভিতরটা যেন পাথর হ'য়ে গেছে—কঠিন, কঠিন। তা একটা সাময়িক মৃত্যুর মতো, অন্ধকারের শূন্যতায় একটা বিলুপ্তি। তার মধ্যে একমাত্র যে-জিনিশের অস্তিত্ব আছে, তা তার সেই ব্লাউজ, পোশাক-সম্বন্ধে তার মূঢ় দম্ভের স্মৃতি। বিষের মতো তা তার রক্তের মধ্যে। সে যে কখনো তার পোশাকের কথা ভাবতে পারে! পোশাকের কথা আমরা ভাবি, কেননা শরীরকে আমরা সুন্দর ক'রে দেখাতে চাই অন্যের চোখে। কিন্তু তার শরীর! শরীরকে দেখাবার জন্য অন্য লোক! সেই মুহূর্তে নিজের শরীরের প্রতি এক ভয়ংকর ঘৃণার উচ্ছ্বাস ব'য়ে গেলো তার উপর দিয়ে। অনায়াসে সে তখন তার ডান হাত কেটে ফেলতে পারতো।

তারপর আস্তে-আস্তে সেই অন্ধ দেয়াল দূরে স'রে-স'রে যেতে লাগলো, রক্তের তাল এলো মৃদু হ'য়ে, সে ফিরে পেতে লাগলো তার ভার-কেন্দ্র। যেন শূন্য দিয়ে উন্মাদ বেগে পড়তে-পড়তে এখন আস্তে-আস্তে সে নামছে মাটির কাছাকাছি। আর হঠাৎ তার মনে পড়লো। আর সঙ্গে-সঙ্গে এ-কথা তার মনে হ'লো, কেন সে ফিরে এলো, কেন শূন্যের ভিতর দিয়ে স্খলিত হ'তে-হ'তে সে মিলিয়ে

গেলো না—কোনো চরম ভয়ংকরতায়, কোনো সুন্দর সর্বনাশে। কেন এই জেগে-ওঠা, এই অনতিক্রম্য মনে পড়া? সমস্ত ব্যাপারটা তার মনে ফিরে এলো, নিষ্ঠুর স্পষ্টতায়, প্রত্যেকটা উচ্চারিত কথা সে আবার মনে করতে পারলো; প্রত্যেকটা অনুচ্চারিত কথা প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠলো তার মধ্যে। আত্ম-যন্ত্রণার বিকৃত আনন্দে, বার-বার সে দৃশ্যটি নতুন ক'রে রচনা করতে লাগলো তার মনের মধ্যে যত বেশি, লাগলো ততই যেন তার পরিতৃপ্তি: এই একমাত্র প্রতিহিংসা, যা সে নিজের উপর নিতে পারে। ওঃ, কেন, কেন সে এসেছিলো; কেন সে তার বড়ো-বেশি-আশাপ্রবণ মা-কে বিরত করতে পারেনি? তার, অন্তত, জানা উচিত ছিলো। কিন্তু বোকা সে-ও তো কম ছিলো না; সে-ও—আশা করেছিলো। তার মা এমন ক'রে বলেছিলেন। যেন শুধু তাদের যাবার অপেক্ষা! এমন কী তার দোষ, যদি সে মুহূর্তের জন্য ভুলে থাকে—যদি মনে-মনে রচনা ক'রে থাকে দুরাশার সোনার স্তম্ভ, স্বপ্নের মধ্যে দীপ্যমান? দয়া সে কারো কাছ থেকে আশা করে না, জীবন তাকে সে-শিক্ষা দেয়নি। সে যে বেঁচে আছে, এই দেনা প্রতিদিন তাকে মিটিয়ে দিতে হচ্ছে শেষ আধলা পর্যন্ত। কিন্তু এমন কেউ হয়তো থাকতে পারে, যে দয়া করবে না, যে শুধু এগিয়ে আসবে—ওঃ এ-কথা যে সে ভাবতে পেরেছিলো, তার লজ্জা! কতদিন, কতদিন আর এ-রকম করে চলতে পারে—তার মনে হয়েছিলো। কোন অশুভ, হিংস্র তারার নিচে তার জন্ম হয়েছিলো, কোন অন্ধকার, মৃত গ্রহের অধিরূঢ়তায়! তার বাল্যকাল একটা কালির আঁচড়: সে মনে করতে পারে না, কখন সে শিশু ছিলো, সে যেন বড়ো হ'য়েই জন্মেছে, জীবনের সমস্ত

ভার নিয়েই। একটা দিন সে মনে করতে পারে না, যেদিন সে সমস্ত অন্তর দিয়ে বলতে পেরেছে, 'আমি সুখী।' তার বাবা জজকোর্টে অতি সামান্যই চাকরি করতেন; কাজ যা করতেন, তার চাইতে নেশা করতেন বেশি—তার উপর ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ারোগ ছিলো। বাড়িতে কখনো একটা পয়সা থাকতো না; মাঝে-মাঝে ভীষণ সব 'সীন' হ'তো। তার মা-র মুখে স্বামীর মৃত্যু-কামনা ছাড়া আর-কোনো প্রিয়-সম্ভাষণ ছিলো না। এর মধ্যে কেটেছে তার বাল্যকাল। তার বাবার মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিলো বারো। মা আর মেয়ে একেবারে ভেসে গেলো। তখন থেকে তারা যে এ পর্যন্ত বেঁচে এসেছে, এখনো অতসীর মাঝে মাঝে-মনে হয়, এটা একটা মির‍্যাকল। সে ভালো ক'রে মনে করতে পারে না, কী ক'রে কেটেছে এই আট বছর, মনে করতে চায়ও না। তার মা-র শেলাইয়ে খুব ভালো হাত ছিলো, মেয়েকেও তিনি শিখিয়েছিলেন। দু-জনে নানা রকম জিনিশ তৈরি ক'রে স্বদেশী-মার্কা দোকানগুলোয় বেচতে দিতো। এমন দিন গেছে, যখন তাদের না-খেয়ে থাকতে হয়েছে। অন্ধকার, স্যাঁৎসেঁতে ঘরে ব'সে শেলাই করা—অবিশ্রান্ত শেলাই করা, ছুঁচ ফুটে-ফুটে রক্ত বেরিয়ে যেতো আঙুলে, তাকিয়ে থাকতে-থাকতে চোখ উঠতো টনটন ক'রে—টমাস হুডের সেই হাস্যকর কবিতার মতো হাস্যকর, কিন্তু কী সত্য! সে-সময়ে তার মনে হ'তো, হুডের মতো কবি আর পৃথিবীতে নেই। শেষ পর্যন্ত তার মা একটা স্কুলে কাজ পেলেন শেলাই শেখাবার, সে স্কুল তাকে ভর্তি করলে বিনি মাইনেতে; কোনোরকমে, সে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করলে আঠারো বছর বয়েসে। তারপর মিউনিসিপ্যালিটির এক

গাড়ি

প্রাইমারি স্কুলে তার চাকরি জুটলো, পঁচিশ টাকা মাইনে। তা-ই বা কম কী, তার মা তা-ও পেতেন না। তা সে-কাজও তাঁকে ছেড়ে দিতে হ'লো, চোখে আর তিনি দেখতে পেতেন না। অতসীকেই শেলাইয়ের কাজ করতে হয় অবসর সময়ে, সরোজ সেগুলো বেচে দেয়। সরোজদের বাড়ির নিচের তলায় একটা ঘর আর রান্নাঘর নিয়ে তারা আছে দু' বছর হ'লো। সাত টাকা ভাড়া। সরোজরাও ভাড়াটে—সব-লেট করেছে। ঘরটা একটা সিন্দুক গোছের; তার মা-র কাশি আর ছাড়ছেই না। সে যদি কোনোরকমে একবার বি. এ.-টা পাশ করতে পারতো, তা হ'লে··· কিন্তু প্রতিদিনকার খাদ্য উপার্জন না-করলে চলে না। এদিকে তার মা-র বোধ হয় আর বেশিদিন নেই। তারপর? তারপর? কী হবে ভেবে? ভেবে কিছু হয় না। সবচেয়ে ভালো যেতে দেয়া, হ'তে দেয়া।

রবিবারের সকালবেলা রমনার রাস্তায় লোক-চলাচল নেই; শুধু মাঝে-মাঝে সাইকেলে চ'ড়ে সাহেবদের উর্দি-পরা চাপ্‌রাশিরা অকারণে ঘণ্টা বাজিয়ে যাচ্ছে, কি গাছের ছায়ায় বিড়ি ফুঁকছে মুসলমান ছেলে। ইউনিভার্সিটির প্রকাণ্ড বাড়িগুলোতে ছুটির দিনের শান্তি, আলস্য। বৃষ্টিতে ধোওয়া সবুজ পাতাগুলো সূর্যের নিচে নিজেদের মেলে দিয়ে চুপ ক'রে আছে। একটু হাওয়া নেই। গরম অসহ্য হ'য়ে উঠছে: যেন আকাশ থেকে এক অদৃশ্য, ভীষণ শক্তির মতো এই উত্তাপ নিষ্পেষণ করছে পৃথিবীকে, তাকে মূর্ছিত, মুহ্যমান ক'রে দিয়ে। অতসী দরদর ক'রে ঘামছিলো, কিন্তু তার খেয়াল নেই; তার কপালের উপর যে চুলের গোছা ঘামে লেপটে আছে,

তা সরাবার জন্য সে একটিবার হাত তুলছে না। সে যেন চলেছে নিজের মধ্যে মগ্ন, মগ্ন কোনো মহাশূন্যে। সরোজ মাঝে-মাঝে মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখে নিচ্ছিলো: তার পাশে যে আর-কেউ আছে, সে-বিষয়ে সে নিশ্চেতন। ও একজোড়া স্যাণ্ডেল অন্তত প'রে আসতে পারতো, সরোজ ভাবলে। কী বোকা মেয়ে, নিজেও খালি পায়ে চলবে, যেহেতু তার মা জুতো পরবেন না কিছুতেই। রাস্তা নিশ্চয়ই তেতে আগুন হয়েছে। অলক্ষিতে, সরোজ একটু পেছিয়ে পড়লো। তারপর তার অ্যালবার্ট থেকে একটা পা খুলে আস্তে ছোঁয়ালো রাস্তার উপর। যতটা গরম হবে সে ভেবেছিলো, ততটা নয়। পা-টা সে জোর ক'রে চেপে ধরলো রাস্তার উপর, কয়েক সেকেণ্ড চেপে ধ'রে রইলো, যতক্ষণ না তা'র মস্তিষ্ক উত্তাপে গুঞ্জিত হ'য়ে উঠলো, তার শরীরের প্রত্যেক স্নায়ু-তন্তু অবশ হ'য়ে পড়লো যেন তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ-প্রবাহে। রাস্তায় যেখানে তার পা পড়েছে, সেখান থেকে তার সমস্ত শরীর যেন অবিচ্ছিন্ন একটা সম্পূর্ণতা: এই সূর্যময় দিনের সে অন্তর্গত।

হিরণ্ময়ী একবার পিছনে তাকালেন—'তোমার হ'লো কী, সরোজ।'

সরোজ তাড়াতাড়ি মাথা নিচু ক'রে জুতোটা হাতে তুলে নিয়ে একটু ঝাড়লো। তারপর জুতো প'রে এগিয়ে আসতে-আসতে বললে, 'একটা কাঁকর ঢুকেছিলো জুতোয়।'

আলাপ আরম্ভ করবার একটা ফাঁক পেয়ে হিরণ্ময়ী খুশি হ'লেন। —'তোমাকে নিয়ে এলাম সঙ্গে ক'রে, আমাদের জন্য কষ্ট করলে।'

'না, কষ্ট আর কী।'

গাড়ি

'একটা ছাতা আনলে না কেন?'

'আমি তো ছাতা ব্যবহার করি না। কষ্ট হচ্ছে তো আপনাদেরই।'

'মেয়েদের আবার কষ্ট!'

'পুরাণে তো বলে,' সরোজ একটু হেসে বললে, 'একজন মেয়ের জন্যই প্রথমে ছাতা আর জুতো তৈরি হয়।'

একটু চুপচাপ কাটলো। তারপর হিরণ্ময়ী আস্তে-আস্তে বললেন, 'তুমি আমাদের উপর কখনো রাগ করো না তো?'

'যদি করিই! রাগও তো সকলের উপর করা যায় না।'

কথাটার ইঙ্গিত হিরণ্ময়ী বোধহয় বুঝলেন না। বললেন, 'তোমাকে এত কাজের কথা বলি, মনে-মনে কখনো কি আর রাগ না করো।'

'কিন্তু আমাকে না-বললেই বা আপনাদের চলে কী ক'রে?' সরোজ মৃদুস্বরে হেসে উঠলো।

আবার ছেদ। হিরণ্ময়ীর অত্যন্ত ক্লান্ত লাগছিলো, মন্থর থেকে মন্থরতর হ'য়ে আসছিলো তাঁর চলা। তবু, তাঁর ইচ্ছে এই ছেলেটির সঙ্গে কথা কন, এমনি আস্তে-আস্তে, থেমে-থেমে। ও এমন শান্ত, এমন শান্তিময়; এমন মন দিয়ে ও শুনতে পারে; হাসতে পারে, হাসলেই যেখানে ভালো লাগে। ওর উপস্থিতি নরম আলোর মতো; পারিপার্শ্বিক বিশাল অন্ধকারের মধ্যে আলোর একমুঠো দ্বীপ। এই প্রৌঢ়া মহিলা আর এই যুবকের মধ্যে সহানুভূতির একটা অদ্ভুত স্রোত: একজন প্রবৃত্তি দিয়ে বুঝতো, কী আছে অন্যের মনে। সরোজ যখন কাছে থাকে, সেটা যেন হিরণ্ময়ীর পক্ষে

একটা সম্পূর্ণতা। আসল কথাটাই ওকে এখন পর্যন্ত বলা হয়নি, কী ক'রে প্রসঙ্গটা উত্থাপন করা যায়, হিরণ্ময়ী ভেবে পাচ্ছিলেন না। মেয়েকে তিনি ভয় করতেন। আবার যদি সে ফোঁশ ক'রে ওঠে! কিন্তু এত জ্বালাই বা ওর কেন? যা তারা আশা করেছিলো, তা তো হ'লোই, তার চেয়ে বেশিই বোধহয় হ'লো। অতসী কি এতে খুশি হয়নি? ও কোন না সামনের বার আই. এ.-টা দিতে পারবে—রঞ্জন রাখবে তার কথা, তার চেহারা দেখেই তা-ই মনে হয়। হিরণ্ময়ীর মনের চোখে রঞ্জনের মুখ বার-বার দেখা দিতে লাগলো, করুণায় মধুর। আর সত্যিও, রঞ্জনের মুখে একটু যেন অপার্থিব মধুরতা ছিলো, তার ম্লান শেলি-মুখ। দেখে তাকে কবি মনে হ'তো। আর কবিও সে বটে; যদিও তার মুখের উচ্চ আদর্শ তার কবিতা বজায় রাখতে পারেনি। সেই অপার্থিব ম্লান মুখের নিচে কোনো শেলি-প্রাণ জ্বলতো না; কোনো গোপন প্রদীপ আভাময় ক'রে তোলেনি তার মুখ। কিন্তু হিরণ্ময়ীর অত জানবার কথা নয়; জানলেও বোঝবার কথা নয়। রঞ্জনের মুখ তাঁকে প্রীত করেছিলো। কিন্তু অতসী যেন বিমুখ, কঠিন। কী সৌভাগ্য যে আজ তাদের কাছে এসেছে, তা যেন সে উপলব্ধিই করছে না। এত অভাব যার, এত অভিমান কি তাকে মানায়? তাহ'লে অনেক আগেই তো তাঁকে আত্মহত্যা করতে হ'তো, অতসীকে সুদ্ধু। কিন্তু বাঁচতে যে হবেই; যে-ভাবেই, যা ক'রেই হোক, বাঁচতে হবে। কেন বাঁচতে হবে? দুঃখ পেতে, আরো বেশি দুঃখ পেতে। কিন্তু দুঃখও যে শেষ পর্যন্ত স'য়ে যায়—তারই মধ্যে কত ছোটোখাটো ভালো লাগা; এমন

শত্রু কেউ নেই, যা মুহূর্তে-মিলিয়ে-যাওয়া সেই খুশির বুদ্‌বুদ কেড়ে নিতে পারে।

হঠাৎ হিরণ্ময়ী জিগেস করলেন, 'সরোজ, তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করো?'

সরোজ একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, 'নিশ্চয়ই কোনোখানে কোনো একজন ঈশ্বর আছেন।'

'তোমার কি মনে হয় পৃথিবীর সকলের জন্য তিনি ভাবেন?'

'যদি তাঁর ভাববার ক্ষমতাই থাকতো—' সরোজ মাঝপথে থেমে গেলো।

'তাহ'লে—কী?'

'মাসিমা, ভেবে তো মরি আমরাই। আমরা যদি না-ভেবে পারতাম—'

'যদি পারতাম!' হিরণ্ময়ী প্রতিধ্বনি করলেন, 'কিন্তু মানুষের উপর তা-ই তো অভিশাপ: তাকে ভাবতেই হবে, আশা করতেই হবে। অথচ যা হবার, তা-ই তো হয়।'

'অনেক সময় ভালোও হয়।'

'সেইজন্যই তো আমরা বেঁচে আছি।'

সরোজ মৃদুস্বরে হেসে উঠলো। বললে, 'বাঁচতে আমাদের প্রত্যেককেই হবে।'

আর-কোনো কথা হ'লো না। হিরণ্ময়ীর মনে হ'তে লাগলো, অনেক কথা বলা হ'লো না। কিন্তু তিনি যথেষ্ট বলেছিলেন: সরোজ জানলো যে তাদের আজকের যাত্রা সফল হয়েছে।

হে বিজয়ী বীর

খানিকক্ষণ, রোদের ভিতর দিয়ে, তিনজনে নীরবে হেঁটে চললো। তারপর, সেই নির্জন রাস্তায় ঘোড়ার খুরের টকটক শব্দ শোনা গেলো। সরোজ পিছনে তাকিয়ে দেখলে, একটা গাড়ি আসছে। শাদা একটা গাড়ি, নতুন রং-করা, রোদে ঝলসাচ্ছে। গাড়োয়ানের গাঢ় সবুজ রঙের গেঞ্জি তীক্ষ্ন-নীল আকাশের নিচে একটা জ্ব'লে-ওঠার মতো। গাড়িটা কাছে আসতে সরোজ তাকিয়ে দেখলো, ভিতরে লোক নেই। হাতছানি দিয়ে ডাকলো।

লাগাম টানতে-টানতে গাড়িটা একটু দূরে চ'লে গেলো। গাড়োয়ান চেঁচিয়ে ডাকলে, 'আইয়েন, কত্তা।'

অতসী এতক্ষণ একটি কথা বলেনি ; যে-সব কথাবার্তা হয়েছে, তা-ও যে সে শুনেছে এমন-কোনো লক্ষণ নেই। সে ছিলো সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, বিচ্ছিন্ন। কিন্তু এইবার সে হঠাৎ জেগে উঠলো ; দ্রুত, তীব্র দৃষ্টিতে তাকালো সরোজের মুখে। 'গাড়ি—গাড়ি কেন ?' সে জিগেস করলে। তার গলার স্বর একটু ভাঙা-ভাঙা।

'চলো গাড়িতেই যাই। বড়ো রোদ।' এই ব'লে সে গাড়োয়ানের সঙ্গে ভাড়া ঠিক করতে লাগলো।

'কিন্তু গাড়ি দিয়ে কী দরকার।' অতসীর কণ্ঠস্বর যেন কিসে চাপা দিয়ে রেখেছে ; ভালো ক'রে ফুটতে পারছে না।

'ফিরতি গাড়ি—শস্তায় পাওয়া যাচ্ছে।'

'তা হোক, আদ্ধেক রাস্তা তো এসেই পড়েছি। কিছুতেই গাড়ি নেয়া হ'তে পারে না—ছেড়ে দাও।'

হিরণ্ময়ী ভয়ে-ভয়ে মেয়েকে লক্ষ্য করলেন—তার এই ফেটে পড়বার

চেষ্টা, ফেটে পড়তে পারছে না—ব'লে তার এই জ্বালা। গাড়ি নেয়া সম্বন্ধে তাঁর নিজের খুবই সায় ছিলো, কিন্তু তিনি কিছু বললেন না।

'যেতে ব'লে দাও—যেতে ব'লে দাও,' অতসী রুদ্ধ স্বরে ব'লে উঠলো, যেন এই ব্যাপারের উপর তার সমস্ত জীবন নির্ভর করছে।

'আইয়েন না, মা-ঠাইন,' গাড়োয়ান তার চিবিয়ে বলা, টানা-স্বরে-বাঁধা ভাষায় বললে, 'পঙ্খীরাজ ঘোরা আছে, উরাইয়া লইয়া যাইবো।' লোকটা অত্যন্ত আপ্যায়নের হাসি হাসলো। তার কপালে একটা গভীর কাটা দাগ—সেটা যেন তার গৌরবের বস্তু, এমনি মনে হয়। তার পাৎলা, আঁটোসাঁটো শরীর যেন উৎসাহে, অবাধ পশু-আনন্দে-ঠাশা।

'চলো না,' সরোজ অতসীর কানের কাছে মুখ নিয়ে অনুনয় করলে।

'না হেঁটেই চলো।'

'রোদে কষ্ট হচ্ছে না তোমার?'

অতসী এমন ভাবে সরোজের দিকে মুখ ফেরালো যেন তাকে খেয়ে ফেলবে—'কী ক'রে জানলে আমার কষ্ট হচ্ছে?'

সরোজ সংকুচিতভাবে বললে, 'তোমার মা-র তো হচ্ছে!'

অতসী চুপ ক'রে রইলো।

গাড়োয়ান আর-একবার তাড়া দিলে, কিন্তু সত্যি-সত্যি তার যেন তাড়া নেই; দৃশ্যটা সে যেন উপভোগ করছে।

সরোজ গভীর মিনতির স্বরে বললে, 'ওঠো, ওঠো।'

অতসী যেন ইচ্ছে ক'রে, গায়ের জোরে বললে, 'কিন্তু আমাদের কাছে তো পয়সা নেই।'

'পয়সার জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না।'

হে বিজয়ী বীর

আগুন জ্ব'লে উঠলো অতসীর চোখে। 'কেন তুমি আমাদের জন্ম খরচ করবে,' সে প্রায় চীৎকার ক'রে উঠলো, 'কেন তুমি আমাদের জন্ম খরচ করবে?' তার কণ্ঠস্বরে, তার দৃষ্টিতে এমন হিংস্রতা, সরোজ রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলো।

কিন্তু পরের মুহূর্তেই প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হ'লো। হঠাৎ তার চেতনা হ'লো সে দাঁড়িয়ে আছে এক খোলা রাস্তার মাঝখানে, লক্ষ্য করলে, কোচবাক্সে বসা গাড়োয়ানকে। লোকটার পুরু, কালো ঠোঁটের কোণে যেন একটু আমোদের ছটা। আর সঙ্গে-সঙ্গে, লজ্জার এক বিশাল ঢেউ তাকে অভিভূত করলে। সে যেন ভেঙে পড়ছে, চূর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে। সে চূর্ণ হ'য়ে যাবে এই লজ্জায়, এই নিরাশ্রয় প্রকাশ্যতায়। তার হাত যেন শূন্যে খুঁজছে একটা অবলম্বন। নিজের হাতে দরজা খুলে সে গাড়িতে উঠে বসলো সবার আগে।

আর, গাড়ি যখন চলতে আরম্ভ করেছে, হঠাৎ দু-হাতে মুখ ঢেকে সে কাঁদতে আরম্ভ করলো—কান্নায় ভেঙে পড়লো তার শরীর। গাড়ির চাকার ছন্দের সঙ্গে তাল রেখে থেকে-থেকে কান্নার আবেগে তার শরীর কেঁপে উঠতে লাগলো; হিরণ্ময়ী আর সরোজ দু-জনে দু-দিকে তাকিয়ে রইলো—বাইরে, রাস্তায়। কারো মুখে কথা নেই।

তিন

অপব্যয়

দেড়টার সময় সেদিন রঞ্জনের ক্লাশের ছুটি; সাইকেল নিয়ে সে বেরিয়ে পড়লো রাস্তায়। তার স্কলার্শিপের টাকাটা—সেদিনই সে তা পেয়েছে—তার পকেটে। ইউনিভার্সিটির কম্পাউণ্ডের ভিতর দিয়ে শর্ট-কাট ক'রে সে রেল-লাইনের ধারে এসে পড়লো। বেশি দূর হবার কথা নয়: সাইকেলে যেতে সাত মিনিট বড়ো জোর। সে তাড়া করলে না; আস্তে-আস্তে, অলসভাবে পেডাল করতে লাগলো। খোলা মাঠের মধ্যে তেতে উঠেছে হাওয়া; মাঝে-মাঝে এক হাত দিয়ে পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে সে মুখ মুছছিলো—আর ভাবছিলো, ভাবছিলো—এই সময়ে লাইব্রেরির স্নিগ্ধ অন্ধকারে, বইয়ের-গন্ধে-ভরা আবহাওয়ায়, পাখার নিচে ব'সে থাকতে কী আরাম! রোজ খানিকটা সময় সে লাইব্রেরিতে কাটায়—সেখানে এমন বিস্মৃতি, এমন সম্পূর্ণতা। পৃথিবীতে একমাত্র জায়গা, যেখানে গিয়ে পৃথিবীকে ভুলে থাকা যায়—যেখানে আর কিছুতেই কিছু এসে যায় না, মানুষের মনের রক্তিম জ্ঞান-ফল ছাড়া—কী তিক্ত সে-ফল, যার জন্য স্বর্গ থেকে মানুষের স্খলন; কী মধুর, যার জোরে স্বর্গে মানুষের দাবি। অবশ্য এমন নয় যে পৃথিবীকে রঞ্জনের মনে হ'তো ভুলে থাকবার মতো। পৃথিবীর কথা ভেবে মন-খারাপ করবার সে বিশেষ-কিছু পেতো না। কী সহজে আমরা পৃথিবীর সাধারণ ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত সুবিচারে, সামাজিক প্রথার কল্যাণে, প্রথা-আশ্রয়ী নীতিতে—এমনকি, প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তৃতি ও বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনীর

হে বিজয়ী বীর

বিচিত্রতর ব্যবহারের সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের উন্নতিতে, দেশপ্রেমের সার্থকতায়, ন্যায় ও ঈশ্বরের মঙ্গলময়তায় বিশ্বাস করতে পারি—যখন আমাদের ব্যাঙ্কে পঞ্চাশ হাজার থাকে। না, পৃথিবীকে ভুলে থাকবার কোনো জোর গরজ রঞ্জনের মনে ছিলো না; মোটের উপর, তার কাছে তা ভালোই মনে হ'তো, বেশ ভালো। হ'তেই পারে। খুঁতখুঁতেপনা ক'রে নষ্ট করবার সময় তার কোথায়—এত রকম জিনিশ আছে হাতে। তবু, লাইব্রেরিলোকের বিস্মৃতি তার ভালো লাগতো—সেই যে একটু ফাঁক, তাতে নিজের ঘরে ব'সে তার বিকেলবেলাকার চা-স্থখ কত বেশি ঘনীভূত হ'য়ে উঠতো! উপভোগের বস্তু থেকে মাঝে-মাঝে দূরে স'রে যেতে হয়, উপভোগকে নিবিড়তর ক'রে তোলবার জন্য। আর সেই কারণেই, সেই ধরনেই সে ভালোবাসতো লাইব্রেরির অনাসক্ত, দূর আবহাওয়া —তা আলাদা, তা অন্যরকম। সেটা তার একটা অভ্যেসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো, তার জীবনযাত্রার অন্যতম নিয়ম। নিয়মের বাঁধা রাস্তায় চলতে তার জন্ম, তার লালন, তার সমস্ত পারিপার্শ্বিক তাকে শিখিয়েছিলো। তাতেই স্বস্তি, তাতেই আরাম। বছরের প্রত্যেকটি দিনের কোন অংশ সে কেমন ক'রে কাটাবে, তা আগে থেকেই নিশ্চিত জানতে সে ভালোবাসতো। সময়ের কোনোরকম ভাঙাচুরো সে পছন্দ করতো না; সে চাইতো অবিচ্ছিন্ন, রন্ধ্রহীন একটানা। তাতে, অন্তত, কোনো উপদ্রব নেই। উপদ্রবকে, ঝঞ্ঝাটকে, যে-কোনোরকম আকস্মিককে, অনির্দিষ্টকে সে ঘোর সন্দেহের চোখে দেখতো। তার ছিলো সেই নিশ্চিতি-প্রিয়তা, নিয়মিত, অব্যর্থ, সলিড একটা মোটা আয়ের যা ফল।

তবু আজ সে নিয়মভঙ্গ করলে; দুপুরের রোদে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে

পড়লো, যাকে সে জীবনে একবার মাত্র দেখেছে, যার সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না, সেই বিধবাকে কিছু টাকা দিতে। তার নিজের টাকা—মা কিছু টের পাবেন না। তার মা হিশেব ক'রে খরচ করার পক্ষপাতী; তাঁর চোখে ধুলো দেয়া শক্ত। রঞ্জন—যদিও সে একমাত্র ছেলে—তবু তার হাতখরচ কঠিনভাবে নির্দিষ্ট—এখন পর্যন্ত। তা অতিক্রম করতে গেলে জবাবদিহির তলব পড়ে। এবং এটাই একমাত্র ব্যবস্থা, যার বিরুদ্ধে মনে-মনে সে প্রতিবাদ করতো। টাকা সম্বন্ধে সে খোলাহাত, খরচ করতে সে ভালোবাসে। এ-কথা ভেবে সে বেশ একটু তৃপ্তি পেলো যে সে খানিকটা বাজে খরচ করতে যাচ্ছে—স্রেফ বাজে খরচ। এই একটা কাজ সে করলে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে, যার জন্য সে ছাড়া আর কেউ দায়ী নয়। এখানে যতই তুচ্ছ হোক উপলক্ষ্যটা—সে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে তার নিজত্বকে। এ একটা মস্ত জিনিশ, নিজের খুশিতে কিছু করতে পারা—কারো মুখে না-তাকিয়ে, অন্য কারো কথা না-ভেবে—কাজটা যা-ই হোক তা যেন বদলে দেয় সমস্ত জীবনের রং; সেটাই যেন একটা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়া। তার ব্যক্তিত্ববোধের এ একটা প্রতিষ্ঠা; তার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের একটা প্রমাণ। সেদিন সকালে তার যখন হঠাৎ প্রেরণা হ'লো বিধবাকে গিয়ে অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেবার, তখন কী উদ্দেশ্য তাকে তাড়না করেছিলো, সে ভালো ক'রে মনে আনতে পারে না। বোধহয় তার মা-র মূঢ়তাকে আচ্ছাদন করা—তা ছাড়া কিছু নয়। নয় তো, তার স্বভাবে দাক্ষিণ্য-ব্যাধি ছিলো না। দাক্ষিণ্য—ইংরিজিতে যাকে বলে চ্যারিটি—তার বহুকীর্তিত সৌন্দর্য কখনো তার মনকে আকর্ষণ করেনি। মনে-মনে সে বরাবর বড়লোকদের দানের লিস্টির কথা ভেবে হেসেছে।

হে বিজয়ী বীর

ওঃ, এই বড়োলোকরা—তাদের নবাবি জীবন কাটিয়ে যাচ্ছে স্বচ্ছন্দে—আর সেই সঙ্গে মাসে-মাসে একমুঠো ভিক্ষে দিয়ে যাচ্ছে অমুক বিধবাকে, অমুক গরীব ছাত্রকে, অমুক দুঃস্থ পরিবারকে, রুগ্ন দূর সম্পর্কের আত্মীয়কে। যাদের দিচ্ছে, কখনো এক মুহূর্ত ভাবে না তাদের কথা, তাদের অনেককে হয়তো চোখেও দ্যাখেনি, অনেকের নামও জানে না। একরকমের নৈর্ব্যক্তিক, যান্ত্রিক দান—দাতাকে তা সমৃদ্ধ করে না, আর্থিক সমৃদ্ধির একটু হানি মাত্র করে। এতে একটা মূলগত ভালগারিটি আছে : যেমন আছে, যে-স্ত্রীলোকের মুখ পরদিন সকালে মনে করতে পারিনে, তার সঙ্গে সহশয্যায়। ভিক্ষা দিয়ে সুখ নেই। সে-ক্রিয়া মৃত, নিষ্ফল। যার জন্য মনের একেবারেই কোনো ভাবনা নেই, তাকে যে-দান, সেটা নেহাৎই দান : তার বেশি কিছু নয়। যদি দিতেই হয়, 'তাহ'লে সেখানে, অন্তর যেখানে উৎসুক। সেখানেই—যা দেয়া হয়, সেটা ঐশ্বর্য হ'য় ওঠে। ভিক্ষা আমরা দিই, না-দিতে লজ্জা করে ব'লে; আর, মন থেকে যেখানে দিই, সেখানে না-দিয়ে পারি না।

বন্ধুদের জন্য খরচ করতে রঞ্জন ভালোবাসতো; কোনো বন্ধু ধার নিয়ে ফিরিয়ে দিতে ভুলে গেলে সে কখনো মনে করিয়ে দিতো না। আর, দল বেঁধে সিনেমায় গেলে সে সবসময় সবগুলো টিকিট কিনতো, রেঁস্তোরার বিল অন্য কাউকে শুধতে দিতো না; অন্য একজন গাড়ি ভাড়া ক'রে তাকে তুলে নেবার পর যখন অনায়াসে মাঝ-রাস্তায় নিজের বাড়িতে নেমে থাকতো, সে কিছুমাত্র চিন্তা না-ক'রে বাড়ি পৌঁছে ভাড়াটা চুকিয়ে দিতো। বন্ধুদের মধ্যে তার অর্থশালিতার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিলো; সবাই আশা করতো, সে খরচ করবে।

এবং সে-আশা অনুসারেই সে চলতো, তার খ্যাতি বজায় রেখেই চলতো —যদিও তা করতে গিয়ে মাঝে-মাঝে দু-দিক মেলাতে তাকে বিপদে পড়তে হ'তো। ছেলেবেলা থেকেই তার এই অভ্যেস: স্বাভাবিকমাত্র, এখন যে সে অভ্যেসটার আরো ব্যাপক পরিচালনা করতে চাইবে। তার কাছ থেকে যা আশা করা হ'তো, সে তা-ই করতো; যেন কর্তব্যের খাতিরে আপ্যায়ন করতো তার বন্ধুদের, কখনো প্রত্যাখ্যান করতো না, মনে-মনেও কখনো আপত্তি করতো না। সেটাও একটা নিয়ম দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো; আর, একবার নিয়মের ছাপ পড়লে সে-কাজের সম্পাদনা রঞ্জনের কাছে অত্যন্ত সহজ হ'য়ে আসতো। এটা একটা ধ'রে-নেয়া সত্য যে বন্ধুদের জন্য সে অর্থব্যয় করবে: যেহেতু তার গায়ে লাগবার কথা নয়, সেইজন্য তার তা গায়ে লাগতো না। কিন্তু একজনের অভাব ব'লে তাকে কিছু দেয়া—সে আলাদা জিনিশ, সে কথা কখনো তার মনো হ'তো না। একজন আর-একজনকে দেয়, তার দরকার ব'লে, তার আরো বেশি দরকার ব'লে। নিছক, নির্লজ্জ, মর্মান্তিক প্রয়োজনের সংস্পর্শে সে কখনো আসেনি। তাদের পরিবার ও আত্মীয়দের মধ্যে—এবং জ্যাঠতুতো, খুড়তুতো ভাই আর মামা পিশে প্রভৃতি মিলিয়ে সে এক বৃহৎ ব্যাপার—প্রায় সকলেই কম-বেশি অবস্থাপন্ন, যে-জগতে তার চলাফেরা, সেখানকার অভাব অন্য জাতের। কেউ সিনেমায় যাবার জন্য দশ টাকা চাইছে, এটা সে সহজেই বুঝতে পারে; কিন্তু সে দস্তুরমতো শকড হবে, মুদিদোকানের সওদা করবার জন্য যদি কেউ একটা টাকাও চায়। ও-সব জিনিশ তার জীবনের পরিধির, তার মনের আয়ত্তের বাইরে। 'দয়া'র জন্য কখনো একটা টাকা খরচ

করবার কথা তার মনে হয় নি। বস্তুত, দয়ার পাত্র যারা, তাদের প্রতি দয়ার ভাব মনে আনা অসম্ভব—সে, অন্তত, তা-ই দেখেছে। অসম্ভব, কোনো ভিখিরির প্রতি ঘৃণা ছাড়া অন্য কিছু অনুভব করা। যদি সে কখনো ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখতো তাহ'লে হয়তো—কিন্তু তাকিয়ে দেখাই যে অসম্ভব। আর, যত বেশি দরিদ্র, অক্ষম, তত বেশি কুৎসিত; যত বেশি দয়ার যোগ্য, তত প্রচণ্ড ঘৃণা। না—দয়ার চর্চায় সে কখনো কোনো অর্থ দেখতে পায়নি। কিন্তু এর আগে কেউ তো এসে তার কাছে হাতও পাতে নি—এমন কেউ, যে প্রত্যক্ষ, যে স্পষ্ট, যে নিছক রাস্তার ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে-যাওয়া একজন নয়, যাকে সে অনুভব করতে পারে একজন মানুষ ব'লে। সে কখনো জানেনি উপযাচক হবার অসহনীয়তা। 'ওদের জন্য আমার কী ভাবনা?' পেডাল করা একটু থামিয়ে সে ভাবলে। না, কোনো ভাবনা নেই; যা-ই ঘটুক তাদের তাতে কিছু এসে যায় না। এ-টাকা পেয়ে তারা কতখানি সুখী হবে, সে-কথা কেন সে ভাবতে যাবে, অন্যের উপকার করবার কোনো প্রবৃত্তি তার নেই। শুধু দিয়েই সে মুক্ত হ'লো দায় থেকে—প্রত্যাখ্যানের লজ্জার দায়। অন্যের দুঃখ সে কেন মাথা পেতে নিতে যাবে—দুঃখে কোনো পুণ্য নেই; তা যত কম ছড়ায়, সেই ভালো।

কিন্তু এ-সব ছাড়া—সবার উপরে কথা হচ্ছে এই যে সে সম্পূর্ণ নিজের খুশিতে একটা কাজ করছে, নিজের খেয়ালে, তার মা-কে ফাঁকি দিয়ে, তাঁকে লঙ্ঘন ক'রে। অন্যের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করবার, নিজের ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠিত করবার আনন্দ! ব্যাপারটাকে সে বেশ

উপভোগ করছিলো। এ-কথা আর-কেউ জানবে না; এ থাকবে, নিজের সঙ্গে তার একটা গোপন ঠাট্টা। মনে-মনে সে একটু হাসলো।

একটু খোঁজাখুঁজির পর বাড়ি বেরুলো ঠিক। সাইকেল থেকে নেমে, মুখের ঘাম মুছে সে বাড়িটার দিকে একবার তাকালো। বাড়িটা উঁচু দেয়ালে ঘেরা, রাস্তা থেকে নিচের তলাটা দেখবার উপায় নেই। উপরের তলায় বন্ধ সব দরজা-জানলা: গ্রীষ্মের দুপুরের রুদ্ধশ্বাস মৃত্যু। সে একটু অপেক্ষা করলে—কারো সাড়াশব্দ নেই। এ-সময়ে না-এলেই ভালো হ'তো; বাড়ির লোকের দুপুরবেলার ঘুম ভাঙিয়ে এক কাণ্ড! কিন্তু এসে যখন পড়েইছে, ফিরে যায় কী ক'রে? আবার কবে আসা হবে, হয়তো আর আসা হবে না, হয়তো শেষ পর্যন্ত তার মনের ভাবও বদলে যাবে। কাজটা সেরে পালিয়ে যাওয়াই ভালো—যত শিগগির হয়। সে একবার সাইকেলের বেল বাজালো। বিশ্রাম-স্তব্ধ পাড়ায় বেলটা এমন জোরে আওয়াজ ক'রে উঠলো, সে লজ্জিত হ'য়ে পড়লো নিজের কাছেই। একটু সময় সে চুপ ক'রে রইলো, অনিশ্চিত। রাস্তা দিয়ে একটা লোক গেলো লিচু হেঁকে। কে কিনবে তার লিচু, রঞ্জন মনে-মনে ভাবলে, কে শুনবে তার ডাক! গলির বাঁকে-বাঁকে লোকটার একঘেয়ে ডাক ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হ'য়ে এলো। তখন রঞ্জন বাইরের দরজার কড়া ধ'রে নাড়লো; লিচুওলার হাঁক নীরবতাকে বিপর্যস্ত ক'রে দিয়ে যেন অপসৃত করলে তার কুণ্ঠা; ডাকে, বলতে গেলে, অনুমতি দিয়ে গেলো নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করবার। অনেকক্ষণ ধ'রে সে কড়া নাড়লো। ভিতর থেকে মেয়েলি গলায় জিজ্ঞাসা এলো, 'কে?' উত্তরে সে আবার কড়া নাড়লে। একটু

পরে দরজা খুললো। ইজের-পরা একটি সাত-আট বছরের ছেলে জিগেস করলে, 'কা'কে চান ?'

'নিচের তলায় যাঁরা থাকেন—একজন বিধবা—'

'মাসিমা তো ঘুমুচ্ছেন ?'

'ঘুমুচ্ছেন ?' রঞ্জন এক মুহূর্ত চিন্তা করলে। টাকাটা এর হাতে পাঠিয়ে দিয়ে চ'লে যাবে ? কিন্তু সেটা উচিত হবে না—ভালো দেখাবে না। 'একটু দেখে এসো তো, খোকা, তিনি যদি জেগে থাকেন—'

'মাসিমা ঘুমুচ্ছেন,' ছেলেটি দৃঢ়, নিশ্চিত স্বরে বললে। স্পষ্টত, সে দেখে আসবার কষ্টটুকু করতে চায় না। আগন্তুককে বিদায় দিতে পারলেই সে বাঁচে।

রঞ্জন তবু জোর করলে, 'একবার দেখে এসো না—'

কিন্তু হিরণ্ময়ী সত্যি-সত্যি ঘুমুচ্ছিলেন না ; বরং, কড়ানাড়ার শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো। অলস চোখ মেলে তিনি তাকিয়ে ছিলেন। ঘরটা অসম্ভব গরম ; জানলা যা একটা আছে, পশ্চিমে ; বিকেল হ'তে থাকলেই নরক হ'য়ে উঠতে আরম্ভ করে। পাখাটার জন্য যে হাতটা একটু বাড়াবেন, সেটুকু জোরও যেন তিনি গায়ে পেলেন না। ভাবছিলেন, এখন উঠে পড়লেই সব চেয়ে ভালো হবে কিনা, এমন সময় রঞ্জনের কথার এক টুকরো তাঁর কানে এলো। গলাটা চিনতে পারলেন না ; কিন্তু মনে হ'লো কেউ একজন তাঁর খোঁজ করছে। চট ক'রে তিনি উঠে পড়লেন ; বেরিয়ে এলেন শিথিল আঁচল সামলে।

'কে এসেছে রে, হাবুল,' বলতে-বলতে তিনি এগিয়ে আসতে

লাগলেন; কিন্তু দরজার বাইরে রঞ্জনকে দেখেই তিনি থমকে দাঁড়ালেন; একটু যেন অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়লেন।

'আমি এসেছিলাম—' রঞ্জনকেই প্রথমে কথা বলতে হ'লো।

'এসো, এসো, বাইরে কেন? কতক্ষণ এসেছো? অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিলো বুঝি বাইরে?'

হিরণ্ময়ীর অনুসরণ ক'রে রঞ্জন ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

একটা তক্তাপোশের উপর একটা ময়লা শাড়ি, একগোছা উঠে-আসা চুলসমেত মোষের শিঙের একটা চিরুনি, একটা বিস্কুটের বাক্সয় অর্ধ-কৃত একটা শেলাই, মলাট-ছেঁড়া একটি মাসিক পত্র—এই সব বিবিধ জিনিশ প'ড়ে ছিলো। সেগুলো সরিয়ে হিরণ্ময়ী বললেন, 'বোসো।'

রঞ্জন অত্যন্ত সংকুচিতভাবে এক কোণে বসলো। ব'সেই সে নির্লজ্জ, অভদ্র, অসভ্যভাবে ঘামতে আরম্ভ করলে। যত মুখ মোছে, কিছুতেই থামে না। সে অনুভব করলে যে ঘরের মধ্যে ঢুকেই এ-রকম ঘামতে থাকা অত্যন্ত অশোভন—এমনকি রূঢ়। মনে-মনে সে লজ্জিত হ'য়ে উঠলো; রীতিমতো অসুখী হ'য়ে উঠলো। কিন্তু সত্যি, ঘরটা বড্ড বেশি গরম। তার সমস্ত শরীর যেন পুড়ে যাচ্ছে।

হিরণ্ময়ী তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী গরম! তুমি বাইরে থেকে এসেছো—আরো বেশি লাগছে। এই পাখাটা নাও।'

হাতপাখা দিয়ে নিজেকে হাওয়া করবার চাইতে রঞ্জন বরং গরমে সিদ্ধ হ'তে রাজি। তবু সে ভদ্রতা ক'রে দু-একবার পাখাটা নাড়লে। এখন এখান থেকে বেরোতে পারলে সে বাঁচে। কিন্তু যে-জন্যে সে

এসেছে, তা তো করা দরকার। সে ভেবে পেলো না, কী ক'রে কথা আরম্ভ করা যায়। কী অস্বস্তি !

কিন্তু কিছু-একটা বলতেই হবে। বোকার মতো ব'সে-ব'সে সারাক্ষণ ঘামতে পারে না তো। শেষটায়, আর-কিছু না পেয়ে সে বললে, 'ও ছেলেটি কে ?'

'কে—যে দরজা খুলে দিলে ? ওরা উপরে থাকে—সেদিন আমার সঙ্গে ওর দাদা গিয়েছিলো, সরোজ।'

হিরণ্ময়ী মেঝের উপর বসলেন, দরজার কাছে। 'তুমি কি বাড়ি থেকে আসছো ?'

'না, কলেজ থেকে।'

'তুমি এম. এ. পড়ো বুঝি ?' হিরণ্ময়ী জানতেন, তবু জিগেস করলেন।

'হ্যাঁ, এম. এ. পড়ি।'

'অতসীকে যদি কোনোরকমে বি. এ.-টা পাশ করাতে পারতাম—' হিরণ্ময়ী বলতে আরম্ভ করলেন, 'কিন্তু ও স্কুলে পড়িয়ে সময়ই পায় না। আর তাছাড়া—' তিনি চুপ ক'রে গেলেন।

'কোন স্কুলে পড়ায় ?' রঞ্জন জিগেস করলে।

'এই কাছেই যে মিউনিসিপ্যালিটির প্রাইমারি স্কুল আছে, সেখানে। ম্যাট্রিক পাশ ক'রে এর চেয়ে ভালো কাজ আর কী জুটবে, বলো।'

রঞ্জন একটু ভেবে বললে, 'তা তো ঠিকই।'

'ওর পড়াশুনোর জন্যেই তো ভাবনা। বি. এ.-টা পাশ করা থাকলে যা হোক একটা জোর হয়।'

'প্রাইভেট পরীক্ষা দেয়া যায় না ?'

অপব্যয়

'তাই তো চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু—' যে কথাটা হিরণ্ময়ী বিশেষ ক'রে এড়িয়ে যেতে চান, বার-বার ঘুরে ঘুরে সেটাই এসে পড়ে। কথা ঘুরিয়ে তিনি বললেন, 'এমন সময়ে এলে, অতসীর সঙ্গে তোমার দেখা হ'লো না।'

সেই কঠিন, পাথর-দৃষ্টি রঞ্জনের মনে পড়লো। ভালোই হয়েছে, অতসী যে বাড়ি নেই। সে থাকলে আরো বেশি কঠিন হ'তো তার পক্ষে।

আলাপ জমছিলো না। উভয় পক্ষেই আত্ম-সচেতনতা, কুণ্ঠা। উভয় পক্ষই মনে-মনে ভাবছে এক কথা। নাঃ—অসম্ভব, হাস্যকর, রঞ্জন মনে-মনে বললে, কেন আমি অপেক্ষা করছি। সত্যি-সত্যি কিছু তো বলবার নেই; উনি জানেন, আমি কেন এসেছি। কিন্তু সে বুঝতে পারছিলো না, কী ক'রে প্রসঙ্গটা উত্থাপন করবে। ঘরের চারদিকে সে একবার তাকিয়ে দেখলো—সময় কাটাবার জন্য। এমন হীন চেহারার কোনো ঘরে সে কখনো ঢোকেনি। রং-উঠে-যাওয়া, ড্যাম্পের জন্য নানা রকম রেখাচিত্র-আঁকা দেয়াল, এক কোণে টাঙানো নারকোলের দড়িতে এলোমেলো জামা-কাপড়, উল্টো দিকের দেয়ালের গা ঘেঁষে কয়েকটি জার্মানিতে ছাপা ঠাকুর-দেবতার ছবি, পুরোনো, লাল-হ'য়ে-যাওয়া খবরের কাগজে ঢাকা কেরোসিন কাঠের টেবিল, তার নিচে একটা হারিকেন লণ্ঠন আর কেরোসিনের বোতল—এ সবের দিকে তাকিয়ে রঞ্জনের মন রীতিমতো অসুস্থ হ'য়ে পড়লো। সে কখনো ভাবতে পারে নি, এ-রকম দারিদ্র্য সত্যি-সত্যি আছে। অন্তত, সে তা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হ'য়ে থাকতো, চিরকাল সে এমন ভান ক'রে এসেছে, যেন তা নেই। সে চাইতো না, কোনো উপলক্ষ্য তাকে তা মনে করিয়ে দেয়, সে ঘৃণা করতো তার

কোনোরকম সংস্পর্শে আসতে। এই দারিদ্র্যের অস্তিত্ব সে জানতো শুধু সরকারি হিশেবে, শুধু খবরের কাগজি তথ্য হিশেবে; তার পক্ষে, তার জীবনে কোনো অস্তিত্ব নেই তার। এবং এর সঙ্গে তার কোনোরকম ছোঁয়াছুঁয়ি হয়নি—এর আগে। সে কখনো গ্যাখেনি দারিদ্র্যের চেহারা—নিরেট, নিশ্ছিদ্র, বাস্তব দারিদ্র্য। বাস্তব—বড়ো বেশি বাস্তব: না-হয় দয়া ক'রে একটু মিথ্যাই হ'তো, একটু না-হয় ধার ক'রেই আনতো রং—কোনো স্বপ্ন থেকে, কোনো অভিমান থেকে। ধূসর, ধূসর—অন্ধতার একটানা বর্ণহীনতার মতো: কোনোখানে একটু ফাঁক নেই, একটু স্বস্তি নেই—যেদিকেই তাকাও, বাস্তবের ঠাশা দেয়ালে মাথা ঠুকে যাচ্ছে। কে চায় একে জানতে, কে চায় এর কাছাকাছি আসতে? রঞ্জন নিজে—ডিমের ভিতরকার অর্ধ-জাত পাখির মতো,সে নিরাপদ, নিশ্চিন্ত—সে, বিশেষ ক'রে, এই টানা-হেঁচড়া চায় না, এই ধূসরতায়, অবিশ্বাস্য অসহনীয়, বাস্তবে এই অভিযান। তার ভানের খোলশের মধ্যে সে সম্পূর্ণ: তা থেকে বেরিয়ে আসতে হ'লে সেটা তার সহ্য হয় না। চারদিকে তাকিয়ে হঠাৎ তার সমস্ত আত্মা যেন অসহ্য বিতৃষ্ণায় মোচড় দিয়ে উঠলো।

খানিক পরে হিরণ্ময়ী বলবার একটা কথা খুঁজে পেলেন, 'কলেজ থেকে আসছো—জলটল—কিছু খাবে?' কথাটা তিনি ক্ষীণ, দুর্বলভাবে বললেন, যেন, তিনি যা বলছেন, সে-বিষয়ে তিনি নিজেই নিশ্চিত নন।

ও-কথা শোনামাত্র রঞ্জন ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে ব'লে উঠলো, 'না—না, এক্ষুনি আমাকে আবার—এখন কিছু দরকার নেই, কিছু দরকার নেই এখন—' বলতে-বলতে সে রীতিমতো ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো। এখানে যদি কিছু খেতে হয়, হে ঈশ্বর!

হিরণ্ময়ী অনুরোধের পুনরুক্তি করলেন না, অন্য কথা পাড়লেন।—'বাড়িটা খুঁজে বের করতে অসুবিধে হয়নি তো?'

'না।'

'তবু যা হোক তুমি আমাদের দেখতে এলে।'

'আমি তো আগে জানতুম না যে আপনারা এখানে আছেন,' রঞ্জন ভদ্রতার স্বরে বললে।

'অনেকে আছে যারা জেনেও জানে না।'

রঞ্জনের তক্ষুনি তার মা-র কথা মনে পড়লো। সে কিছু বললে না। কিন্তু অভিযোগ শোনবার জন্য সে প্রস্তুত নয়: ভাগ্য যতই কঠিন হোক, তিক্ত হোক, তার প্রতিশোধ নেবার একটা উপলক্ষ্য সে নিজেকে হ'তে দেবে না। ওঃ, সে জানে—সে জানে। সবারই এক কাহিনী, সবারই এক দুঃখ। কতগুলো দুঃখ আছে যা মোটেও ইণ্টারেস্টিং নয়, যাতে কোনো রং নেই, রস নেই, শুনতে যা ভালো লাগে না। যা সমবেদনার উদ্রেক করে না, নিছক ক্লান্তি আনে। পৃথিবীতে এত দুঃখই বা কেন—চলতে-ফিরতে হোঁচট না-খেয়ে উপায় নেই, কেন তা একজনের ঘাড়ে এসে পড়বেই, অন্ধকারে লুকিয়ে-থাকা কোনো ক্লেদাক্ত পশুর মতো?

কিন্তু হিরণ্ময়ী বেশিদূর এগোলেন না। শাদা-হ'য়ে-আসা চুলের নিচে তাঁর চোখ—তাতে যেন বুদ্ধি ছিলো—তারও বেশি, বোধ ছিলো। তিনি যেন বুঝতে পারছিলেন রঞ্জনকে—তাঁর মনের কোনো অস্পষ্টতায়, কোনো অনির্ণেয় উপায়ে। 'খুব বেশি লোকের আমরা দেখা পাইনে,' একটু পরে, একটু হেসে তিনি বললেন, 'দেখা পাবার কথাও নয়।' ব'লে তিনি আবার একটু হাসলেন। শেষের কথাটায়—আর সেই হাসিতে—

হঠাৎ যেন তাঁর মুখে আলো জ্ব'লে উঠ্‌লো; তা যেন বিদ্রূপে আর অবিশ্বাসে ভরা, তা যেন ফুটে উঠ্‌লো তাঁর জীবনের দীর্ঘ দুঃখ-ভোগ থেকে, সমস্ত তিক্ত জ্ঞান, যন্ত্রণার উন্মীলন থেকে।

কিন্তু রঞ্জন লক্ষ্য করছিলো না; তার মনের মধ্যে একটা অসাড়তা। নিজেকে দিয়ে সে আগাগোড়া মোড়া—আত্মরক্ষার জন্য। 'উপরের ওরা থাকাতে আপনাদের সুবিধে হয়েছে,' কিছু-একটা বলবার জন্যেই সে বললে।

'হ্যাঁ, উপরের ওরা আছে।'

তারপর আর কথাবার্তা এগোলো না। রঞ্জনের কথা বলতে রীতিমতো কষ্ট হচ্ছিলো, অনেকক্ষণ ধ'রে তার তেষ্টা পেয়েছিলো, আর সে সহ্য করতে পারছিলো না। তবু—এক গ্লাশ জল চাইতে তার সাহস হচ্ছিলো না, পাছে জল চাইলেই হিরণ্ময়ী আবার জলখাবারের প্রসঙ্গ তোলেন। ব'সে থাকতে-থাকতে তার গলা কাঠ হ'য়ে যাচ্ছিলো শুকিয়ে।

এখন—চ'লে যাওয়া ছাড়া আর-কিছু করবার নেই। তার আগে ছোটো একটা কাজ—সেটা ক'রেই তাকে পালাতে হবে—আর যা-ই হোক, কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস সে সইতে পারবে না, কোনোরকমেই নয়। উঠে দাঁড়িয়ে সে আরম্ভ করলে, 'আচ্ছা—'

'আর-একটু বসবে না?'

'চলি আজ।' তারপর, যেন সেই কথারই জের টেনে, অত্যন্ত সাধারণভাবে রঞ্জন বললে, 'আপনাকে বলেছিলুম—এই যে।' পকেট থেকে ছোটো ক'রে ভাঁজ-করা নীল দশ টাকার নোট সে তক্তাপোশের উপর রাখলে। 'যা পারলুম।' ব'লেই বেরিয়ে এলো বারান্দায়।

কোনো কথা না-ব'লে হিরণ্ময়ী এলেন সঙ্গে-সঙ্গে। একটা কথা, কৃতজ্ঞতার একটা কথা নয়! স্বস্তির সঙ্গে-সঙ্গে রঞ্জনের একটু বিস্ময়ও হ'লো। বিধবার মুখেরও যেন কোনো ভাবান্তর ঘটেনি। তিনি নিতে জানেন, যে দেয়, তাকে তিনি ছোটো করেন না।

হিরণ্ময়ী বললেন, 'আর-একদিন এসো, বিকেলের দিকে—অতসী তখন থাকে। যদি না তোমার খুব কষ্ট হয়—'

রঞ্জন তাড়াতাড়ি বললে, 'আসবো।'

'এদিক দিয়ে আমাদের একটা আলাদা দরজা আছে, সেটা প্রায়ই খোলা থাকে। আবার যদি আসো, ধাক্কাধাক্কি করতে হবে না।'

রঞ্জন সাইকেলটাকে দেয়ালের সঙ্গে ঠেশ দিয়ে রেখেছিলো। সেটা হাতে ক'রে সেই দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। হিরণ্ময়ী সঙ্গে-সঙ্গে আসছিলেন। সে তাঁর দিকে একবার তাকিয়ে বললে, 'আপনার ঘুমের ব্যাঘাত ক'রে গেলুম।'

হিরণ্ময়ী একটু হাসলেন। শেষ মুহূর্তে রঞ্জনের মনে হ'লো, যেন সে-ই একটা অনুগ্রহ নিয়ে চ'লে আসছে।

ঘরে ফিরে এসে হিরণ্ময়ী সেই তাল-পাকানো দশ টাকার নোট তুলে নিলেন। একটা নয়, তিনটে নোট। তিরিশ টাকা! এত টাকা দিয়ে কী হবে! এত টাকা কখনো তাঁর মনে ছিলো না, এ তো স্রেফ অপব্যয়!

বিকেলে, অতসী যখন ফিরে এলো, তিনি বললেন, 'রঞ্জন এসেছিলো দুপুরবেলা।'

হে বিজয়ী বীর

অতসী ঘরের এক কোণে কাপড় ছাড়ছিলো, মুখ ফিরিয়ে তাকালো মা-র দিকে।

'তিরিশ টাকা দিয়ে গেছে,' হিরণ্ময়ী বললেন, শান্তভাবে।

আঁচলটা কাঁধের উপর ফেলে অতসী ফিরে দাঁড়ালো। 'কী বললে ?'

'টাকা দিয়ে গেছে তিরিশটা।'

অতসীর মুখ যেন মুহূর্তের মধ্যে শক্ত আর শাদা হ'য়ে জমে গেলো। খানিকক্ষণ সে দাঁড়িয়ে রইলো একভাবে শূন্য দৃষ্টিতে ; কোনো কথা বললে না।

চার

অন্ধকারে আলাপ

সেই রাত্রে, আলাদা বিছানায় শুয়ে-শুয়ে মা মেয়ে কারো চোখেই ঘুম আসছিলো না। দু-জনেরই মনের ভাবনাগুলো অন্ধকারে পাখা মে'লে দিয়েছে। পাতলা, ছোটো-ছোটো পোকার মতো, সেই ভাবনাগুলো, ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যাচ্ছে ঘুমের কিনার, ঠিক ঘুমের আগেকার স্বপ্নের মতো এলোমেলো, অসংলগ্ন। সময় ভারি হ'য়ে আছে অন্ধকারের বুকের উপর: যেন সময়ের চিরন্তন ফোয়ারার মুখ আটকে গেছে, মুহূর্তগুলি চুঁইয়ে-চুঁইয়ে বেরোচ্ছে অতি কষ্টে। হিরণ্ময়ী একবার পাশ ফিরলেন। তাঁর কথা বলার ইচ্ছে একটা ব্যাধির শামিল হ'য়ে উঠছিলো। সমস্তটা বিকেল আর সন্ধে অতসী অদ্ভুতরকম চুপ ক'রে ছিলো। তাকে ঘিরে যেন একটা নিষেধের বেড়া। সে-বেড়া ভাঙতে তিনি সাহস পাননি। শুধু মাঝে মাঝে, আড়চোখে তিনি তাকিয়েছেন তার মুখের দিকে: সে-মুখ শূন্যতার ছবি, তা কিছু বলেনি। বিকেলবেলায় সে বারান্দায় একটা মোড়া নিয়ে ব'সে বই পড়েছে—যতক্ষণ চোখে দেখা যায়, একবারও যেন পৃষ্ঠা থেকে চোখ তোলেনি। সরোজ একবার এসেছিলো; কিন্তু নিষেধের ধাক্কা খেয়ে সে-ও, অতসীকে পাশ কাটিয়ে, যেন তাকে লক্ষ্যই না-ক'রে ঢুকে গিয়েছিলো ঘরের মধ্যে। সেখানে হিরণ্ময়ীর সঙ্গে দেখা, তিনি বালিশে কাচা ওয়াড় পরাচ্ছিলেন। সরোজ চুপ ক'রে তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালো। তার মুখের দিকে না-তাকিয়েই হিরণ্ময়ী বুঝতে পারলেন, তার মনে কী আছে।

হে বিজয়ী বীর

একটু পরে সরোজ জিগেস করলে, 'কী হয়েছে, মাসিমা ?'

'কী হয়েছে ? কার কী হয়েছে ?'

'অতসীকে আজ বড্ড গম্ভীর মনে হচ্ছে,' সরোজ হাসবার চেষ্টা করলে।

'হ'লোই বা গম্ভীর।'

'কোনো কারণই কি নেই ?'

'জানিনা।'

আর সেখানেই আলাপ শেষ হ'লো। হিরণ্ময়ীর খুব ইচ্ছে ছিলো, খবরটা তাকে দেয়, কিন্তু অতসীর মেজাজের কথা ভেবে চুপ ক'রে গেলেন। সরোজকে বলতে না-পেরে তাঁর মন-খারাপ লাগছিলো, অথচ মেয়ের রাগের ভয়ও কাটিয়ে উঠতে পারছিলেন না। সন্ধেটা কাটলো চুপচাপ। শেষ পর্যন্ত এখন, এই রাত্রিতে, হিরণ্ময়ী আর সহ্য করতে পারছিলেন না। মেয়ের বিছানার উদ্দেশে তিনি কান পেতে রইলেন, যদি এতটুকু শব্দও পাওয়া যায়, সে যে জেগে আছে, তার একটু ইঙ্গিত। মনে-মনে তিনি যেন জানতেন যে অতসী ঘুমোয়নি। তার অমন চুপচাপ থাকা থেকেই তা বোঝা যায়। ঘুমোনো মানুষের নিশ্বাসে শব্দ হয়— আর অতসী এমন শান্ত, এত বেশি শান্ত! হিরণ্ময়ী যেন প্রায় দেখতে পেলেন, অন্ধকারে তার অন্ধকার চোখ তাকিয়ে রয়েছে। হাতপাখাটা তুলে নিয়ে তিনি সশব্দে একটু হাওয়া করলেন। তারপর ব'লে উঠলেন, 'উঃ, কী গরম।'

পাশের বিছানা থেকে গ্রীষ্মাধিক্য সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য এলো না। তবু তিনি আবার চেষ্টা করলেন, 'পচিয়ে মারলে। কার সাধ্য যে ঘুমোয়!'

অন্ধকারে আলাপ

এইবার পাশের বিছানা থেকে সাড়া এলো : 'তুমি এখনো জেগে আছো, মা ?' বড়ো সহজেই অতসী ধরা দিলে, হিরণ্ময়ীর মনে হ'লো। কথা কইবার জন্য সে-ও যেন প্রস্তুত হ'য়েই ছিলো।

'তুই ঘুমোসনি ?'

দু-জনেই বিস্মিত হবার ভান করলে। দু-জনেরই এমন ভাব যেন এই মাত্র জেগে উঠেছে। অতসী একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে শোবার ভঙ্গিটা বদলালো। আগেকার চাইতে তার আরাম লাগছিলো নিশ্চয়ই। ঘরের অন্ধকারের মধ্যে কী-যেন একটা জিনিশ কেউ আঁকড়ে ধ'রে ছিলো, এইবার সেটায় ঢিল দিলে।

একটু পরে হিরণ্ময়ী কথা পাড়লেন, 'আজ না তোর সেই ট্যুশানির খোঁজ নেবার কথা ছিলো ?'

'নিয়েছিলাম। ওখানে সুবিধে হবে না।'

'যদি টাকা কম দিতেও চায়—'

'আর-একটার খোঁজ করছি।'

হিরণ্ময়ী খানিকক্ষণ পাখা নাড়লেন। তারপর আস্তে-আস্তে, যেন নানাদিক ভেবে-চিন্তে বললেন, 'এ-রকম ক'রে আর বেশিদিন চলতে পারে না।'

'চলুক না, মা, চলতে চাও।'

'তোকে দিয়ে এর বেশি অনেক কিছুই তো হ'তে পারে।'

'তাহ'লে হবে।'

'হবে! তুই, দেখছি, একেবারে নিশ্চিন্ত।'

'চিন্তা ক'রেই বা তুমি কী করতে পারো ?'

আবার একটু চুপচাপ। ছাড়া-ছাড়া, টুকরো-টুকরো আলাপ হচ্ছিলো। হিরণ্ময়ী সাবধানে এগোচ্ছিলেন, প্রতি পদে মেয়েকে যাচাই ক'রে-ক'রে। তিনি বুঝতে পারছিলেন, ওর মনে একটা কাঁচা জায়গা আছে, একটুতেই যা টনটন ক'রে ওঠে। সেখানে ঘা দিলে চলবে না।

'আমি ভাবছিলুম, তুই যদি আরো পাশ-টাশ করতে পারতিস—'

'হবে, মা; তুমি যা চাও, তা-ই হবে।' অতসীর কণ্ঠস্বরে একটু অধৈর্য ফুটে উঠলো, যার অর্থ হিরণ্ময়ী বুঝতে পারলেন না। 'এ-ই তো উপায়,' অত্যন্ত মৃদুস্বরে তিনি বললেন, 'এ-ই তো উপায়। আর, এমন মন্দই বা কী? আর যা-ই হোক, এতে স্বাধীনতা আছে। কেন একজন মেয়েকে বিশেষ একটা বয়েসে বিয়ে করতেই হবে, আর বিয়ে ক'রে—'

কথাটা তিনি শেষ করলেন না। তাঁর মন চ'লে গেলো অতীতে, তাঁর নিজের বিবাহিত জীবনে—কান্নায় তিক্ত সব দীর্ঘ রাত্রিতে, অন্ধকারের পাথরের উপর চেপে-ধরা হতাশায়। ওঃ, সেই সব রাত্রি—আর সেই সব দিন, ছোটোখাটো দুশ্চিন্তায়, উদ্বেগে, অবিশ্রান্ত ঠোকাঠুকিতে, অশান্তিতে, অসামঞ্জস্যে ভরা। সে-সব দিন যে শেষ হ'য়ে গেছে, তাতে হিরণ্ময়ী খুশি। এখন যে-অবস্থায় তাঁরা আছেন, সেটা অনেক ভালো—কোনো সন্দেহ নেই, সেটা অনেক ভালো। আর যা-ই হোক, থাবা দিয়ে নাড়াচাড়া ক'রে সব নষ্ট ক'রে দেবার জন্যে কোনো স্বামী নেই। সেটা কম সান্ত্বনা নয়। স্বামীকে তিনি দেখতেন বিষের মতো: মৃত্যুতেও তিনি তাকে ক্ষমা করতে পারেননি। মৃত্যুতেও তিনি তার কাছ থেকে আলাদা, বিচ্ছিন্ন। আর



এখন নিজের বিবাহিত জীবনের শোধ তুলবেন তিনি মেয়ের উপর দিয়ে, তাঁর যত দুঃখ, সব ক্ষালন করবে অতসী। অতসী—সে থাকবে স্বাধীন আত্ম-নির্ভর; সূর্যের নিচে নিজের জন্য একটুখানি জায়গা সে-ও ক'রে নেবে; সে-ও বাঁচবে তার নিজের জীবন নিয়ে, নির্লিপ্ত। কেন সে ভয় পাবে—নিজের জন্য একটু জীবনের টুকরো সে ছিনিয়ে নিতে পারবে, এমন জোর তার আছে। তার আছে। একদিন—সে কোনো কলেজে কাজ পেতে পারে, কোনো স্কুলের হেডমিসট্রেস হ'তে পারে, এমনকি। মেয়েদের পড়াশুনো বছর-বছর কী রকম ছড়াচ্ছে! সমস্ত তিক্ত, ওঃ, তিক্ত সংগ্রামের পর সে হয়তো বেরিয়ে আসবে, জয়ী, একটি তীক্ষ্ণ, পরিচ্ছন্ন হাসি তার পথরেখায় ধ্বনিত। পৃথিবীর জন্য তার শুধু এ-ই—এই পরিচ্ছন্ন তীক্ষ্ণ হাসি, কোনো তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল অস্ত্রের মতো। আর, কোনো পুরুষ সেখানে নেই, কোনো পুরুষের পশু-হাত আসবে না তার জীবনকে নষ্ট ক'রে দিতে, লোভে অন্ধ মুঠির চাপে তাকে দু-টুকরো ক'রে ভেঙে ফেলতে। সবার উপর, সে পুরুষ-মুক্ত। এ-কথা ভাবতে হিরণ্ময়ীর বুকে যেন একটা আনন্দের বিদ্যুৎ খেলে গেলো যে পুরুষের কাছ থেকে অতসীর কিছু আশা করবার, কিছু প্রার্থনা করবার, কিছু ভয় করবার থাকবে না। এই তাঁর প্রতিহিংসা, তাঁর মৃত, অবিস্মৃত স্বামীর উপর, নিজের জীবনের উপর তাঁর সর্বশেষ প্রতিহিংসা। এবং তাঁর গৌরব, তাঁর জয়-স্তম্ভ! অতসীর বিয়ের জন্য তিনি ভাবেন না; এমনকি, তার আদৌ কখনো বিয়ে হয় কি না-হয়, সে-জন্য কোনো ভাবনা নেই তাঁর মনে। সেটা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক; তার কথাই ওঠে না। কেন সে বিয়ে করতে যাবে—কেন সে নিজেকে দিতে যাবে নিঃশেষে, নিঃসংশয়ে, অন্যের

হাতের খেলনা—যখন এত বড়ো পৃথিবী প'ড়ে আছে তার সামনে, তার জীবন আছে বাঁচবার, বাঁচাবার। মেয়ের বিয়ের চিন্তা, এমনকি, হিরণ্ময়ীর মনে একটু বিতৃষ্ণার উদ্রেক করতো। কোনো পুরুষ-সংস্পর্শ না-থাকাই সবচেয়ে ভালো, থাবার চড়-চাপড় থেকে মুক্তি পাওয়াই সবচেয়ে ভালো। আর, যদি কোনো পুরুষকে সে গ্রহণ করেই তার জীবনে তা হোক পরিপূর্ণ মুক্তিতে, আত্ম-প্রতিষ্ঠ সক্ষমতায়, মূলগত ও অনাহত একাকীত্বে—পরস্পরের মধ্যে মিশে যাওয়া, ডুবে যাওয়া, এক হ'য়ে যাওয়া—তা নয়, তা নয়। তাতে চলবে না। একটা অংশ অন্তত থাক, যা নির্লিপ্ত, নিঃসম্পর্ক, যা আলাদা। কোনোখানে, কোনোখানে একটা বাধা, যার পর আর এগোনো যাবে না। সেই নুয়ে-পড়া, লুটিয়ে-পড়া, গ'লে-যাওয়া ভালোবাসা—তা দিয়ে কী হবে—তা শুধু আঘাত দিতে পারে, আর নিজের উপর ফিরে আসতে পারে রূঢ়তর আঘাতে। একজন লোক—সে পুরুষ হোক কি মেয়ে—তার যেন নিজের আত্মার উপর সম্পূর্ণ দখল থাকে; নিজের আত্মায় একজন যেন একা থাকতে পারে, থাকতে পারে পরিচ্ছন্ন।

'আমি ছেলেবেলায় ভাবতুম,' হিরণ্ময়ী যেন নিজের সঙ্গেই কথা কইতে লাগলেন, 'বিয়ে করা ছাড়া মেয়েদের উপায় নেই। কিন্তু এখন দেখছি—'

'এখনই কি উপায় আছে, মা—শেষ পর্যন্ত?'

'কিন্তু বিয়ে ব্যাপারটা বদলেছে,' একটু চুপ ক'রে থেকে হিরণ্ময়ী বললেন।

'তা-ই আশা করা যাক।'

আবার নীরবতা। দূরে রেল-লাইন দিয়ে একটা ট্রেন যাচ্ছে; তার ভারি, মন্থর শব্দ যেন গভীর ঘুমের সঙ্গে সুর-মেশানো। অন্ধকারকে তা ছিঁড়ে দিলে না; বরং, তাকে ঘিরে বাইরের অন্ধকার আরো যেন নিবিড় হ'য়ে উঠলো। মা মেয়ে দু-জনেই চুপ ক'রে শুনলো সেই শব্দ। তা একটা মোহের মতো—এই মধ্যরাত্রে, এই অন্ধকার ঘরে, ঘুমের আগে। তা যেন কখনো শেষ হবে না, অবিশ্রান্ত নিজের পুনরাবৃত্তি ক'রে চলবে; এ যেন কোনো শব্দ, যা উৎসারিত হচ্ছে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে, সেই পৃথিবী-কেন্দ্রের অন্ধকার রহস্যে তা উত্তপ্ত। মন্থর, মন্থর, সময়ের বুকের উপর ভারি, উত্তপ্ত চাপ দিয়ে-দিয়ে যাচ্ছে এই শব্দ, সময়কে আঙুরের মতো নিংড়ে, যতক্ষণ না তা পিষ্ট হ'য়ে যায়, চূর্ণ হ'য়ে যায়।

কিন্তু আস্তে-আস্তে সে-শব্দ ক্ষীণ হ'তে-হ'তে দূর থেকে দূরতর দিগন্তে মিলিয়ে গেলো; যেন একটা আকস্মিক প্রেত রাত্রির আত্মা থেকে উঠে এসে আবার মিলিয়ে গেলো রাত্রির মধ্যে। তারপর হিরণ্ময়ী হঠাৎ ব'লে উঠলেন: 'তুই এত বেশি অবিশ্বাস করিস কেন, অতসী?'

অতসী মৃদুস্বরে একটু হেসে উঠলো।

'তোর এই বয়েস—এখন তোর আশা করা উচিত।'

'আশা ছাড়া আর-কিছুই তো করছিনা। কিন্তু কোনটা কী, তা জানতে ক্ষতি নেই।'

'মাঝে-মাঝে ভুললেই বা ক্ষতি কী?'

অতসী কোনো কথা বললে না। হিরণ্ময়ীই আবার বললেন—স্পষ্ট এমনকি, একটু রূঢ়ভাবে, 'তোর ভিতরটা দিন-দিন যেন শক্ত হ'য়ে যাচ্ছে।'

হে বিজয়ী বীর

অতসী শিয়রের বালিশটা উল্টিয়ে নিলে। 'মনটাকে নরম করতে হ'লে,' মৃদু, এমনকি লঘুস্বরে সে বললে, 'অবসর দরকার। তা আমার নেই। অনেক কাজ।'

আর সেই কথায়, আর কথার সুরে হিরণ্ময়ীর বুকের ভিতরে মুহূর্তের জন্য মোচড় দিয়ে উঠলো। হয়তো তিনি মেয়ের কাছ থেকে বড়ো বেশি দাবি করছেন, বড়ো বেশি। কী জীবন তার, তিক্ততার বিরাট স্তূপ, কী অন্ধ, নির্বোধ এক শক্তি তাকে ঠেশে ধরেছে চারদিক থেকে, সারাক্ষণ চেপে ব'সে আছে তার উপর, সারাক্ষণ। রাত্রির অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ধাবমান রেলগাড়ির শব্দ যেমন সময়কে নিষ্পেষণ ক'রে যায় কঠিন উত্তাপে। এই তো অতসী—জীবন তার জন্য কী করেছে যে সে নরম হবে, মধুর হবে? ঘরের অন্ধকারের মধ্যে তাকিয়ে, হিরণ্ময়ীর মন মেয়ের জন্য দুঃখে আর করুণায় ভ'রে গেলো—যেমন আগে কখনো হয়নি। ছেলেমানুষ, ছেলেমানুষ। সেই মুহূর্তে, অতসীকে তিনি যেন নিজের মধ্যে অনুভব করলেন, অন্ধকার ঘরে একা শিশুর মতো। অন্ধকারের শেষ নেই, শেষ নেই অন্ধকার ঠেলে-ঠেলে এগোবার। কখনো-কখনো তা দুঃস্বপ্নের মতো ভয়াবহ। মনের মধ্যে একটা বোবা আতঙ্ক—তার ভাষা নেই, তা স্পষ্ট নয়, তা নিজেই নিজেকে চেনে না। যদি একদিন জেগে উঠে দেখা যেতো যে স্বপ্ন ভেঙে গেছে—কিন্তু সে-দিন কখনো আসে না, দুঃস্বপ্ন নিজের ভিতর থেকে নিজের খোরাক জুটিয়ে নেয়, মনে হয় এর শেষ নেই। কোথায় শেষ? এই তো জীবন, এই তো বাস্তব। আর হঠাৎ, হিরণ্ময়ীর চোখের সামনে অতসীর ছবি ফুটে উঠলো, যেমন সে ছেলেবেলায় ছিলো, রোগা, কালো এক মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে-ওখানে, কখনো ব'সে আছে

চুপচাপ, সে-ই জানে, কী ভাবছে, পরনের ফ্রকটা সাফ নয়, ঝুঁটি-বাঁধা ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল অযত্নে লালচে হ'য়ে যাচ্ছে। তাকে দেখে ঠিক ঈশ্বরের দান মনে হ'তো না; মনে হ'তো না, স্বর্গ থেকে সে সোজা নেমে এসেছে মায়ের কোলে। সে কাউকে কুমারীমাতার কোলে যীশুর কথা মনে করিয়ে দিতো না—না, এমনকি, বিলিতি পেটেণ্ট ফুডের বিজ্ঞাপনের ছবির কথাও নয়। তার যেন পৃথিবীতে মূল নেই; সে যেন ভেসে এসেছে, অনাকাঙ্ক্ষিত। কিন্তু তা-ই যে। সে ভেসে এসেছে—ঘৃণার প্রবল জোয়ারের টানে; জন্ম তার ঘৃণায়। সে বিবাহের সন্তান, ঘৃণার সন্তান। কেউ তাকে চায়নি। কারো মনে ভাবনা ছিলো না তার জন্য। আর হিরণ্ময়ী—তিনি তাঁর শিশুকে ভালোবাসেননি, মায়ের যেমন ভালোবাসা উচিত; তার পিতার প্রতি তীব্র ঘৃণার খানিকটা মাঝে-মাঝে যেন তারও প্রতি সংক্রমিত হ'তো: এমন সময় আসতো যখন তাঁর ইচ্ছে করতো তাকে কোল থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে। ও মরুক—তাঁর লজ্জার, তাঁর অবমাননার, তাঁর পাপের এই জীবন্ত চিহ্ন লুপ্ত হ'য়ে যাক। ও যে ওর বাবারও মেয়ে, ওর এই অপরাধ তিনি যেন কখনো ক্ষমা ক'রে উঠতে পারলেন না। ও যেমন বড়ো হ'য়ে উঠতে লাগলো, তিনি আতঙ্কিত দৃষ্টিতে ওকে লক্ষ্য করতে লাগলেন—যদি ওর বাবার সঙ্গে ওর কোনো মিল ধরা পড়ে, যদি কোনোরকমে, অতি তুচ্ছ বাইরের ব্যাপারেও ও হ'য়ে ওঠে ওর বাবার মতো। শরীরের কতগুলো ভঙ্গি, কথা বলবার ছোটো-খাটো ধরন—ওঃ, তখন মেয়ের দিকে তাকাতে তাঁর অসহ্য লাগতো। ভাগ্যিশ, ভাগ্যিশ ওর চেহারা মোটামুটি ওর মামাবাড়ির ছাঁচের হয়েছে—ওর ভুরু আর থুৎনি ঠিক ওর মা-রই মতো, লোকে বলতো।

তবু, মাঝে-মাঝে, ও যখন কথা বলতে-বলতে হঠাৎ মাথা-ঝাঁকানি দিয়ে ওঠে, কি বিরক্ত হ'লে ঠোঁটের একটা ভঙ্গি করে, কি খেতে ব'সে ভাতের গ্রাসের মাঝখানে হঠাৎ থেমে গিয়ে কী যেন ভেবে নেয়—এমনি অনেক ছোটোখাটো জিনিশে, গলার স্বরে, কথার ব্যবহারে, অসংখ্য নিঃসংশয় উপায়ে ও মনে করিয়ে দেয়—যে-কথা হিরণ্ময়ী সবচেয়ে বেশি ভুলে থাকতে চান। সে-সব সময়ে তিনি চোখ ফিরিয়ে নেন, মুহূর্তের জন্য তাঁর মন মেয়ের প্রতি বিরূপ হ'যে ওঠে। এখনো, এতদিন পরেও তিনি অতসীকে তার বাবার মেয়ে হবার জন্য ক্ষমা করতে পারেন না।

'তোর সঙ্গে,' হিরণ্ময়ীর ক্লান্ত হাত থেকে পাখাটা খসে পড়লো, 'তোর সঙ্গে আজকাল কথা বলতেই যে ভয় করে।'

'আমারও ভয় করে অন্যের সঙ্গে কথা কইতে,' অতসী জবাব দিলে, 'নিজেরই জন্য।'

'নিজেরই জন্য!' হিরণ্ময়ী ঠিক বুঝতে পারলেন না। কিন্তু অতসী বোঝাবার চেষ্টা করলে না; তার পাশ ফিরে শোবার শব্দ শোনা গেলো।

আর তখন হিরণ্ময়ী বললেন, 'রঞ্জন ছেলেটি বেশ।' এমনভাবে বললেন যেন এতক্ষণ দু-জনের মধ্যে রঞ্জনের কথাই হচ্ছিলো।

অতসী শুধু বললে, 'হুঁ।'

'ও সেদিন যখন বলেছিলো, আমি বুঝতে পারছিলুম না, বিশ্বাস করবো কি করবো না।'

'যাক, তুমি যা চেয়েছিলে, তা তো হ'লো।'

'কিন্তু এত টাকা! এত টাকায় তো আমাদের দরকার নেই।'

'তাহ'লে কিছু ফিরিয়ে দাও।'

'তা কি হয়!'

'না, হয় না! তাতে যে ওরই অপমান।'

অতসীর কথার ব্যঙ্গের সুর হিরণ্ময়ীর কানে ধরা পড়লো না। 'এত টাকা—' তিনি বলতে লাগলেন, 'আমি কখনো ভাবিনি। এমন ছেলে যে হয়, কখনো ভাবতে পারিনি।'

'বড়োলোকের ছেলে—অন্যের একটু উপকার করবার সুখ ছাড়বে কেন?'

'বড়োলোকের ছেলে তো কতই আছে।'

'তাদের বাজে খরচও আছে।'

'পরের জন্য কে করে এতটা?'

'বাঃ, করে না! অন্যকে দয়া করা—তার বিলাসিতাই কি কম?'

'যা-ই বলিসনে কেন, এটা খুবই আশ্চর্য—'

'তুমি যদি মুখ ফুটে চাইতেই পারো, আর-একজন যে দেবে, এ আর বেশি কথা কী?'

'বেশি নয়!' উত্তেজনার ঝোঁকে কথাটা একটু উচ্চস্বরেই বেরুলো হিরণ্ময়ীর মুখ দিয়ে। কিন্তু পরমুহূর্তেই তিনি যেন মেয়ের মনের একটু আভাস পেলেন। নরম সুরে বললেন, 'সহজে কি আর কেউ চাইতে পারে—'

'থাক মা,' অতসী তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলো, 'সে-কথা থাক।'

আবার নীরবতার ছেদ—অন্যান্য বারের চাইতে অনেক দীর্ঘ। নীরবতায়, অন্ধকার যেন গা-মোড়ামুড়ি দিয়ে আবার জমাট হ'য়ে

বসলো। হিরণ্ময়ীর মনে হ'লো, অতসী ঘুমিয়ে পড়েছে। নীরবতা এমন সম্পূর্ণ, আর যেন কোনো কথা বলা যাবে না। তবু, নিজেরই কাছে একটা শেষ মন্তব্যের মতো, তিনি বললেন, 'যাক, ভালোই হ'লো।'

সঙ্গে-সঙ্গে, অন্ধকারে বেজে উঠলো অতসীর স্বর, 'না-হওয়াটাই বা এমন মন্দ ছিলো কী ?'

স্পষ্ট, সোজা প্রশ্ন, কোনো উত্তর নেই। হিরণ্ময়ী প্রশ্নটাকে অনুভব করলেন, একটা তীরের নগ্ন ধারালো ফলার মতো; নিজের ভিতরে তিনি যেন কুঁকড়ে গেলেন। অতসীর মনটা যেন কোথায় একটু বিকৃত; যা-কিছু তার গায়ে লাগে, ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে। ওর মনটা যেন মাঝখানটায় চেপ্টে-দেয়া আয়না, সব কিছুর ছায়া পড়ে অস্বাভাবিক, কিম্ভূত হ'য়ে। কিছুই ও সহজে গ্রহণ করতে পারে না, এত কলহ ওর মধ্যে, এত সংশয়। ও যেন কোমর বেঁধে লেগেছে পৃথিবীর সঙ্গে ঝগড়া করতে; ওর মধ্যে চাপা একটা হিংস্রতা যেন সব সময় আঘাত দেবার জন্য উদ্যত। কিন্তু এতে তো ও নিজেকেই আঘাত দেবে সবচেয়ে বেশি: কাউকে শাস্তি দেবে না, নিজেকে সব চেয়ে কম। তা নষ্ট ক'রে-ক'রে যাবে, যা-কিছু হাতের কাছে আসে, যতক্ষণ না তাকেই ধ্বংস করে। ভাবতে হিরণ্ময়ীর শঙ্কা হয়। যদি কখনো ও নিজের মধ্যে শান্ত হ'তে পারতো, নিজেকে ভুলে থাকতে পারতো...

তাঁর চিন্তার সূক্ষ্ম তন্তুগুলোকে ছিঁড়ে দিয়ে অতসী আবার প্রশ্ন করলে, 'না হ'লেই বা খারাপ হ'তো কী ? চ'লে তো যাচ্ছিলোই—চ'লে যেতোও। মাঝখান থেকে এই—এ না হ'লে এমন-কী এসে যেতো ?'

হিরণ্ময়ী একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'আজ তুই এ-সব বলছিস, কিন্তু সেদিন যখন ওদের বাড়ি গেলুম—'

তীব্র রুদ্ধস্বরে অতসী ব'লে উঠলো, 'সেদিন আপত্তি করিনি—না, করিনি! যদি জানতাম, যদি জানতাম—' অন্ধকারে অতসীর অসমাপ্ত কথা হারিয়ে গেলো।

হিরণ্ময়ী একটু অপেক্ষা করলেন, অতসী আর-কিছু বলে কিনা। তারপর ডাকলেন, 'অতসী!'

অতসী উত্তর দিলো না।

'অতসী।'

অতসী বালিশের মধ্যে গভীরভাবে মাথা ডুবিয়ে দিয়ে বললে, 'আর নয়, মা। বড়ো ঘুম পাচ্ছে।'

পাঁচ

প্রদর্শনীতে এক সন্ধ্যা

পরের রোববার, শহরের এক মহিলা-সমিতির উদ্যোগে এক শিল্প-প্রদর্শনী খোলা হয়েছে, অতসী গেছে সেখানে। বুড়িগঙ্গার ধারে একটা ফাঁকা জায়গায় বাঁশের বেড়া খাটিয়ে কাপড়ে ঘিরে দেয়া হয়েছে—বাইরের ফটক রঙিন কাগজে সাজানো। ঢুকতে যে-দু'আনা দক্ষিণা, তা যাচ্ছে একটা নতুন মেয়ে-স্কুলের সাহায্যে। ঢাকার স্কুল-কলেজের মেয়েদের এ-সব ব্যাপারে অফুরন্ত উৎসাহ; তারা নতুন আলো পেয়েছে—আত্মোন্নতি ও আত্মপ্রবৃদ্ধিতে যে-তীব্র প্রাদেশিক আগ্রহ, তা তাদের আছে পুরো মাত্রায়। অগ্রণীদের মধ্যে দু-একটি মেয়ে স্কুলে অতসীর সঙ্গে পড়তো; এ-সব ব্যাপার থেকে একেবারে আলাদা থাকতে সে, তাই, পারতো না। থাকতে যে চাইতো, তাও নয়। ও-সব জায়গাতেই—যেখানে মেয়েরা কোনো শখের নাটক করছে, কি কোনো বস্তি-পাড়ার মেয়েদের বর্ণপরিচয় শেখাচ্ছে, কি খুলছে কোনো স্বদেশী বাজার—ও সব জায়গাতেই সে একটু ছাড়া পেতো: যেটুকু সময় পেতো, জুটতো গিয়ে তাদের সঙ্গে। প্রদর্শনীতে তার এক বন্ধুর একটা স্টল ছিলো, সে তার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলো কতগুলো শেলাইয়ের কাজ, দ্বিগুণ দাম ক'রে। রুমাল, টেবল-ক্লথ ইত্যাদির উপর সূক্ষ্ম শেলাই সে বেশ ভালোই করতো—কিন্তু যতটা পরিশ্রম তাকে করতে হ'তো, সে অনুযায়ী দাম সে সাধারণত পেতো না; প্রদর্শনী-গোছের ব্যাপার হ'লেই তার সুযোগ।

প্রদর্শনীতে এক সন্ধ্যা

বাঁশের বেড়ার পিছনে কাঠের মাচায় সব জিনিশ সাজানো; তার পিছনে দাঁড়িয়ে অতসী তার বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছে। তার পরনে একটা খদ্দরের শাড়ি—শাদার উপর এখানে-ওখানে হলদের ছিটে। ব্লাউজটার রং মেটে সিঁদুর; আধুনিক ফ্যাশান সম্বন্ধে তার মা-র আপত্তি সত্ত্বেও সে এটার হাতা কাঁধের ঠিক নিচেই কেটেছিলো—এটা তার প্রিয় জামা। একটু বাঁ দিকে চওড়া সিঁথি-কাটা তার চুল চকচকে পাতের মতো দু-দিকে নেমে এসেছে। তাকে দেখাচ্ছিলো বেশ পরিচ্ছন্ন, আত্ম-সম্পূর্ণ—আর তার মনটাও ছিলো বেশ হাসিখুশি।

'তোর গায়ের ব্লাউজটা ভারি চমৎকার তো।' বন্ধুটি বলছিলো।

'চমৎকার!' অতসী হেসে উঠলো, 'হাতাটা কেমন? একখানা হাত মাথার উপরে তুলে সে একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলো।

'যে-জিনিশ নেই,' বন্ধুটি দুষ্টুমি ক'রে বললে, 'তার আবার ভালো আর মন্দ কী।'

'নেই!' অতসীর কণ্ঠস্বরে খুশি উপচে পড়লো, 'হাতটা খোলা থাকলে কী যে আরাম লাগে।'

অন্য মেয়েটি নিচের ঠোঁট কামড়ে একটু ভাবলো। তারপর বললে, 'আর-কিছুদিন গেলে, দেখবি, ফুলহাতা আর গলাবন্ধ জ্যাকেটই ফ্যাশানের চূড়ান্ত হবে।'

'ঈশ্বর না করুন।'

'মন্দই বা কী?'

'লেফাফা-আঁটা চিঠি হ'য়ে থাকতে ইচ্ছে করে কার?'

'কিন্তু লেফাফা-আঁটা চিঠিতেই যে রহস্য—না জানি কী আছে।

যে-পোস্টকার্ড অকাতরে আত্মপ্রকাশ করে, তাকে নিয়ে মাথা ঘামায় কে ?'

অতসী হেসে উঠলো।—'মাথা-ঘামানোর উপলক্ষ্য হওয়াটাই তাহ'লে আসল কথা ?'

'এক হিশেবে—হ্যাঁ, তা-ই তো, তা ছাড়া আর কী ? মেয়েদের যে পোশাক নিয়ে এত ভাবনা, সে তো পুরুষেরই—'

অতসী তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে তার বন্ধুর মুখ চেপে ধরলো।—'বলিসনে, ও-কথা বলিসনে—ও-কথা শুনলে আমার গা জ্ব'লে যায়।'

অতসীর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মেয়েটি হেসে উঠলো। 'কেন,' সে জিগেস করলে, 'এত রাগ কেন তোর ?'

'রাগের কথা নয়, মিথ্যে কথা।'

'কোনটা মিথ্যে ?'

'এই, তুই যা বলতে যাচ্ছিলি—যে মেয়েরা যে সাজে, তা শুধু পুরুষেরই মনকে টানবার জন্য।'

'তা নয় তো কী ?'

'কেন ? এমনি একজন সাজতে পারে না, নিজের খুশিতে, নিজের ভালো লাগবে ব'লে ?'

'আশে-পাশে কেউ দেখবার না-থাকলে ভালোই লাগে না যে।'

তাকের উপর সাজানো জিনিশগুলো নিয়ে অতসী একটু নাড়াচাড়া করলে। তারপর চোখ না-তুলেই বললে, 'পুরুষের মুখে না-তাকিয়ে কি আমাদের কোনোদিকেই এক পা চলবার উপায় নেই ?'

অন্য মেয়েটি বাঁ হাত দিয়ে তার খোঁপাটা একবার পরখ ক'রে নিলে।

বললে, 'তাতে এমন দোষই বা কী?' মেয়েটি দেখতে ছোটোখাটো, পাৎলা, মুখটি একটু চোখা রকমের। কথা কইবার সময় মাঝে-মাঝে তার উপরের ঠোঁটটি একটু উঠে যায় ছেলেমানষি ঢঙে। এমন ছেলেকে সে জানতো, তার ঠোঁটের ঐ ভঙ্গিটা যার ভালো লেগেছে। বয়েস তার আঠারো, যৌবনের নতুন চেতনা তার রক্তে। অতসী চুপ ক'রে আছে দেখে সে-ই আবার বললে, 'আমাদের মায়েরা আজকালকার পোশাকে আপত্তি করেন, বলেন—সেটা অসভ্যতা। কিন্তু আগেকার দিনের গলাঢাকা পোশাক যে ছিলো শতগুণে বেশি—উদ্দীপক। লেফাফা-আঁটা চিঠি ঘিরেই কৌতূহলের শেষ নেই। আর এদিকে—দেখতে-দেখতে সবই স'য়ে যায়। আবরণ যত গাঢ়, আমন্ত্রণ তত তীক্ষ্ণ। যতই মেয়েরা নিষেধের আবরণ দিয়ে নিজেদের ঢেকে রাখে, ততই তো তারা মারে। লজ্জা স্ত্রীলোকের অস্ত্র।'

'কিন্তু একেবারে অন্য রকম কোনো জীবন কি হ'তে পারে না?' অতসী মুখ তুলে তার বন্ধুর দিকে তাকালো; তার প্রশ্নটা হঠাৎ-ছুটে-যাওয়া তীরের মতো যেন বিঁধলো গিয়ে মেয়েটির মুখে। 'অন্য কোনো জীবন—একেবারে মুক্ত—'

অন্য মেয়েটি চেঁচিয়ে হেসে উঠলো।—'তুই দেখছি ভীষণ রকম আধুনিক হ'য়ে উঠছিস। "কাহারও তাঁবে থাকিব না"—না, কী?'

'কেনই বা থাকবো, বলতে পারিস?'

মেয়েটি কাঁধ-ঝাঁকুনি দিলে। তার নবযৌবনের উন্মাদনা থেকে বললে, 'তাঁবে কে কাকে রাখে, তা শেষ পর্যন্ত বলা যায় না। একবার ভালোবাসায় পড়লে পুরুষমানুষের যে কী অবস্থা হয়—' মেয়েটি একটু হাসলো, যেন কিছু মনে ক'রে।—'সেইজন্যই তো আব্রু দরকার; সেইজন্যই তো নিজেকে

কিন্তু সে-মিল এত কম, অতসী ভাবছিলো, এত কম! যার সঙ্গে মেলে, তাকে হয়তো পাওয়া যায় না। যাদের সঙ্গে দিন কাটাতে হয়, তাদের কাছে আমি আবছায়া। অন্ধকার রাত্রে মশালের লাল আলোয় অর্ধ-উদ্ভাসিত মূর্তির মতো আমরা একে অন্যের কাছে।

অন্য মেয়েটি এসে অতসীর কাঁধে হাত রাখলে।—'তোর রুমাল বেচলুম আধ ডজন।'

অতসী বন্ধুর মুখের দিকে তাকালো; কিছু বললে না।

'দাম নিয়েছি ছেঁকে।'

'তার মানে? তুই এক-একজনের কাছ থেকে এক-এক রকম দাম নিস নাকি?'

মেয়েটি বাঁকা হাসলো।—'কোনো-কোনো লোকের চেহারা দেখেই বোঝা যায়, তারা অনেক বেশি দেবার জন্য প্রস্তুত হ'য়েই এসেছে—তাদের হতাশ করা তো আর যায় না!'

'সাংঘাতিক লোক তো তুই!'

'বা রে, আমি যে তার সঙ্গে হেসে কথা কই, তার কোনো দাম নেই?'

'বড্ড বেশি দাম, আমার মনে হচ্ছে।'

'দেয় কেন? দরদস্তুর করলেই তো পারে। কিন্তু কী শুড় শুড় ক'রে মনিব্যাগ বেরোয় পকেট থেকে, অবাক লাগে দেখলে। ভাগ্যিশ সংসারে ভেড়া-পুরুষের অভাব নেই।'

'ভেড়ার সংখ্যা যত বেশি, তোর মতো মেয়ের ততই জয়-জয়কার।'

অতসীর কথার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটা মেয়েটি লক্ষ্য করলে না। অনেকটা নিজের মনেই ব'লে যেতে লাগলো, 'এমন ছেলে আছে যে কোনো মেয়ের

হাত থেকে কিনতে পেলে দ্বিগুণ দাম দেবে জিনিশের; আর জিনিশটা যদি কোনো মেয়ের হাতের তৈরি হয়, সেজন্য আরো দ্বিগুণ।'

'তাতে দোষ কী? আরো ভালো লাগে তাতে—আর ভালো লাগার জন্যেই তো সবাই পয়সা খরচ করে।'

'সে-কথাই বলছিলুম। এটাই তো আকর্ষণ—যা নিয়ে তৈরি আমাদের পোশাক। পুরুষকে টানবার এই ঝোঁক যদি না থাকতো, তাহ'লে এত বেশি দাম দিয়ে তোর রুমাল কিনতো কে?'

অতসী কোনো কথা বললে না।

'অদ্ভুত—এই ছেলেরা! কেউ কোনো মেয়ের জুতো কেনবার জন্য চার ঘণ্টা রোদ্দুরে ঘুরে বেড়াবে; আর কেউ বা নিজের পয়সা খরচ ক'রে দলসুদ্ধু মেয়েকে নিয়ে যাবে সিনেমায়—আর এদেরই মধ্যে যে একটু উঁচুদরের সে বাইরে যা-তা ব'লে বেড়াবে মেয়েদের নামে, গায়ের জোরে প্রমাণ করতে চাইবে যে তাদের জন্য সে থোড়াই কেয়ার করে।—অদ্ভুত!'

'যে যাতে সুখ পায়,' অতসী সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করলে।

'একটু আঙুল তুলেছো কি লেজ নাড়তে-নাড়তে সব এসে হাজির।' স্পষ্টত, এ-সব কথা বলতে মেয়েটির খুব ভালো লাগছিলো; এমনও সন্দেহ করা যেতো যে যাদের নিয়ে সে এত ঠাট্টা করছে, তাদের সাহচর্য মনে-মনে সে একটু পছন্দই করে।

'ওদের এত তুচ্ছই যদি করিস, ওদের হাত থেকে কোনোরকম সুবিধে নিতে লজ্জা করে না?'

'বা রে! ওরা তা-ই চায় যে। মাঝখান থেকে আমি আমার লাভের ভাগ ছাড়তে যাবো কেন?'

'সে-কথা ঠিক। কেন ছাড়তে যাবি?' অতসী প্রতিধ্বনি করলে।

একটু চুপচাপ। অতসী সেই ফাঁকে জিনিশগুলো ঘাঁটতে আরম্ভ ক'রে দিলে। ওগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে তার ভালো লাগতো—মসৃণ, শাদা কাপড়, শাদা সুতোর নকশাগুলো আঙুল দিয়ে অনুভব করা যায়। কাপড়ের উপর নানা রকম নকশা তুলতে তার ভালো লাগে—রেখার পর সূক্ষ্ম রেখা, আস্তে-আস্তে তৈরি হ'য়ে উঠছে। যে-কোনো জিনিশ নিজে তৈরি করবার একটা আনন্দ আছে: কিছু-না-কিছু মানুষকে সৃষ্টি করতেই হয়, বাঁচবার জন্য; যে আর-কিছু পারে না, সে সৃষ্টি করে সংসার—তুচ্ছ হোক কি নিচু স্তরের, সেখানেই তার পরিপূর্ণতা। অতসী মাথা নিচু ক'রে এক-একটা জিনিশ পরীক্ষা করছিলো, শিল্পীর সচেতন রসবোধ নিয়ে।

খানিক পরে অন্য মেয়েটি জিগেস করলে, 'তোর সেই পোষা কুকুর কেমন আছে?'

'পোষা কুকুর?'

'সেই যে ছেলেটি—সরোজ না কী নাম—'

অতসী চোখ তুললো।—'কী যা-তা বলিস!'

'বেশ পেয়েছিস যা হোক একটি', মেয়েটি তবু ঠাট্টা করলে, 'ফাই-ফরমাশ চালাবার জন্য এমন আর হয় না।'

'সব সময় ভালো লাগে না এ-সব ঠাট্টা।'

'দুঃখিত', মেয়েটি তাড়াতাড়ি বললে, তারপর ব্যঙ্গের মাত্রা আরো একটু চড়িয়ে দিলে, 'আহা, এমন করুণ বেচারার মুখখানা—দেখলেই দয়া হয়।'

প্রদর্শনীতে এক সন্ধ্যা

'দয়া ক'রে দয়া করিসনে—আর যা-ই করিস।'

'ব্যাপার কী? এত লাগে কেন?' মেয়েটি কাছে স'রে এসে অতসীর চোখে তাকাবার চেষ্টা করলে।

অতসী মৃদুভাবে তাকে সরিয়ে দিয়ে আরো বেশি ঝুঁকে প'ড়ে শেলাই-গুলো পরীক্ষা করতে লাগলো। মেয়েটি তাকে আর ঘাঁটালো না। সে জানতো অতসীর স্বভাব। দিব্যি হাসিমুখে কথা বলতে-বলতে কখন সে হঠাৎ জ্ব'লে উঠবে দপ ক'রে—তখন আর তাকে পোষ মানানো যাবে না। অতসী তার মেজাজের জন্য বিখ্যাত ছিলো; তার বন্ধুরা মনে-মনে জানতো, কতদূর তার সঙ্গে যাওয়া যাবে।

প্রদর্শনীর ভিড় এখন চরমে এসে পৌঁচেছে। নদীর ধারটা পুরোনো শহরের বেড়াবার জায়গা; সেখান থেকে, এই সন্ধ্যায়, অনেকেই এসে জুটছে প্রদর্শনীতে। কলেজের ছাত্র বেশির ভাগ। শুধু ঘুরে বেড়াতে, খানিকটা সময় কাটাতে; যে-জীবনক্লান্তি কখনো-না-কখনো আমাদের প্রত্যেককেই আক্রমণ করে, যদি কিছু লঘু হয় তার ভার। ভিড়ের একটা মাদকতা আছে: বহুসংখ্যক লোক একই উদ্দেশ্য নিয়ে এক জায়গায় সমবেত হয়েছে, শুধু এই ব্যাপারটাই আমাদের যূথবদ্ধ হবার আদিম প্রবৃত্তিকে খানিকটা চরিতার্থ করে। নিছক সংখ্যাধিক্যের, বহুত্বের একটা গৌরব আছে: একজন সাধারণ লোক তার অনির্বচনীয় তুচ্ছতায় লুপ্ত, কিন্তু তারই মতো সহস্র মিলিত হ'লে আমাদের আদিম পশু-রক্ত ধাবিত হয় সেই মানবতা-স্তূপের প্রতি। একজন সৈন্যের পা-ফেলায় কি একজন কাবারে-নাচওয়ালির পা-তোলায় যে চেয়ে দেখবার মতো কিছু আছে, তা নয়; কিন্তু যখন একটা দীর্ঘ সেনাবাহিনী কোনো বহুপদ, বিশাল

জীবের মতো নিয়মিত, যান্ত্রিক গতিতে অগ্রসর হ'তে থাকে, কি রঙ্গমঞ্চের উপর একশো পা একসঙ্গে একশো মাথায় গিয়ে ঠেকে, তখন—এমন হৃৎপিণ্ড নেই যে দুলে না ওঠে, এমন চোখ নেই যাতে না লাগে একটু নেশা। যে-জিনিশ স্বভাবতই হীন, গুণন তার একমাত্র অস্ত্র। তারই সাহায্যে সে জাতে ওঠে; যা স্বভাবতই সুন্দর, তার সঙ্গে পাল্লা দেয়; এমনকি, অনেক সময় তাকে তাড়িয়েও দেয় ঘাড়ে ধ'রে। সংখ্যার শক্তি আশ্চর্য।

কিন্তু অতসীর পক্ষে, সেই সময়ে, জনতার উত্তাপ শুধু একটা নিষ্পেষণ, একটা ভার মনের উপর। সুখ খুঁজে-খুঁজে ক্লান্ত—এই সব মুখ, উত্তেজনার লোভে রেখাঙ্কিত—ভেসে বেড়াচ্ছে এখান থেকে ওখানে, যেন তাদের কোনো মূল নেই, যেন তাদের অস্তিত্ব মুহূর্তের সঙ্গে মুহূর্তের সংযোজনায় রচনা ক'রে যাচ্ছে এক দীর্ঘ অবাস্তবতা। আর অতসীর চোখে, হঠাৎ, এই সমস্ত দৃশ্য একট শূন্য স্বপ্নের মতো হ'য়ে উঠলো, তার ভিতর থেকে উঠে আসছে ছায়া, ছায়ার সঙ্গে ছায়ার সংঘাত, নিরবয়ব। মনে-মনে সে ভাবছিলো সরোজের কথা। সরোজ —তাকে দেখলেই যে আহা-বেচারা বলতে ইচ্ছে করে, ইচ্ছে করে গায়ে হাত বুলোতে। তার বন্ধুকে সে দোষ দিলে না—অসম্ভব সরোজকে ঠাট্টা না-করা। কিন্তু তা এত সহজ—এত সহজ। এত সহজ ব'লেই সেই ঠাট্টা কোথায় যেন রুচিকে পীড়িত করে। সরোজের দৃষ্টিতে মাঝে-মাঝে এমন করুণ ভীরুতা ফুটে ওঠে, এমন ভিক্ষার মিনতি—ঠিকই, পোষা কুকুরের মতোই তাকে মনে হয়। এক-এক সময় অসহ্য লাগে অতসীর; তার ইচ্ছে করে আঘাত দিতে—তবু যদি সরোজের অভিমান

হয়, তবু যদি তার আহত গর্বের ঝলকে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে তার দৃষ্টি। মানুষ কেন তার নিজের মধ্যে গর্বের দীপ্তি রাখতে পারে না, কেন সে জ্ব'লে উঠতে পারে না বিরোধের সংঘাতে—ঘর্ষিত লোহা যেমন ছিটিয়ে দেয় আগুনের কণা? কিন্তু এত অল্পেই সরোজ আহত হয়, অতসী তা পারে না। তাকে সহ্য করতে হয়: নীরবে অনুভব করতে হয় তার মুখের উপর সেই মিনতি-ম্লান দৃষ্টি। বুঝতে পারে, সরোজের উপর তার ক্ষমতা অসীম। এমন কাজ নেই, যা সে না করবে—অতসী যদি বলে। কিন্তু সে কি সেই দলের—ঐ মেয়েটি যাদের কথা বলছিলো, বিধাতা-নির্বাচিত স্ত্রী-তীর্থের পাণ্ডা, স্ত্রী-দেবতার সেবায় আত্ম-উৎসর্গ ক'রে একটু হাসি, দু-চারটে মিঠে কথার বরলাভ যাদের মোক্ষ? অতসী যদি তা ভাবতে পারতো, তবে সে খুশি হ'তো, হাঁফ ছেড়ে বাঁচতো। কিন্তু, যা-ই বলো আর যা-ই করো, অত সহজে সরোজকে চুকিয়ে দেয়া যায় না যে। তাই তো মুশকিল। তাকে ভুলে থাকা যায় অনায়াসে; তাকে নিয়ে দরকার করে না কোনো ভাবনার। কিন্তু কোনোখানে, কোনো নেপথ্যে সে আছে, জীবনের দৃশ্যপটের আড়ালে: তার উপস্থিতির অস্পষ্ট অনুভূতি একটা উৎকণ্ঠার মতো। এমন নয় যে সে মস্ত কোনো ফাঁক ভ'রে রয়েছে, কিন্তু, সেই অনুভূতির হাত থেকেও ছাড়া নেই, রক্তের অন্ধকারের মধ্যে মৃদু-উদ্ভাসিত সেই পাটল উৎকণ্ঠা। আর সেখানে, সেই অন্ধকারে, সে আছে, সব সময়, চিন্ময়। সে কিছু বলে না, কিছু চায় না; তার কোনো প্রত্যাশা নেই, কোনো অভিযোগ নেই; সে শুধু একটা উপস্থিতি, চিরন্তন, অন্ধকার ভ'রে একটা প্রেত-সত্তা। তার মধ্যে স্বীকার ক'রে নেবার

মতো কিছু নেই; সেইজন্য তাকে অস্বীকার করাও অসম্ভব। অতসীর মনে পড়লো অনেক দিনের কথা, অনেক ছোটোখাটো ঘটনা—সরোজ যা বলেছে, না-বলেছে তার চেয়ে ঢের বেশি। যদি কখনো তার সাহস হ'তো মুখ ফুটে বলবার—কত সহজ হ'তো তা'হলে; প্রতিবাদে, প্রত্যাখ্যানে অতসী তাকে ঠেলে ফেলে দিতে পারতো বিস্মৃতির জল-রাশিতে। কিন্তু পাষাণের মতো তার নীরবতা: নীরব ছায়া-সঞ্চারে সে আছে; অন্ধ, নির্বোধ সর্ব-ব্যাপিতায় শুধু আছে। আর সেই জন্যই অতসীর মনে একটা চাপা উদ্বেগ—যেহেতু সরোজ এমন অন্ধ, নির্বোধ, যেহেতু সেই অন্ধ মূঢ়তার বিরুদ্ধে কোনো অস্ত্র নেই। এমন সময় আসতো, যখন সরোজের প্রতি ঘৃণায় বিষিয়ে যেতো তার মন। বোকা, বোকা—শুধু একটা মূঢ়তার পুঞ্জ, পাষাণ-নীরব, পাষাণত্বে অপরাজেয়। আর সেই সঙ্গে, এত দুর্বল, এমন নিরাবরণ, বাইরের আঘাতে এত বেশি উন্মুক্ত। শেষ পর্যন্ত, তার সম্বন্ধে মনস্থির ক'রে ওঠা সহজ নয়।

'এই রুমালগুলো কত ক'রে?' একজন জিগেস করলে, অতসীর কাছাকাছি।

অন্য মেয়েটি তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলো, 'রুমাল? দেখুন—কী চমৎকার কাজ-করা, বাজারে এ-রকম কিনতে পাবেন না কোথাও। দেখুন না।'

'কী-রকম দাম?'

অতসী চমকে উঠলো, জেগে উঠলো তার ভাবনা থেকে। গলার স্বরটা যেন চেনা মনে হচ্ছে। চোখ তুলে তাকালো সে। ঠিক তার

প্রদর্শনীতে এক সন্ধ্যা

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রঞ্জন রায় এক গোছা রুমাল দেখছে, তার পাশে দাঁড়িয়ে আর-একটি যুবক, চুল-ওল্টানো, গরদের পাঞ্জাবি পরা।

রঞ্জন অতসীকে দেখতে পায় নি: ভাঁজ-করা রুমালগুলো একটা-একটা ক'রে তুলতে-তুলতে সে বললে, 'বাঃ, সুন্দর তো।'

'চমৎকার, না?' অতসীর বন্ধুর কণ্ঠস্বরে লাগলো উচ্ছ্বাসের দোলা, 'এত সুন্দর, এর জন্য একটু বেশি দাম দিতে কে না রাজি হবে? তবু তো আমরা শস্তাতেই দিচ্ছি যতটা পারছি—ছ-টাকা ডজন।'

'ছ-টাকা?'

'অন্য সবার জন্য,' অতসী ব'লে উঠলো। 'আপনার জন্য তিন টাকা।'

রঞ্জন আর তার বন্ধুর চোখ একসঙ্গে অতসীর উপর এসে পড়লো; অন্য মেয়েটি তাকিয়ে রইলো অবাক হ'য়ে। দু-একটা আড়ষ্ট মুহূর্ত কাটলো। রঞ্জন প্রথমটায় অতসীকে ঠিক চিনতেই পারেনি, সেদিনকার চাইতে তাকে একেবারে অন্যরকম দেখাচ্ছিলো। তার মনে ছিলো যে-ছবি, তার সঙ্গে এই অতসীকে সে কিছুতেই মেলাতে পারছিলো না; সে যেন অন্য কোনো মেয়ে। মেয়েরা কি শাড়ির সঙ্গে-সঙ্গে তাদের আত্মাও বদলায়, রঞ্জন ভাবলে।

'আপনি এখানে?' রঞ্জনই প্রথম কথা বললে।

'এই তো,' বিবর্ণ ভদ্রতার স্বরে অতসী বললে।

'আপনাদের জিনিশগুলোর এক-একজনের জন্য এক-একরকম দাম কেন?'

অতসী একটু হাসলো। বললে, 'নিয়ে যান আপনার যে-ক'টা দরকার।'

'কিন্তু আমার কাছ থেকে পুরো দামটাই রাখুন দয়া ক'রে।'

হে বিজয়ী বীর

'মনে করুন না আপনাকে দিয়ে দিলুম,' বাধ্য হ'য়ে অতসী বললে। মনে-মনে তার রাগ হচ্ছিলো। এখানেও—এখানেও দয়া। কোনো সমুদ্র-জীবের লিকলিকে, জেলি-নরম, সাঁড়াশি-হাত তাকে আঁকড়ে ধরতে উদ্যত। সেই প্যাঁচপেঁচে জেলি-স্পর্শ সে যথেষ্ট পেয়েছে—আর নয়। আর তার উপর, কর্তব্যজ্ঞানের বোঝা, কৃতজ্ঞতাবোধের পীড়ন। কৃতজ্ঞতা—একটা বিষাক্ত কীট তার হৃৎপিণ্ডের মুখে মুখ রেখে তার রক্ত শুষে নিচ্ছে। শীতের বাতাস, তুমি ব'য়ে যাও, ব'য়ে যাও; তুমি তো অকৃতজ্ঞ নও মানুষের মতো। কিন্তু হাওয়া ব'য়ে চলুক; হাওয়া তো সেখানেই ব'য়ে যায়, যেখানে তার খুশি। আর কৃতজ্ঞতা একটা বোঝা, মানুষের সঙ্গে মানুষের একটা ব্যবধান। যার প্রতি কৃতজ্ঞতা, তার মুখের দিকে যেন তাকানো যায় না; মাঝখানে 'একটা ধোঁয়ার পরদা। যদি হাওয়া উঠতো, শীতের নিষ্ঠুর হাওয়া, যদি উড়িয়ে নিয়ে যেতো সেই ধোঁয়া! একজন আর-একজনকে দেখতে পেতুম মুখোমুখি—মুক্তা-স্বচ্ছ আবহাওয়ায়। কেন আমরা এ-সব বোঝা জমিয়ে রাখবোই, এই জঞ্জাল—কেন দু-হাতে সব ছড়িয়ে দিতে-দিতে এগিয়ে যাবো না, বাতাস-অবাধ! কেননা, জীবনের সবচেয়ে বড়ো জিনিশ হচ্ছে মুক্ত হওয়া—মুক্ত, আর পরিচ্ছন্ন, যে-সব ছোটো-ছোটো জিনিশ কেবলই আমাদের পিছনে টানে, তা থেকে মুক্ত, নিজের অনাক্রমণীয় স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত। রঞ্জনের সঙ্গে কথায়, ব্যবহারে অতসী একটা অনিশ্চয়তা অনুভব করছিলো। সে বুঝতে পারছিলো যে ঐ লোকটির প্রতি তার কৃতজ্ঞ বোধ করা উচিত, আর তাতেই তার ভিতরটা যেন কাঠ হ'য়ে যাচ্ছিলো। সে চেষ্টা করছিলো সে-ভার থেকে মুক্ত হ'তে, সহজ হ'তে, সহজ ভাবে নিতে।

রঞ্জন একটু হেসে বললে, 'তাহ'লে বলুন যে আমাকে দিয়ে দিলেন।'

রঞ্জনের কথার লঘু সুরে আর তার হাসিতে অতসী একটু আশ্বস্ত হ'লো। এ-কথা অন্তত সে ভাববে না যে অতসী তাকে খুশি করতে চায়, তাকে 'প্রতিদান' দিতে চায়। একটু চুপ ক'রে থেকে সে বললে, 'বেশ, দিলুম।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। কিন্তু আরো অনেক ভালো-ভালো জিনিশ দেখছি। কিনে নেয়া যাক কিছু।'

'টিপয়ের ঢাকনা কয়েকটা নিয়ে যান,' অন্য মেয়েটি ব'লে উঠলো, 'ঐ যে কালোর উপর সোনালি কাজ করা।'

রঞ্জন আর তার বন্ধু যখন জিনিশ পছন্দ করতে ব্যস্ত, অতসী বললে, 'কিছু কিনবেনই, প্রতিজ্ঞা ক'রে এসেছিলেন নাকি?'

রঞ্জন একটা কালো-আর-সোনালি টিপয়-ঢাকনার উপর হাত রেখে বললে, 'ঠিক এই রকম জিনিশই আমি খুঁজছিলুম।'

দু-বন্ধু মিলে কিনলে কয়েকটা।

অন্য মেয়েটি যখন জিনিশগুলো ব্রাউন পেপারে জড়াচ্ছে, অতসী বললে, 'আপনি সেদিন গিয়েছিলেন আমাদের ওখানে?'

'হ্যাঁ। আপনার সঙ্গে তো দেখা হ'লো না।'

'বাড়ি এসে শুনলুম মা-র কাছে।' তারপর অতসী জুড়ে দেয়া উচিত মনে করলে, 'আর-একদিন যাবেন।'

'যাবো,' ব'লে রঞ্জন প্যাকেটটা হাতে নিলে।

'কে, ভাই?' তারা একটু দূরে যেতেই অতসীর বন্ধু তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

'চেনা—'

'তোদের আত্মীয় ?'

অতসী জবাব দিলো না।

'রুমালগুলো দিয়ে দিলি যে বড়ো ?'

'তুই যা শুনতে চাস, তা মনে-মনে ভেবে নিলেই তো পারিস। অত জিগেস করিস কেন ?'

'Your latest ?' প্রদর্শনী থেকে বেরিয়ে একটু নিরিবিলি রাস্তায় এসে চুল-ওল্টানো ছেলেটি বললে।

'Latest ?' রঞ্জন অন্যমনস্কভাবে পুনরাবৃত্তি করলে।

'I mean—ঐ কালো মেয়েটি। এবার কি O my dark Rosaleen ?'

হঠাৎ রঞ্জন জিগেস করলে, 'তুমি As You Like It পড়েছো নিশ্চয়ই ?'

'পড়েছি তো।' ছেলেটি থতমত খেয়ে গেলো, 'কেন ?'

রঞ্জন মৃদুস্বরে আবৃত্তি করলে :

> 'From the east to western Ind,
> No jewel is like Rosalind.'

তারপর বললে, 'কী সুন্দর নাম—রোজালিণ্ড !'

'হঠাৎ এ-কথা কেন ?'

'হঠাৎ মনে পড়লো।'

ছয়

রোজালিণ্ড

রোজালিণ্ড, রোজালিণ্ড; রোজালিণ্ডের মতো নাম আর নেই। রঞ্জনের মস্তিষ্কের কোষে-কোষে তা গুঞ্জিত হ'তে লাগলো, তাকে ঘিরে তার অনুরণনের ইন্দ্রজাল। আ, সেই আর্ডেনের বন, গাছে-গাছে প্রেমের কবিতা, হাসিতে আলাপে ভঙ্গিতে উচ্ছল সেই লীলা—চিরকালের সেই ভালোবাসার গল্প! সেই সন্ধান, সেই দুঃসাহস! তীব্র আবেগের বিদ্যুৎ, দুঃখগ্রহণের, দুঃখক্ষালনের পরিপূর্ণতা। এই তো ভালোবাসার গল্প—দুরূহ পথযাত্রা, প্রেমিকের মিলনে যাত্রার শেষ। কেননা মানুষ অনাদিকাল থেকে পণ করেছে যে তা সহজ হবে না। একমাত্র মানুষই অস্বীকার করেছে প্রকৃতির হাত থেকে তার প্রেমকে নিতে, প্রবৃত্তির অন্ধ স্রোতে; একমাত্র মানুষই দাবি করেছে সচেতন হবার অধিকার, দুঃখ পাবার অধিকার। সেইজন্যই তো তাকে ভ্রষ্ট হ'তে হ'লো স্বর্গ থেকে; সেইজন্যই তো সে দুবাশা করতে পারলে নতুন স্বর্গের। যে-স্বর্গ সে ভোগ করবে, তাকে সৃষ্টি করবে সে। তার ভালোবাসাকে সে জটিল ক'রে তুললে, কঠিন ক'রে তুললে, তার স্বপ্নে, তার ভাবের রসে। যেখানে শুধু প্রবৃত্তির অন্ধ শক্তি, সেখানে সে দেখলে অপার রহস্য। সে অবাক হ'লো; চেয়ে-চেয়ে দেখলো, দুলে উঠছে দিগন্ত থেকে দিগন্তে প্রেমের নীল যমুনা। আর বেদনায়, অভিমানে, বিরহে, কান্নায় আর বাসনায় তার সমস্ত অন্তর রামধনু-রঙিন হ'য়ে উঠলো যে। তারই জন্যে তো চিরকাল আর্ডেনের বনে-

বনে পূর্বরাগ-চঞ্চলতা, কালো জলে ঢেউ তুলে দেয়া বাঁশির স্বর; তারই জন্যে তো শ্রাবণরাত্রির বিরহ-মধুরতা। তারই জন্যে তো নিশীথের তারার দিকে তার চেয়ে থাকা, হঠাৎ অকারণে দু-চোখের জলে ভ'রে আসা। সেই অপরিপূরণীয় অসীম-তৃষ্ণা না-হ'লে তার প্রেম যে সম্পূর্ণ হ'তো না। না, সহজ সে হ'তে দেবে না; রোজালিণ্ডকে সে খুঁজবে; তার জন্য সে গাছে-গাছে ঝুলিয়ে রাখবে ছন্দের মালা—কারণ, তা যদি তাকে না-করতে হ'তো, তাহ'লে সে যে জানতে পেতো না, রোজালিণ্ডের মতো নাম আর নেই।

আসল কথাটা যা, তা অতি সহজ। কখন যে আমাদের মনে সুখের ঢেউ দেয় কোনখান থেকে, কেউ বলতে পারে না। কী যে আমাদের মন ছুঁয়ে যায় এক চকিত মুহূর্তে, আর কল্পনা জেগে ওঠে তাকে ঘিরে। অবিচ্ছিন্ন ব'য়ে চলেছে আমাদের চেতনার স্রোত, মুহূর্তের পর মুহূর্তের ঝলক, ফুটে উঠেই মিলিয়ে যাচ্ছে, চিরকালের চিহ্ন রেখে যাচ্ছে না কোনো—শুধু একটানা, অন্তহীন একটা স্রোত। আমরা খেয়াল করিনে—কেটে যেতে দিই, ব'য়ে যেতে দিই। কিন্তু হঠাৎ এক-একটা মুহূর্ত আসে, স্রোত থেকে যা বিচ্ছিন্ন, যা আটকে থাকে আমাদের মনে, ধাবমান কালের অনিবার গতি থেকে পিছিয়ে প'ড়ে যা র'য়ে যায়। তখন সেই মুহূর্তকে কেন্দ্র ক'রে আস্তে-আস্তে ভাবনার দ্বীপ গ'ড়ে ওঠে। মন ঘুরে বেড়ায় সেই মুহূর্তের আশে-পাশে, যে-ফুল এখনো ফোটেনি, তার আশা-উন্মাদ ভ্রমরের মতো। কল্পনায় সেই মুহূর্ত নিজের পুনরাবৃত্তি ক'রে যায়, অন্তহীন। সমস্ত মন ভিতরে-ভিতরে রঙিন হ'য়ে ওঠে ইশারায়, মেঘে-মেঘে চাপা যেমন সূর্যাস্ত।

আর রঞ্জনেরও তা-ই হ'লো, সেই সন্ধ্যায়, সেই ভিড়ের আর কোলাহলের মাঝখানে। ভারি আশ্চর্য, সেজন্য সে প্রস্তুত ছিলো না। হঠাৎ একটি সুর এসে নামলো তার মনে, যা ঝংকৃত হ'য়ে উঠলো রোজালিণ্ডের নামে লেখা গানে-গানে। (কারণ, কাব্যসৃষ্টির ক্ষমতা সকলের থাকে না, তা না-ই বা থাকলো; বিশেষ কোনো মুহূর্তে অন্যের লেখা কবিতাকেও আমরা সৃষ্টি করতে পারি নতুন ক'রে, সেটাও কম কথা নয়। কবির সঙ্গে পাঠকের যে সম্পূর্ণ একাত্মবোধ, সে-ই তো শ্রেষ্ঠ সংগম।) সেই এক মুহূর্তের আলোয়, রঞ্জন অতসীকে দেখতে পেলো। দেখতে পেলো—শুনতে এটা এমন-কিছু নয়, কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে, এর উপরে আর কিছু নেই। সেই দেখা, তা একটা উন্মোচন। সেখানে অতসীর এমন একটা প্রকাশ, যা বিশেষ, যা অতুলনীয়। কিছু হয়তো ছিলো তার শাড়ির রঙে, কি দাঁড়াবার ভঙ্গিতে, কি তার ভুরুর বাঁকা রেখার টানে—কি হয়তো ছিলো না: কিন্তু সব-কিছু জড়িয়ে সে একটা ছবি, রঞ্জনের চোখে। আর তার মনে জেগে উঠলো অনেক অস্ফুট স্বর—যেন বহুদূর কোনো অতীতের, যেন অন্য-কোনো জন্মের হঠাৎ-এসে-লাগা প্রতিধ্বনি। আ, আর্ডেনের বনের সেই রোমাঞ্চ! কেমন হবে সেই ভালোবাসা, যাকে পেতে হয় এত দুঃখে, এমন দুঃসাহসের ভিতর দিয়ে।

রঞ্জন রায় বাড়ি ফিরে এলো সাড়ে-আটটার মধ্যে—সে কখনো এর বেশি দেরি করে না। তার হাতের মোড়ক দেখে তার মা বললেন, 'কী আনলি এগুলো?'

রঞ্জন মোড়ক খুলে দেখালো।

হে বিজয়ী বীর

'কোথেকে আনলি ?'

'ওয়াইজ ঘাটে নতুন একটা স্বদেশী দোকান খুলেছে—সেখান থেকে।' ব'লেই ভাবলে, 'কেন মিথ্যেটা বলতে গেলুম ?' কিন্তু সেটা তার একটা অভ্যেসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো, মা-র কাছে মিথ্যে বলা। অনেক সময় তাকে মিথ্যে বলতে হ'তো খামকা কথা-কাটাকাটি এড়াবার জন্য, সে-রকম দরকার যখন নেই, তখনও মিথ্যে বলতো নিছক অভ্যেসের জোরে।

'কত দাম হ'লো ?'

রঞ্জন অনেক কমিয়ে বললে।

তবু তার মা বললেন, 'এতগুলো পয়সা জলে ফেলে এলি তো ?'

'পয়সা, মা,' রঞ্জন বললে, 'পয়সা জিনিশটা কখনো জলে ফেলা হয় না। অবিশ্যি তুমি যদি রুপোর টাকা নিয়ে পুকুরের ধারে ব'সে ছিনিমিনি খেলো সে-কথা আলাদা। কিন্তু তা কেউ করে না। অন্তত করেছে ব'লে জানা যায়নি। তা ছাড়া তুমি যা বলছো, সেটা জলে ফেলা নয়, যে-পয়সা আমার ছিলো, তা আর-একজনের হ'লো এই যা। তেমনি যে-জিনিশ আর-একজনের ছিলো, সেটা হ'লো আমার। এ-পয়সা ঘুরে-ঘুরে অনেক গুণ বাড়বে, তার খানিকটা হয়তো ফিরে আসবে আবার আমারই কাছে। এমনি ক'রেই তো পৃথিবীটা চলছে।'

ও-সব ভালো-ভালো কথা একেবারেই কানে না-তুলে তার মা বললেন, 'দু-হাতে ওড়াও—যদ্দিন থাকে।' বাজে খরচ জিনিশটা তাঁর জীবনের বিভীষিকা। এক টাকা খরচ করলেই এক টাকা কমলো, এটা তিনি খুব ভালো ক'রেই বুঝতেন। এবং ক্রমশ হ্রাস পেতে-পেতে খুব বড়ো একটা সংখ্যাও তলায় এসে ঠেকতে পারে, এ-চিন্তা দুঃস্বপ্নের মতো হানা দিতো

তাঁকে। পৃথিবীর সব শাস্ত্রের মধ্যে একমাত্র বিয়োগ অঙ্কেরই সত্যতা সম্বন্ধেই তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন।

রঞ্জন বললে, 'রুমালের অভাবে স্রেফ মারা যাচ্ছিলাম। তা-ছাড়া, সত্যি যে কী শস্তায় পেয়েছি, তুমি ভাবতে পারবে না, মা।' ব'লে উপরে চ'লে গেলো তার শোবার ঘরে।

শোবার ঘরে দক্ষিণে তুটো জানলা পাশাপাশি: তার বাইরে আকাশ নেমে এসেছে ঢালু হ'য়ে তারায়-তারায় আলোর চিহ্ন রেখে; অন্ধকার মাঠ পার হ'য়ে ঘন গাছের সারি চোখে পড়ে অদ্ভুত আকৃতির একটা পুঞ্জ। রাত বাড়ে: ইলেকট্রিক পাওয়ার-হাউসে বিদ্যুৎগর্ভ যন্ত্রের হৃৎপিণ্ড অবিশ্রান্ত ধ্বকধ্বক করে, রেল-ইস্টিশান থেকে নানা রকম শব্দ ভেসে আসে, যেন রহস্যে মোড়া। খাওয়ার পর, সেই জানলার কাছে রঞ্জন একটা চেয়ারে বসলো, তার একাকীত্বে স্থখী। রাত বাড়লো; আশে-পাশের বাড়িতে নিবে যেতে লাগলো আলো। সেই রাত্রির মধ্যে কী-যেন একটা ছিলো, নতুন একটা অনুভূতি; সেই রাত্রি যেন তার বুকের মধ্যে কথা ক'য়ে উঠতে চায়; আর অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ, রঞ্জন শুতে গেলো না: ঘুমে তার চোখ ভ'রে আসছিলো, কিন্তু চেয়ার থেকে উঠে যে বিছানায় যাবে, তাতেও তার আলস্যের সীমা নেই। এমন নয় যে সে নির্দিষ্ট কিছু ভাবছিলো: তন্দ্রার ইন্দ্রধনু-অবসরে সে শুধু তার মনকে ছেড়ে দিলে—বাইরে, রাত্রির অন্ধকারে, তারায়-তারায় ঝলসে-ওঠা নীরবতায়।

কয়েক দিন পরে, এক বিকেলে তাদের বারান্দায় পাটি পেতে বসেছে অতসী, হাতে শেলাই। একটু আগে সে এসেছে স্নান ক'রে, মিলের শাদা

হে বিজয়ী বীর

শাড়ির আঁচলটা অযত্নে গায়ে জড়ানো। পিঠের উপর ছড়িয়ে আছে এখনো-ভিজে চুল। একটু দূরে একটা নিচু মোড়ায় ব'সে আছে সরোজ, দেয়ালে হেলান দিয়ে, হাঁটুর উপর হাঁটু রেখে। তাদের দেখে মনে হ'তে পারে যে একটু আগে তাদের মধ্যে কোনো কথা হচ্ছিলো।

অতসীর হাতের ছুঁচ নীরবে গোল ফ্রেমে আটকানো কাপড়টাকে ফুঁড়ে-ফুঁড়ে চলেছে। খানিক পরে, শেলাই থেকে মুখ না-তুলেই সে বললে, 'শেষ পর্যন্ত, সরোজ, কিছুতেই কিছু এসে যায় না।'

সরোজ আস্তে-আস্তে বললে, 'যদি তা-ই মনে করতে পারো, তাহ'লে সব ভাবনাই তো চুকে যায়।'

'ভাবনাই বা কিসের!' অতসীর এই ঔদাসীন্য যেন অনেকটা গায়ের জোরের ব্যাপার, যেন সে চেষ্টা করছে সরোজকে চটাতে, তাকে উশকে দিতে—যেমন খোঁচা দিয়ে-দিয়ে আমরা প্রদীপের শিখা উশকে দিই।

'তোমার বয়স কম,' মাথা নিচু ক'রে শেলাইটাকে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে-করতে অতসী বললে, 'মানুষের ভালো করা যে খুব একটা ভালো কাজ, এ-মোহ তোমার এখনো আছে।'

সরোজ কথা বললো না। সত্যি বলতে, দু-জনের মধ্যে সরোজই বয়সে বড়; কিন্তু সে-কথা এখানে উল্লেখ করা নিতান্ত অবান্তর, অর্থহীন। সে-জ্যেষ্ঠতা নেহাৎই ঐতিহাসিক। ঐতিহাসিক ভাবে একজন ক-বছর বেঁচেছে, শুধু তা-ই দিয়ে সব সময় তার বয়স নিরূপণ করা যায় না। দেখতে হয়, সে কতখানি বেঁচেছে, কতটা প্রগাঢ় তার বাঁচা। নিজের সম্বন্ধে সরোজ কোনো উচ্চ ধারণা পোষণ করতে শেখেনি। স্থানীয় একটা ব্যাঙ্কে সামান্য কেরানির কাজ সে করে। অল্প বয়সেই সে কাজে ঢুকেছিলো—তার

বাবার ইচ্ছায়। নিজেরও কোনো তীব্র অনিচ্ছা ছিলো না; পরীক্ষা অনেকগুলো পাশ করতে পারলেও এর বেশি কিছু তাকে দিয়ে হবে কিনা, সে-বিষয়ে একটা স্বাস্থ্যকর সন্দেহ তার ছিলো। আর এখানেই প্রায় চরম—তার জীবনের যেটা উচ্চতম, তাও এর খুব উপরে নয়, মনে-মনে তা সে জানতো। এবং জেনে, বিদ্রোহ করতো না; বরং তা মেনে নিয়েছিলো স্বচ্ছন্দে। এখন বাপ আছে মাথার উপর, তার নিজের বিশেষ ভাবনা নেই। নিজে যা উপার্জন করে, খরচ করতে পারে নিজেই। নিজের মনে, নিজের জীবন নিয়ে সে সুখী। যদি কোনো অভাব থাকে, কোনো অতৃপ্তি—তা তো আছেই; তা নিয়ে নালিশ ক'রে-ক'রে খামকা কষ্ট বাড়ানো কেন? নালিশ সরোজ করতো না—কখনোই না। নিজেকে সে এমন মূল্য দিতো না, যা নিয়ে নালিশ করলে মানায়। নিজেকে মুছে ফেলতে সে সব সময়েই উৎসুক। অতসীর কাছে, বিশেষ ক'রে। এই প্রথম নয় যে তার কাছ থেকে পিঠ-চাপড়ানো কথা সে অনায়াসে হজম করেছে। সে কোনো উত্তর দিতে চায় না—পারেও না অবশ্য। এমনও যেন তার মনে হয় যে এই পিঠ-চাপড়ানোই সংগত, ও-সব কথায় যেন খানিকটা সত্য আছে।

খানিকক্ষণ চুপচাপ। অতসী একমনে শেলাই ক'রে যাচ্ছে। তার মুখের ভাবে উৎসুক তন্ময়তা। তার মনের মধ্যে আছে যে-ছাঁচ, সুতোর রেখায়-রেখায় তাকে হুবহু ফুটিয়ে তোলবার আগ্রহে কখনো তার ভুরু কুঁচকে যাচ্ছে, কখনো তার ঠোঁট দুটি গোল হ'য়ে উঠছে তীক্ষ্ণ ভঙ্গিতে। তার ও তার কাজের মধ্যে একটা সম্পূর্ণতার চক্র, অচেতন, বৈদ্যুতিক। তার স্নায়ুকেন্দ্র থেকে উঠছে এই উৎসুকতা, আঙুলের এই ক্ষিপ্র ছন্দ। নিজের হাতে কিছু তৈরি করা, মনের কল্পনাকে রূপায়িত ক'রে তোলা

কোনো বাইরের বস্তুতে—তার আনন্দে অতসী আচ্ছন্ন। কথা বলবার কোনো প্রয়োজন নেই, আর-কিছুরই কোনো প্রয়োজন নেই। সরোজ মাঝে-মাঝে আড়চোখে তাকাতে লাগলো তার মুখের দিকে—আর তারপরে তার সামনে ছড়িয়ে-যাওয়া পুবের আকাশে,—যেখানে সূর্যাস্তের প্রতিচ্ছুরিত আভায় অলস, শাদা মেঘগুলো গোলাপি হ'য়ে উঠছে।

'উঃ!' অতসী অস্ফুট একটা শব্দ ক'রে উঠে ছুঁচ নামিয়ে রাখলো।

'ফুটলো নাকি?'

অতসী আঙুলটাকে ঠোঁটের উপর একটু ঘ'ষে বললে, 'এই তোমার একটা সুযোগ যাচ্ছে—ভালো করবার, ভালো হবার।' ব'লে সে সরোজের মুখের দিকে তাকালো, অস্ফুট হাসির আভা তার ঠোঁটে।

সরোজ চোখ সরিয়ে নিয়ে বললে, 'এখন রেখে দাও, আলো ক'মে আসছে।'

'তুমি, সরোজ,' আঙুলটাকে একবার জিভে ঠেকিয়ে অতসী আবার ছুঁচ তুলে নিলে, 'তুমি হচ্ছো সমবেদনার একটা ফোয়ারা—কথায়-কথায় উথলে উঠে ভিজিয়ে দাও চারদিক।' সরোজকে ঠাট্টা ক'রে অতসী অদ্ভুতরকম সুখ পাচ্ছিলো। এমন মজার খেলা—শুধু, আরো বেশি মজার হ'তো যদি ও মুখে-মুখে জবাব দিতে পারতো—পিংপং-এর বল যেমন ফিরিয়ে দেয়। '—নিজকে সবচেয়ে বেশি,' একটু পরে সে জুড়ে দিলে।

'এক কথা আর কতবার বলবে?'

'বলতে পারো,' নরম লঘুস্বরে, প্রায় প্রফুল্লভাবে অতসী ব'লে উঠলো, 'কে বেশি করুণার পাত্র? যে মানুষের ভালো করতে চায়—না, যে মানুষকে ভালো করতে চায়?'

'সে যদি সুখ পায়,' আস্তে আস্তে, যেন কষ্ট ক'রে তার মনের কোনো গহন অভ্যন্তর থেকে কথাগুলো তুলে এনে সরোজ বললে, 'সে যদি সুখ পায়, তুমি কেন বাধা দিতে যাবে?'

অতসী চোখ তুলে সরোজের চোখে তাকালো, মুহূর্তকাল। তারপর আবার ছুঁচের একটা ফোঁড় দিয়ে বললে, 'ঠিক। যে যাতে সুখ পায়, সে তা-ই করবে। বাধা দেবার অধিকার কারো নেই।'

দু-জনে চুপচাপ। মুহূর্তের পর মুহূর্ত, শাদা কাপড়ের উপর রঙিন সুতোগুলো রূপে ফ'লে উঠছে, যেন কোনো জাদুকরের আঙুলের খেলা। সরোজ অতসীর বাহুর ওঠা-নামার ছন্দ লক্ষ্য করতে লাগলো, তার দীর্ঘ, কৃশ আঙুলের সহজ, অভ্যস্ত শ্রী। 'কিন্তু তুমি—' খানিক পরে সরোজের মধ্যে যেন অন্য কেউ কথা কয়ে উঠলো, 'তোমারই বা ভালোর উপর এত রাগ কেন?'

অতসী চোখ তুললো, কোনো কথা বললো না। তার সুতো ফুরিয়ে গিয়েছিলো; বাড়তি সুতোটাকে দাঁত দিয়ে কেটে ফেলে সে সরিয়ে রাখলো শেলাই। তারপর বললে, 'আমার বাবা—তিনি ভালোর একজন মস্ত ভক্ত ছিলেন। ভালো হবার প্রতিজ্ঞা ক'রে ক'রে তিনি কত যে কাঁদতেন, তুমি অবাক হ'য়ে যেতে দেখলে। সেটা যে খেলারই একটা নিয়ম, তা না-করলে জমে না। তা না করলে—এক মাসের মাইনের অর্ধেক রেসে উড়িয়ে দেবার, মদ খেয়ে বাড়ি এসে ভাতের থালায় বমি ক'রে দেবার, বাড়িতে একটিও পয়সা না-রেখে মাঝে মাঝে উধাও হ'য়ে যাবার পুরোপুরি মজাটা কি পাওয়া যায়!'

সরোজ বললে, 'কিন্তু তা সত্ত্বেও ভালো তো ভালোই র'য়ে গেলো।'

অতসী কিছু বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু এমন সময় হিরণ্ময়ী সেখানে এলেন, ত্বটি কালো পাথরের রেকাবিতে ক'রে কিছু কালোজাম আর লিচু নিয়ে। 'লিচুগুলো খুব ভালো মনে হচ্ছে,' সরোজের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন।

'এ-সব কোত্থেকে এলো?' তার সামনে রাখা রেকাবিটার দিকে তাকিয়ে অতসী বললে।

'আমি এনেছি,' সরোজ তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলো 'আপিশ থেকে ফেরবার পথে একটা লোককে পেলুম—একরকম জোর ক'রেই গছিয়ে দিলে—আর কালোজাম আমি খুব ভালোও বাসি—' অপরাধের নানারকম জবাবদিহির চেষ্টায় সে হাঁপিয়ে উঠলো। অতসীর কাছ থেকে একচোট শাসনের জন্য তার স্নায়ুগুলো যেন নিজে থেকেই প্রস্তুত হ'য়ে নিলে।

কিন্তু অতসী শুধু বললে, 'আমিও খুব ভালোবাসি কালোজাম।' একটা জাম তুলে সে মুখে দিলে—'বাঃ, বেশ তো।'

'একটা লিচু খেয়ে ত্যাখ,' হিরণ্ময়ী বললেন।

'সবই খাবো।' তারপর সরোজকে : 'তুমি খাচ্ছো না?'

সরোজ রেকাবিটা হাতে তুলে নিয়ে ভালো ছেলের মতো মাথা নিচু ক'রে খেতে লাগলো। অতসী বললে, 'কালোজাম ব'লে একটা পদার্থের যে অস্তিত্ব আছে, সে-কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। তোমার এতও খেয়াল থাকে!' তার কথা বলার ধরনে উৎসাহটা এত বেশি যে সরোজ খুশি হ'য়েও ঠিক খুশি হ'তে পারলো না।

'ওর কথা আর বলিস কেন?' হিরণ্ময়ী বললেন, 'নিয়ে এসেছে এক ঝুড়ি—'

'এনেছে যেমন, ওকেই খাইয়ে দাও বেশি ক'রে। সরোজ, তোমাকে আরো কয়েকটা লিচু খেতেই হবে।'

'পাগল!'

'তবে আনলে কেন? দাও, মা, ওকে আরো কয়েকটা দাও।' অতসীর কণ্ঠস্বরে ছেলেমানুষি উপচে পড়তে লাগলো।

রঞ্জনের মনে, একটু আগে সবার অলক্ষিতে যে এসেছিলো পাশের ছোটো দরজা দিয়ে, এসে দাঁড়িয়েছিলো বারান্দার নিচের জমিতে, রঞ্জনের মনে সেই কণ্ঠস্বর হঠাৎ ঢেউ খেলিয়ে গেলো। যেমন চটুল হাওয়া হঠাৎ দোলা দিয়ে যায় দিঘির বুকে, কালো জল ওঠে শিরশির ক'রে। চাপা হাসিতে উদ্ভাসিত এই অন্তরঙ্গ দৃশ্য রঞ্জন দেখছিলো ক্ষুধিত দৃষ্টিতে। কোনো দাবি কি নেই তার, যাতে সে বসতে পারে ওখানে গিয়ে, সহজ শোভনতায়; এমন কিছু কি সে করতে পারে না, যাতে সে ফুটে থাকবে না অতিমাত্রায় স্পষ্ট হ'য়ে, লক্ষ্য করবার কোনো জিনিশ, যাতে সে মিশে যাবে, গৃহীত হবে ওদের মাঝখানে অবাধ কথায়, চাপা হাসিতে, রঙিন লঘুতায়?

তাকে প্রথম লক্ষ্য করলেন হিরণ্ময়ী। 'আরে, তুমি কখন এলে?' অতসী আর সরোজ দু-জনেই ফিরে তাকালো; তাকে দেখতে পেয়েই উঠে দাঁড়ালো প্রায় একসঙ্গে। অতসীর আঙুলে বেগনি দাগ, তার শাড়িরও এক জায়গায় জামের কষ লেগেছে। স্পষ্ট বোঝা গেলো, সে তার অপ্রস্তুত অবস্থার জন্য ভিতরে-ভিতরে সংকুচিত হ'য়ে উঠলো। মুহূর্তের মধ্যে নেমে এলো তার মুখে ভদ্রতার শক্ত মুখোশ। মুহূর্তের মধ্যে সুর গেলো কেটে। রঞ্জনের মনে হ'তে লাগলো, সে যেন একটা বানর, কোনো সূক্ষ্ম যন্ত্র নিয়ে

নাড়াচাড়া করতে গিয়ে সেটা নষ্ট ক'রে ফেললে। নিজকে সে শাপ দিলে এই সময়ে এখানে এসে পড়েছে ব'লে।

'ওখানে দাঁড়িয়ে কেন?' হিরণ্ময়ী বললেন, 'এসো, উঠে এসো।'

রঞ্জন উঠে আসতে-আসতে বললে, 'কেমন আছেন?'

ভদ্রতা-বাক্যের বিনিময় হ'লো। সবই—ঠিক যেমন হওয়া উচিত। স্পষ্ট, নির্ভুলরূপে সে একজন বাইরের লোক: সে মাননীয় অতিথি, তার আপ্যায়নে সবাই উদ্‌গ্রীব। আর রঞ্জনের হৃৎপিণ্ড যেন হতাশায় ডুবে গেলো। না না, তার জন্য নয়, তার জন্য নয়। সে শুধু বাইরে দাঁড়িয়ে পেতে পারে স্বর্গের আভাস; যে-মুহূর্তে সে পা বাড়াবে, সোনার কপাট যাবে বুজে—সোনার সন্ধ্যা মেঘের ঘোমটা টেনে দেবে মুখের উপর। যে-সময়টা সন্ধ্যার মতো পেকে উঠলো লালে-সোনায়, সে তাকে নষ্ট ক'রে দিলে, সে তার উপর কালির আঁচড় কেটে দিলে; কালি-উদ্‌গারী কোনো পোকার মতো। সে জানে না, কী ক'রে ঘোচানো যেতে পারে এই ব্যবধান—কী সে করতে পারে, বলতে পারে—কেমন ক'রে সে সহজ হ'তে পারে আর সহজ ক'রে তুলতে পারে।

হিরণ্ময়ী সরোজকে ব'লে তার জন্য উপর থেকে একটা চেয়ার আনাতে যাচ্ছিলেন, রঞ্জন তাড়াতাড়ি ব'সে পড়লো পাটির উপর, অতসী যেখান থেকে একটু আগে উঠেছে। কিন্তু ঠিক যেন মানালো না—তার পা দুটো ছড়িয়ে রইলো একটা বিশ্রী ভঙ্গিতে, যে-ভাবটা সে দেখাতে চেয়েছিলো, তা ঠিক ফুটলো না। দূর ছাই, মনে-মনে সে বললে, এর চাইতে ভদ্রলোকের মতো চেয়ারে বসলেই ভালো করতুম।

সরোজের সঙ্গে অতসী তার পরিচয় করিয়ে দিলে। রঞ্জন বললে, 'এঁকে তো দেখেছি সেদিন আপনাদের সঙ্গে—' বলতে-বলতে সে থেমে গেলো। কথাটা কেমন বিসদৃশ শোনালো, যেন সে কোনো উচ্চাসন থেকে কথা বলছে। সেটা ঢাকবার চেষ্টায় সে—কী বলবে, হঠাৎ ভেবে পেলো না, অতসীর পরিত্যক্ত শেলাইটা তাকে বাঁচালে।

—'আপনার কাজে বাধা দিলুম নাকি ?'

রঞ্জনের চোখ অনুসরণ ক'রে অতসী বললে, 'না, না, কাজ কিছু না।'

'একটু দেখতে পারি ?' কাঠের ফ্রেমটা তুলে নিয়ে রঞ্জন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে একটু দেখলে। তারপর বললে, 'এগজিবিশনটা এবার বেশ ভালোই হয়েছিলো।'

'তুমি গিয়েছিলে ?' হিরণ্ময়ী জিগেস করলেন। চকিতে অতসীর চোখ একবার রঞ্জনের চোখের উপর এসে পড়লো। সরোজ সেটা লক্ষ্য করলে, তারপর তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিলে, যেন কিছু ছাখেনি।

'গিয়েছিলাম একদিন,' বললো রঞ্জন।

'অনেক রকম জিনিশ ছিলো এবার।'

'অনেক ! এত সুন্দর সব হাতের কাজ।'

'একটু চা খাবেন ?' অতসী জিগেস করলে।

'খাবে বইকি,' হিরণ্ময়ী ব'লে উঠলেন, 'আজ কিছু না-খেয়ে তুমি যেতে পারবে না কিছুতেই।'

অসময়ে যে-কোনো কিছু খাওয়া রঞ্জন অত্যন্ত অপছন্দ করে, কিন্তু সে আপত্তি করলে না একবারও। হ্যাঁ, খাবে বইকি—এ বাড়িতে ঢুকেই যে-দৃশ্য তার চোখে পড়েছিলো, তা বার-বার ফিরে-ফিরে আসছিলো

তার মনে। তার মনে পড়লো অতসীর ঈষৎ-আনত পিঠের উপর ছড়িয়ে-যাওয়া কালো চুল, কাঁধের কাছে আঁচরের চওড়া, কালো পাড়ের টুকরো। আর সরোজ—নতদৃষ্টিতেও সে যেন দেখে নিচ্ছে অতসীকে, অন্য কোনো ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করছে তাকে। নিছক খাওয়ার ব্যাপারে যে এত মধুরতা থাকতে পারে! একটুখানি আভাস মাত্র—কিন্তু রঞ্জন মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলো।

হিরণ্ময়ী তার সামনে নানারকম ফলে ভর্তি একটি রেকাবি এনে রাখলেন। দেখে রঞ্জন ব'লে উঠলো, 'এতগুলো!'

'কিছুই তো নয়।'

'দেখুন—' মিনতির স্বরে রঞ্জন আরম্ভ করলো।

'খাও-না যেটুকু পারো,' হিরণ্ময়ী বললেন, 'একটু জল এনে দে তো, অতসী।'

জল এলো। থালা-ভরা সব ফলের দিকে তাকিয়ে রঞ্জন গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেললো। অতসী বললো, 'খান।'

'খাচ্ছি।' সংকুচিতভাবে রঞ্জন এক টুকরো আম তুলে মুখে দিলে। এ-রকম নয়, এ-রকম নয়। সে দয়া ক'রে একটু খাবে, আর সবাই থাকবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে! তবু, যেন নিজের সঙ্গে বাজি রেখে সে আস্তে আস্তে খেয়ে যেতে লাগলো। ফলের সুস্বাদুতা সম্বন্ধে দু-একটা মন্তব্য করলে পর্যন্ত। দূরে স'রে সে থাকবে না; নিজেকে সে দেবে—তবে যদি সে গৃহীত হয়।

অতসী বললে, 'আমি চট ক'রে চা-টা তৈরি ক'রে আনছি। সরোজ, তোমাদের রান্নাঘর থেকে একটুখানি জল গরম ক'রে এনে দেবে?'

রঞ্জন চোখ তুলে তাকালো একবার। এমন অবাধ—এই চাওয়া, একজনের আর-একজনকে কিছু করতে বলা। সমস্ত মন দিয়ে যাকে স্বীকার ক'রে না-নেয়া যায়, তার কাছে অমন ক'রে চাওয়া যায় না। তার, রঞ্জনের পক্ষে কিছু করবার নেই—চুপচাপ ব'সে আমের টুকরো গেলা ছাড়া।

অতসীর সঙ্গে-সঙ্গে সরোজও উঠে গেলো রান্নাঘরে। শুধু গরম জল না, চা-ও তাকে দিতে হবে, আর চায়ের পেয়ালা—অতসী না-বললেও সে তা জানে। কিন্তু অতসী ও-সব দেখে বললে, 'এত কষ্টই যখন করলে, চা-টাও তৈরি ক'রে আনলেই পারতে।'

'আমাদের প্যাকেটটা নতুন খুলেছে, ভাবলুম—'

'ভালোই করেছো। আমাদের চা-টা বোধহয় পুরোনো হ'য়ে গেছে—কবেকার কেনা মনেও নেই।'

সরোজ পেয়ালা চামচে নিয়ে ব্যস্ত হ'লো।

'মুশকিল, এই রকম জলজ্যান্ত কোনো ভদ্রলোক যদি এসে উপস্থিত হন। তার উপর, উপকারক!' অতসীর শেষের কথাটায় এত জ্বালা ছিলো, যে সরোজের একবার চোখের পাতা পড়লো।

'ও-রকম ক'রে কেন বলছো। ভদ্রলোক তো বেশ ভালোই।'

'ভালো! ভালো! ভালো!' বলতে-বলতে অতসী চামচে দিয়ে চায়ের পেয়ালার গায়ে টোকা মারলো।

এদিকে বারান্দায় ব'সে হিরণ্ময়ী বললেন, 'ও কী? আর খাবে না?'

'না—সত্যি আর পারছি না।' রঞ্জনের কথার আন্তরিকতায় সন্দেহ করা অসম্ভব ছিলো। অতসী তার দৃষ্টির বহির্ভূত হবার পর থেকে আহারে তার উৎসাহ আরো যেন কমে গিয়েছিলো।

'থাক তাহ'লে, জোর ক'রে খেয়ে কাজ নেই।'

রঞ্জন কৃতজ্ঞ চোখে তাকালো।

হিরণ্ময়ী বললেন, 'এ-পথ দিয়ে যদি যাও, মাঝে মাঝে আসতে তো পারো।'

'হ্যাঁ, আসবো।'

'বাড়িটা এমন জায়গায়, এ-পাড়ায় আসবার কারুরই কোনো দরকার হয় না।'

'বেশ তো—ভালোই তো জায়গাটা।'

রঞ্জন অন্যমনস্কভাবে কথা বলছিলো। সে ভাবছিলো—তার মনে পড়ছিলো অতসীর সেই চকিত দৃষ্টি, একটু যেন শঙ্কিত, একটু মিনতির আভাস কি ছিলো না তাতে? প্রদর্শনীতে তার সঙ্গে দেখা হবার কথা অতসী কি তার মা-কে বলেনি? তার, তাহ'লে, এটুকু মূল্য আছে যে তাকে গোপন করতে হয়। তার কারণ যা-ই হোক। কারণ যা-ই হোক, সেটা কম নয়। অন্তত: একটা-কিছু তো। উদাসীনতার পরম শূন্য না-হ'য়ে তবু কিছু। কথাটা ভেবে রঞ্জনের ভালো লাগলো। আর, তাদের মধ্যে একটা গোপন কথা; একটা কথা—হোক তা তুচ্ছ, অর্থহীন,—যা আবদ্ধ রইলো তাদের দু-জনের মধ্যে। তাতে ক'রে অতসীকে একটু অন্তত মেনে নিতে হচ্ছে তাকে। তাতে ক'রে, অতসীর চোখে তার একান্ত বর্ণহীনতার কিছুটা কি ঘুচলো না? রঞ্জনের মনে হ'তে লাগলো, যেন এই সামান্য গোপনতার অংশগ্রহণেই অতসীর সঙ্গে তার একটা যোগাযোগের সূত্র স্থাপিত হ'য়ে গেছে, ভাব-বিনিময়ের একটা পথ যেন সে খুঁজে পেলো।

কিন্তু কেন এই গোপনতা? সত্যি, অতসী নিজেও জানে না, কেন সে তার মা-কে বলেনি, রঞ্জনের সঙ্গে তার যে দেখা হয়েছিলো। অবশ্য সব কথাই যে আমরা সবাইকে—এমনকি, আমাদের মায়েদের—বলি, তা নয়। কিন্তু অনেক কথাই বলবার যোগ্য নয়, অনেক কথাই আমরা ভুলে যাই—ভুলে গিয়ে বাঁচি। কিন্তু এটা—এটা যে সে ভুলে গিয়েছিলো, তা নয়; সে যে শুধু কথাটা বলেনি তা নয়, চেষ্টা ক'রে না-বলেছিলো। এ-প্রসঙ্গে তার মা উৎসাহী হ'য়ে উঠতেন—এবং সে তা জানতো। অনেকটা সেইজন্যেই সে বলেনি; তার মা-র উৎসাহিত অবস্থা সে সব সময় পছন্দ করতে পারতো না। তাঁর কাছে রঞ্জনের নাম উল্লেখ করবার কথা ভাবতেই তার খারাপ লেগেছিলো। নিশ্চয়ই, তার পরে তিনি নানা রকম কথা তুলতেন। এ ছাড়া আর-কোনো কারণ তার ছিলো না—এবং এই কারণটাও খুব স্পষ্ট হ'য়ে ছিলো না তার মনে।

আর হিরণ্ময়ীর মনে—মুখ-নিচু ক'রে ব'সে-থাকা রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে—হিরণ্ময়ীর মনে একটা তীক্ষ্ণ জয়ের অনুভূতি জেগে উঠলো, গোপন কোনো আক্রোশের একটা চরিতার্থতা। সবচেয়ে ভালো প্রতিহিংসা এ-ই তো। তিনি ভোলেননি—মৃণালিনীর, রঞ্জনের মা-র মুখের সেই অতি-মার্জিত অবজ্ঞার ভাব, যেন একটা গ্লানির সংস্পর্শে এসে তাঁর আত্মার রীতিমতো ক্লেশ হচ্ছে। তিনি—ওঃ, নববৈধব্যের শোকের বিলাসে তিনি এমন দূর, বিচ্ছিন্ন, শুভ্র, নীরক্ত আধ্যাত্মিকতায় প্রতিষ্ঠিত। তাঁকে যেন কেউ বিরক্ত করতে না আসে—প্রাত্যহিক সাংসারিকতার মলিনতা নিয়ে তিনি যেন প্রাণ ভ'রে

শোকের উৎসব করতে পারেন; তিনি যেন ব'সে থাকতে পারেন, চিন্তামগ্ন, নিঃসঙ্গ পাখির মতো, তাঁর সোনার ডিমের উপর শক্ত হ'য়ে ব'সে থাকতে পারেন। ওপারে, স্বামীর আত্মা, আর এই পৃথিবীতে স্বামীর সঞ্চয়ের বৃহৎ স্বর্ণডিম্ব—তাঁর ধ্যান। কোনোরকম চিত্তবিক্ষেপ তিনি সহ্য করতে পারেন না। পারেন না, পারেন না। বেশ, তিনি থাকুন তাঁর আধ্যাত্মিকতার পরিমণ্ডলে, শোক-শুভ্র—কোনো প্রহরী পাখির মতো স্তব্ধতায় একাগ্র। কিন্তু তাঁর ছেলে—তাঁর ছেলে তাঁকে ব্যর্থ করবে মিথ্যা আচরণে। এই তো সে। তিনি একা থাকবেন, —তাঁর অপার্থিব বিবর্ণতায়, তাঁর অচঞ্চল অধিকার-বোধে। কেউ আসবে না তাঁর ধ্যানভঙ্গ করতে। কিন্তু তাঁর ছেলে, তাঁর অধিকারের অতি প্রধান অংশ—সে তাঁকে ফাঁকি দেবে, সে বেরিয়ে আসবে, নিজেকে সে দেবে সেইখানে, যেখানে তাঁর পবিত্রতা-পাণ্ডুর আত্মার অপার বিমুখতা, প্রত্যাখ্যান।

অতসী চা নিয়ে এলো। রঞ্জন তার চোখে একবার চোখ ফেলে বললে, 'আপনারা কেউ চা খাবেন না?'

'চা আমরা খাইনে।' আমরা—বহুবচনের একটা অংশ সরোজ, সর্বদা অতসীর সঙ্গে, সর্বদা অতসীর পিছনে। ছায়ার মতো। আবছায়ায় অস্পষ্ট, কিন্তু অনস্বীকার্য কোনো মূর্তির মতো। রঞ্জনের বুকের মধ্যে যেন হঠাৎ একটা ব্যথা টনটন ক'রে উঠলো। আস্তে আস্তে সে চা খেতে লাগলো, ছোটো-ছোটো চুমুকে।

আর সেখানেই শেষ। সেখানেই শেষ, সেই সোনার সন্ধ্যার, রঞ্জনের মনের সোনায়-জ্বলে-ওঠা কল্পনার। কিছুই নয়। যেমন

হওয়া উচিত ছিলো, কিছুই যেন হ'লো না। সে যেমন ভেবেছিলো সে-রকম এ নয়—লাল-হ'য়ে-ওঠা আকাশের দিকে মুখ ক'রে ব'সে, এই অপরিসর বারান্দায় ব'সে একটু-একটু ক'রে সোনার রঙের চায়ে চুমুক দেয়া। ব্যাপারটা দেখতে যা, শুধুই তা-ই; তার বেশি এতটুকু নয়। কোনো নিহিত আগুন নেই কোনোখানে, চাপা কোনো বিদ্যুতের অনুভূতি—নেই অন্য কোনো আকাশের অন্য কোনো সূর্যাস্ত থেকে কোনো প্রেরণা, যার স্পর্শে সবই প্রাণময় হ'য়ে ওঠে, ভ'রে ওঠে অসীমের ইঙ্গিতে। সবই আছে—তবু, কী যেন নেই; যার জন্যে সবই নিজেকে অতিক্রম ক'রে অন্য কিছু হ'য়ে ওঠে, তা-ই নেই। রঞ্জনের মনে একটা অবমাননার মতো লাগলো। কখন সে-সময় আসবে, যখন বিদায় নিলে অভদ্র দেখাবে না, তারই জন্যে উৎসুক হয়ে উঠলো সে।

না, সহজ নয়। চিরন্তন আর্ডেন-বন এক মুহূর্তে মর্মরিত হ'য়ে উঠতে পারে যে-কোনো জায়গায়, ধূলিময় গলির ধারে পুরোনো বাড়ির এই অপরিসর বারান্দায়; লুটিয়ে পড়তে পারে সেই চিরবসন্তের হাওয়া, হৃদয় ঝংকৃত হ'য়ে উঠতে পারে গানে-গানে—আর তার ছদ্মবেশের আবরণ ভেদ ক'রে উন্মোচিত হ'তে পারে সেই চিরকালের রোজালিণ্ড—কী দুঃসহ সে আবিষ্কার! দেখা দাও, মুখ লুকিয়ে রেখো না। তুমি হ'য়ে ওঠো, আমার কল্পনায় তুমি যেমন। দূর করো অন্ধকার; তোমার মুখ দেখতে দাও। এ-ই তো কাহিনী—শতাব্দীর পর শতাব্দী, সময়ের অন্তহীন স্রোতের টানে যা চ'লে এসেছে; তা মুঞ্জরিত হ'য়ে উঠতে পারে যে-কোনো সময়ে, যে-কোনো জায়গায়—তা যখন আসবার তখন

আসবেই। চেষ্টা ক'রে তাকে বাধা দেয়া যায় না; ইচ্ছে করলেই তাকে পাওয়া যায় না। না, ইচ্ছে করলেই পাওয়া যায় না। তাকে টেনে আনা যায় না বাইরে থেকে। তাকে সৃষ্টি করতে হয় নিজের ভিতরে, নিজের জীবন দিয়ে। তার আছে নিজের সময়, নিজের পক্বতার সময়: আপন পটভূমিকায়, স্বতঃ-উৎসারিত প্রাণ-ঔৎসুক্যে সে একদিন ফুটে ওঠে, ফ'লে ওঠে ঐশ্বর্যময় পক্বতায়। তাকে হ'তে দিতে হয়: অসংবৃত অধৈর্যে তাকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া করলে চলে না।

রঞ্জন চ'লে যাবার পর অতসীকে একটু নিরিবিলি পেয়ে সরোজ বললে, 'কবে তোমার সঙ্গে রঞ্জনবাবুর দেখা হয়েছিলো একজিবিশনে?'

অতসীর চোখে চাপা আগুন ঝলসে উঠলো, 'তা দিয়ে তোমার দরকার কী?'

'চমৎকার ভদ্রলোক,' অত্যন্ত শান্ত, সাধারণ ভাবে সরোজ বললে।

'যা খুশি বলো,' অতসীর কণ্ঠস্বরে একটা অকারণ, প্রায় দুর্বোধ বিদ্বেষের সুর বেজে উঠলো, 'আমি তোমাকে ভয় করি না।'

সাত

বিপ্লব

এ-কথা সত্য যে কোনো মেয়ে যখন ঢেউ তোলে কোনো পুরুষের মনে, সে-মেয়ে তা মনে-মনে না-বুঝেই পারে না। সে চুপ ক'রে থাকতে পারে, ভান করতে পারে লক্ষ্য না-করবার; নিজেকে সে রাখতে পারে আড়ালে, দূরে সরিয়ে, কিন্তু সে জানবেই। বাতাসে তা বিদ্যুৎ-তরঙ্গের মতো, পুরুষ-মনের সেই বাসনা। তা তাকে সচকিত ক'রে তুলবেই, যতই সে উদাসীন হোক, সেই ঢেউ উপপ্লাবিত হ'য়ে এসে লাগবেই তার মনে।

তা-ই হ'লো অতসীর। সে দেখলো, রঞ্জনের চোখে কাঁপছে বাসনার শিখা। আর তার সমস্ত মন যেন জ'মে বরফ হ'য়ে গেলো, বরফের মতো শক্ত আর ঠাণ্ডা। এই অবমাননা—তা চরম। কী নির্লজ্জ মানুষ—নিছক ঘটনার চক্রান্ত তাকে যেখানে এনে দিয়েছে, তারই অন্যায় সুবিধে নেয়া! একজনের উপর যে-অধিকার নিতান্ত অবস্থার বিপর্যয়ে তার এসে গেছে, সেটাকে খাটাতে যাওয়া! এর চাইতে রুচিবিকার আর কী হ'তে পারে? বিদ্রোহে, তিক্ততায় অতসী অশান্ত, হিংস্র হ'য়ে উঠলো। সে তা হ'তে দেবে না। অত শস্তায় বিকিয়ে যাবে না সে। তার বিরোধিতা নগ্ন তলোয়ারের মতো, তীক্ষ্ণ দীপ্তিময়। সে পালিয়ে বেড়াবে না, লুকিয়ে থাকবে না। সে মুখোমুখি দেখবে, সে ঝলসে উঠবে আক্রমণে। রঞ্জন জানুক, সবই সহজ নয়

দয়া করার মতো। এমন মজা হবে, অতসী ভাবলে, রঞ্জনকে ব্যাহত করতে, ব্যর্থ করতে, কঠিন বিমুখতায় পরাস্ত করতে এমন মজা। যেন একটা নতুন অভিজ্ঞতার প্রচণ্ড দেশে এসেছে, উত্তেজনায় সে এমন চঞ্চল। তার রক্ত যেন ফেনিয়ে উঠছে তীব্রতায়, উল্লাসে। হ্যাঁ, এটাও এক রকমের উল্লাসই তো, প্রতিকূলতার এই নেশা। তা এত উন্মুখ, নিজের কেন্দ্রের মধ্যে এমন আবদ্ধ, সংকল্পে এমন দৃঢ়। অতসী নিজেকে তার মধ্যে ডুবিয়ে দিলে, যেন রসের প্লাবনে। নিশ্চয়ই সে মর্মাহত হ'তো, যদি কেউ তাকে সে-সময়ে বলতো যে এটাও আকর্ষণ, আকর্ষণেরই উল্টো দিক।

আর দিনের পর দিন, রঞ্জন অনুভব করতে লাগলো যে সে নিষ্ফল হ'য়ে যাচ্ছে। অনুভব করলো, তার যে বাজে খরচ করবার ক্ষমতা আছে, এই তুচ্ছ, তার প্রকৃত সত্তার পক্ষে সম্পূর্ণ অবাস্তব এই ব্যাপারটাই ব্যবধান হ'য়ে উঠেছে, তাকে আড়াল ক'রে রাখছে অতসীর চোখ থেকে। যে-উপলক্ষ্য তাকে তার কাছে এনে দিলে, সেটাই এখন প্রবল ফিরতি-ধাক্কায় তাকে রাখছে দূরে ঠেলে। রঞ্জনের কাছে এটা প্রকাণ্ড অবিচারের মতো ঠেকলো। এটা তো তার দোষ নয় যে তার কিছু পয়সা আছে। কেন অতসীর সঙ্গে তার অন্য কোনো অবস্থায় দেখা হ'লো না? কেন হ'লো না? কেন সে হ'লো না দরিদ্র? কেন এমন হ'লো যে অতসীর কাছে তার পরিচয়টাই হ'লো বিকৃত? কেন এমন ঘটনার বিপর্যয়, যাতে, সে যা, ঠিক সেই ভাবে অতসী তাকে দেখতে পারছে না—অন্য সব জিনিশ বাদ দিয়ে; তাকে আড়াল ক'রে রেখেছে ঐ টাকা নামক তুচ্ছ পদার্থটা। কিন্তু সে তো

দরিদ্রই, অতসীর কাছে; অতসীর কাছে সে যায় তো প্রার্থনার বেদনা নিয়েই। লুকিয়ে থেকো না, আর লুকিয়ে থেকো না; দেখা দাও। সে চলাফেরা করে খুব সাবধানে; অতি সামান্য উপহারও কিনতে ভয় পায়—পাছে কেউ কিছু মনে করে। পাছে কেউ মনে করে যে সেটা তার অর্থের দম্ভ। পাছে কারো এমন সন্দেহ হয় যে সে জিৎতে চাইছে নিছক টাকার জোরে, দুর্বলের মতো। পাছে—ওঃ, অন্ত নেই কুণ্ঠার, আত্ম-নিরোধের। সে যে অবস্থাপন্ন মানুষ তার কোনোরকম পরিচয়ই সে দেবে না: সে শুধু চায় তার নিজেকে প্রকাশ করতে, এই সংঘাত সে উত্তীর্ণ হবে তার নিজেরই জোরে। যেহেতু এই পরম দুর্ভাগ্য তার হয়েছে তাদের যে মা-মেয়েকে অর্থসাহায্য করতে হচ্ছে, সেইজন্য এমন যেন কেউ না ভাবে যে তার জোরে বিশেষ কোনো দাবি করছে সে। নিজেকে সে কেবলই খর্ব করবে, প্রতিহত করবে, অত্যন্ত সাধারণ হ'য়েও সে যেন যথেষ্ট সাধারণ হ'তে পারছে না। বিষম এক জ্বালা হয়েছে, তার এই টাকা। কিন্তু এ-কথা সে কেমন ক'রে বোঝাবে যে সে দু-হাতে টাকা ওড়াতে পারে, নিজের কাছ থেকে হঠাৎ ছাড়া পাবারই আনন্দে, মুঠি ভ'রে ছড়াতে পারে—অতসীর জন্য—না, তার নিজেরই আনন্দের নেশায়—শুধু যদি অতসী তা হ'তে দিতো!

পরের মাসে স্কলারশিপের টাকা পেয়ে সে একদিন দুপুরবেলা গিয়ে দিয়ে এলো হিরণ্ময়ীকে—অতসী তখন বাড়ি ছিলো না। এটা যদি তাকে করতে না হ'তো, নিজের মনে সে ভাবলে, তাহ'লেই ভালো ছিলো। যদি এর কোনো দরকারই না থাকতো! কী মুক্তিই তাহ'লে হ'তো তার।

হে বিজয়ী বীর

অতসীদের বাড়িতে খুব বেশি সে যায়ও না—যতটা সে মনে-মনে চায়, ততটা অন্তত নয়। সেখানেও সংকোচ। যতক্ষণ সে গেলে সবাই যেন ধন্য হ'য়ে যায়, ততক্ষণই বাধা। কারো ধন্য-হ'য়ে-যাবার সুযোগ সে নিতে পারে না। যখন যায়ও, অতসীকে বড়ো একটা একা পায় না: দেড়খানা ঘরের মধ্যে বাস করলে একজনের সঙ্গে আর-একজনের গা-ঘেঁষাঘেঁষি না হ'য়ে উপায় নেই। সেটা বরং তার ভালোই লাগে —অতসীর সঙ্গে একা থাকার সুযোগ যে তার বেশি জোটে না। সে-ব্যাপারটার প্রতি মনে-মনে তার একটু ভয়ের মতো ছিলো। খানিকক্ষণ এটা-ওটা আলাপ ক'রে অত্যন্ত মৃদুভাবে সে উঠে দাঁড়ায়—কোনোদিন বা অনুরোধে ব'সে যায় আরো দু-চার মিনিট।

তবু, ঐ প্রচ্ছন্নতার মধ্যেও, কোনো অদৃশ্য অন্ধ শক্তি যেন তাদের দু-জনকে আকর্ষণ করে পরস্পরের কাছে, আকর্ষণ ক'রে আবার দূরে ঠেলে দেয়: বাতাসে যেন চমকাচ্ছে অদৃশ্য বিদ্যুৎ। ভারি অদ্ভুত— শান্তভাবে ব'সে ঘরোয়া বিষয় নিয়ে আলাপ করা—আর, সব সময়, রক্তের মধ্যে সেই বিদ্যুতের চমক, অপ্রতিরোধ্য, অনির্বচনীয়। সব সময়, এই ছোটোখাটো কথার, সাংসারিক বিবর্ণতার পটভূমিকায় যেন আছে অন্য-কিছু—যেন অন্য-কিছু হ'য়ে ওঠবার চেষ্টায় ছটফট করছে, সব সময়। যেন নতুন কোনো চেতনা, নতুন কোনো রাত্রির রহস্য। কিছুই, ঠিক চোখে যেমন দেখা যাচ্ছে, তা নয়: যা-কিছু বলা হয়, কোনোখানে, কোনো নেপথ্যের অন্ধকারে, তার যেন আছে অন্য-কোনো অর্থ: সেখানে, যা ছিলো নেহাৎই কথা, তা হ'য়ে উঠছে বাণী। এই বিদ্যুৎ কি একদিন জ্ব'লে উঠবে না, রঞ্জন ভাবলো, স্নায়ুতন্ত্রর

ঘর্ষণে-ঘর্ষণে, শিরায়-শিরায় উন্মত্ত রক্তস্রোতে, সৃষ্টি-অবলোপকারী সর্বশেষ মূর্ছায়।

একদিন বিকেলের দিকে স্কুল থেকে ফিরে অতসী শুয়ে-শুয়ে বই পড়ছে, বারান্দায় জুতোর শব্দ হ'লো। বইয়ের দিকে তাকিয়েই অতসী বললে, 'সরোজ, মা তোমার জন্য কী যেন রেখেছেন রান্নাঘরে।'

জুতোর শব্দ চৌকাঠ পর্যন্ত এলো, এসে থেমে গেলো।

অতসী বইয়ের পাতা উল্টে বললে, 'খেয়ে নাও, সরোজ—তারপর চলো একটু ঘুরে আসি রমনায়।'

কোনো উত্তর নেই। অতসী দেওয়ালের দিকে মুখ ক'রে পড়ছিলো; একটু পরে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখলো, দরজার চৌকাঠে অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে দাঁড়িয়ে আছে রঞ্জন, যেন বুঝতে পারছে না, ঢুকবে কি ঢুকবে না।

'এ কী! তুমি!' ফশ ক'রে অতসীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো। তাদের মধ্যে বেশিদিন 'আপনি' বজায় রাখা সম্ভব ছিলো না—বড়ো বিশ্রী শোনায় সেটা, বাড়ির ঢিলেঢোলা আবহাওয়ায়। রঞ্জন—যখন অতসীকে সোজাসুজি লক্ষ্য ক'রে কোনো কথা তাকে বলতেই হ'তো, তাকে 'তুমি'ই বলতো। একজন বললে আর-একজনকেও বলতে হয়, কিন্তু অতসীর মুখ দিয়ে সেটা বেরোতে চায়নি সহজে। সমস্যার সমাধান করেছিলো ঘুরিয়ে কথা ব'লে, স্পষ্ট সম্বোধনের দায় এড়িয়ে। কিন্তু খুব বেশি কথা ও-কৌশলে বলা যায় না। ফলে হয়েছিলো এই যে, তাদের মধ্যে বলতে গেলে কোনো আলাপই হ'তো না; এমনিতে যেটুকু হ'তে পারতো, এই আড়ষ্টতার জন্যে তাও একেবারে তলায় এসে ঠেকলো।

কিন্তু এই অন্যমনস্ক মুহূর্তে অতসীর সংকোচ হঠাৎ ভেসে গেলো— 'কখন এলে?' উঠে বসতে-বসতে সে জিগেস করলে। আর, যে-মুহূর্তে তার খেয়াল হ'লো সে কী বলছে, যে-মুহূর্তে সে উপলব্ধি করলো তার কণ্ঠস্বরের অন্তরঙ্গ সুর, তার মুখ একটু লাল হ'য়ে উঠলো। তবু, নিজের কাছে সে তা স্বীকার করবে না। লজ্জা পাবার যে কোনো কারণ আছে, সে-কথা মনে করাতেই বেশি লজ্জা।

'তোমার মা—কোথায়?' এ ছাড়া রঞ্জন আর-কিছু বলবার খুঁজে পেলো না।

'মা গেছেন একটু উপরে।' তক্তাপোশ থেকে নেমে অতসী ক্ষিপ্র-হাতে তার চুলটা এলোখোঁপায় বেঁধে নিলে।

'এসো।'

রঞ্জন ঘরে ঢুকে তক্তাপোশের একেবারে ধারে বসলো। বললে, 'তোমার পড়ার ব্যাঘাত করলুম।'

'এখন আর এমনিও পড়তুম না।'

'তুমি যে দাঁড়িয়েই রইলে?'

'মা-কে ডেকে নিয়ে আসি উপর থেকে।'

'থাক না, উনি তো আসবেনই এক্ষুনি।'

'দেরিও হ'তে পারে।'

'হোক।'

'খামকা তুমি অপেক্ষা করবে কেন?'

'অপেক্ষা?'

'মা-র সঙ্গেই তো তোমার দরকার?'

'না,' রঞ্জন বললে, 'দরকার কিছুই নেই।' তারপর, অতসীকে নিরুত্তর দেখে : 'বোসো না তুমি।'

অতসী দাঁড়িয়েই রইলো, দরজার কপাটে হেলান দিয়ে। 'দরকার কিছুই নেই!' হঠাৎ সে ব'লে উঠলো, 'তোমার অনেক সময়—সময় নষ্ট করলে কিছু এসে যায় না।' অতসী তার মনকে আস্তে আস্তে সংহত ক'রে আনছিলো, বিরোধিতার তীব্র একাগ্রতায়। তার হৃৎপিণ্ড উত্তপ্ত হ'য়ে উঠছিলো—আক্রোশে, নিজের উপর অন্ধ অভিমানে। আজ সুযোগ পাওয়া গেছে; আজ সে নিজেকে একটু ছেড়ে দেবে; যে-গোপনতা তাদের দু-জনের মধ্যে গোপন কাঁটার মতো, আজ তাকে দেখবে মুখোমুখি।

অতসীর মুখের দিকে তাকিয়ে রঞ্জন মনে-মনে ভীত হ'য়ে উঠলো। 'ঠিক দরকারি নয়, এমন ব্যাপারেও মানুষ—শুধু সময় কেন, সময়ের চেয়েও অনেক বেশি কিছু নষ্ট করে। মানুষই করে। তুমি তা জানো না?'

'যেটা দরকারি নয়, সেটা মানুষ করে খুশির জন্য। ভালো লাগবে ব'লে।'

'ধরো না কেন এখানে এসে আমার ভালো লাগে?'

'সে তো বোঝাই যায়,' একটু চুপ ক'রে থেকে অতসী বললে, 'অন্যের জন্য আহা-উহু করতে ভালো লাগে সব সময়ই। কিন্তু আমি তো জানতুম সেটা দূর থেকেই ভালো চলে সব চাইতে।'

রঞ্জন মাথা নিচু ক'রে চুপ ক'রে রইলো। এর উত্তরে কিছু বলবার নেই তার, যদি কিছু বলতে যায়, আরো বেশি গোল পাকিয়ে যাবে সব

জড়িয়ে। কিছু না-বলাই ভালো : চুপ ক'রে সে এটা বহন করুক, এই আঘাত। যদি অতসীর ইচ্ছে হয় এ-সব কথা বলতে—না হয় বললোই : এ-সব কথার প্রতিবাদ করলেও খানিকটা স্বীকার ক'রে নেয়া হয়; রঞ্জন তা চায় না।

আর অতসী, তার বিরোধিতায় বিচ্ছিন্ন, সম্পূর্ণ, রঞ্জনের দিকে একবার তাকালো, আনত তার মাথার উপর সবেমাত্র বড়ো-হ'য়ে-ওঠা, ঘাসের ডগার মতো চোখা-চোখা চুলের দিকে, চুলের ঠিক নিচে ঘাড়ের মাঝখানে যে-একটা গর্ত, তার দিকে। পিছনের চুল প্রায় ঘাড় বেয়ে পড়ছে, হঠাৎ একটা অদ্ভুত রকম অবাস্তর কথা তার মনে হলো, এখন ছাঁটা উচিত্। আর ঘাড়ের মাঝখানে সেই ছোটো নিচু জায়গাটি, প্রাণ-কেন্দ্র, মেরু-দণ্ডের প্রাণ-স্রোতের উৎস—ছোটো সেই পেয়ালা, প্রাণের তিক্ততায় ভরা। অতসী তাকিয়ে রইলো সম্মোহিতের মতো। ঘৃণার তীব্র আনন্দে তার হৃৎপিণ্ড দুলে উঠলো। তার মধ্যে এত আকর্ষণ—সেই ছোটো নিচু জায়গাটিতে, মেরুদণ্ডের দৃঢ়, গর্বিত ভঙ্গিতে—এত আকর্ষণ ব'লেই এমন অসহ্য ঘৃণা। সে যদি সেখানে হাত রাখতে পারতো, সেই প্রাণ-কেন্দ্রে, যদি সেই পেয়ালা ভ'রে তুলতে পারতো তার ঘৃণায়, নিজেকে নিংড়ে যদি বিশুদ্ধতম ঘৃণা বিন্দু-বিন্দু ক'রে সেখানে ঢালতে পারতো—আঃ, তবে সে শান্তি পেতো মনে। সে-ই তো উচ্চতম চরিতার্থতা—তার আঙুলের মধ্যে সেই প্রাণের শিখা এত সুন্দর, এমন কাম্য, তার আঙুলের ফাঁকে-ফাঁকে সেই শিখার নৃত্য—যতক্ষণ না তা নিবে যায়, শেষ হ'য়ে যায়।

রঞ্জন অনুভব করছিলো তার শরীরের উপর অতসীর তপ্ত, শুষ্ক

দৃষ্টি—ভারি অস্বস্তি লাগছিলো তার। একটা মোহের মতো তা যেন তাকে জড়িয়ে ধরছে। কিছু-একটা করবার জন্যেই, কোনো রকমে সে-মোহ ভাঙবার জন্যে, অতসী যে-বইখানা পড়ছিলো, সে হাত বাড়িয়ে সেটি তুলে নিলো। বাংলা নভেল, কিছু আধুনিক গোছের। লেখক এমন, যার বই রাখা সম্বন্ধে এখনো দেশের কোনো-কোনো পাব্লিক লাইব্রেরির আপত্তি আছে।

‘কেমন বই ?’ রঞ্জন জিগেস করলে।

‘কেমন ! সময় কাটানো দিয়ে কথা।’

রঞ্জন বইখানা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে-করতে বললে, ‘ইনি তো ভালো লেখেন, শুনেছি।’

‘কোনো বাজে কথা নেই, আর যা-ই হোক।’

‘বাজে কথা মানে ?’

‘এই—লোকে যা-কিছু বলে। চাঁদ, তারা, ইত্যাদি।’

‘ও-সব বাজে তা জানলে কী ক’রে ?’

অতসী ঈষৎ কাঁধ-ঝাঁকুনি দিলে। ‘জানি না, সময় পাইনি ও-সব নিয়ে ভাববার।’

অতসীর সঙ্গে কথা বলা, রঞ্জন ভাবলে, গোলকধাঁধার ভিতর দিয়ে চলবার মতো : যেদিক দিয়েই এগোতে চাই, থামতে হবে খানিক দূর এসেই।

‘এ-ধরনের বই তোমার ভালো লাগে ?’

‘অন্য যে-ধরন, সেটা সত্যি-সত্যি ভালো লাগতে হ’লে কিছু মোটা রকমের আয় থাকা দরকার।—নিজের না হোক,’ একটু পরে সে জুড়ে দিলে, ‘স্বামীর। স্বামীর হ’লেই ভালো।’

হে বিজয়ী বীর

এমন ঝাঁঝ দিয়ে যে কেউ কথা বলতে পারে, রঞ্জন তা জানতো না। জানবার কথাও নয়। রঞ্জন নিজে—আর যে-সব লোকের সঙ্গে সে মিশেছে, তাদের কোনো কারণই নেই পৃথিবীর উপর রাগ করার। আর অতসী যেন রেগেই আছে। বিদ্রূপে সে শাণিত, বিদ্রোহে সে উদ্ধত। আত্মশ্লাঘার স্পর্ধায় সে নিজেরই প্রতি নির্মম। যে-সব লোক কেবলই নালিশ নিয়ে-নিয়ে সংসারে ঘুরে বেড়ায়, রঞ্জনের জীবনে তারা বিভীষিকা। সে সইতে পারে না তাদের এতটুকু সংস্রব। কিন্তু, একটু ঘাড় উঁচু ক'রে দরজায় হেলান-দিয়ে-দাঁড়ানো অতসীর দিকে তাকিয়ে সে ভাবলে, কিন্তু অভিযোগ যদি ফেটে পড়ে এই উপহাসের উত্তাপে, আত্মনির্ভরের এই ঋজুতায়—তাহ'লে না-হয় থাকলোই, অভিযোগ, না-হয় বিক্ষোভই থাকলো পৃথিবীর বিরুদ্ধে। সেটা—হ্যাঁ, সেটারও একটা রূপ আছে বইকি।

রঞ্জন একটু হেসে বললে, 'শেষ পর্যন্ত, বই পড়া ব্যাপারটা একটু উঁচুদরের একটা আমোদ—তাছাড়া আর কী?'

অতসী বললে, 'দু-রকমের বই পড়া আছে: এক হচ্ছে, খাওয়ার পর পান চিবোতে-চিবোতে পাখা খুলে দিয়ে বিছানায় শুয়ে—যতক্ষণ ঘুম না আসে; আর—তার উল্টোটা আরকি।'

'উল্টোটাই তোমার ধরন, বলতে চাও?'

'বাধ্য হ'য়েই। খাওয়ার পর ঘুমের সহায় হিশেবে বই—সে-বিলাসিতার সময় কই আমার?'

'তোমার স্কুলের কাজও তোমার ভালো লাগে?' রঞ্জন জিগেস করলে, আপাতত অসংলগ্নভাবে।

বিপ্লব

'যা করতেই হবে, সেখানে কোনো কথাই ওঠে না ভালো কি মন্দ লাগার।'

'কিন্তু তোমার তো ভালো লাগাই উচিত, কেননা তাতেও কোনো বাজে কথা নেই, একেবারে নিরেট বাস্তব।'

ঠোঁট বাঁকিয়ে জবাব দিলে অতসী, 'বাস্তব যখন অন্যের ঘাড়ে চাপে, তা নিয়ে ঠাট্টা করতে না পারে, এমন বীরপুরুষ তো দেখলুম না।'

রঞ্জন চুপ ক'রে তার আঙুলের নখের দিকে একটু তাকিয়ে রইলো। তারপর মুখ তুলে বললে, 'জীবনের ভার সবাইকেই বহন করতে হয়—কিছু-না-কিছু।'

'জীবন!' অতসী ছোট্ট ক'রে হাসলো। 'জীবনের তুমি কী বোঝো?'

'টাকার অভাব একমাত্র উপায় নয়, যা দিয়ে জীবনকে বোঝা যায়।'

'না, তা নয়,' অতসী বললে, 'তা নয়। চাঁদ তারা আছে কী করতে?'

রঞ্জন মনে-মনে বললে, 'ওরা আছে তোমার চোখে আর ঠোঁটে জ্বলতে, তোমার কালো চুলে ছড়িয়ে যেতে—তুমি যদি শুধু জানতে, যদি মুহূর্তের জন্যও তুমি জানতে, আমার চোখে তুমি কেমন!' হাতের বইখানা রেখে দিয়ে রঞ্জন উঠে দাঁড়ালো।

'যাচ্ছো নাকি?' অতসীর কণ্ঠস্বরে উৎসুকতা বেজে উঠলো। এখনো হয়নি, এখনো হয়নি। এখনো তিক্ততায় উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠেনি তার হৃদয়ের পেয়ালা। নিষ্ঠুরতার উৎসে পরিপূর্ণ নিমজ্জন—এখনো তার কিছু বাকি আছে।

'ভাবছিলুম একটু বাইরে ঘুরে আসি—'

হে বিজয়ী বীর

অতসী দরজা থেকে স'রে এসে বললে, 'বোসো একটু। মা-র সঙ্গে দেখা ক'রে যাও।'

'আর-একদিন আসবো।' রঞ্জন দরজা পর্যন্ত এলো, যেন যাবার জন্য, কিন্তু গেলো না। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করলে একটু। তারপর, 'তুমিও চলো না একটু রমনায় বেড়াতে,' সে বললে, 'মাকে ব'লে নাও।'

'না।'

'না কেন?'

'ইচ্ছে করছে না।'

'যদি না ভুল শুনে থাকি, একটু আগেই তুমি বলছিলে—'

'কী বলছিলাম? যা বলছিলাম, তা তোমার শোনা উচিত হয়নি।'

রঞ্জন হাসবার চেষ্টা ক'রে বললে, 'শোনা কি না-শোনা তো আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। যা কানে পৌঁছয় তা শুনতেই হয়।'

'দরজায় আড়ি পাতা কি ভদ্রতা?'

'দোষ যদি হ'য়ে থাকে, না-হয় ক্ষমাই করলে।'

'ক্ষমা! ও-সব ভালো-ভালো গুণ তোমাদের বিলাস।'

রঞ্জন কথাটাকে গায়ে না-মাখার ভান ক'রে বললে, 'যদি বিশেষ কোনো আপত্তি না থাকে, চলো না।'

'আছে আপত্তি।'

'এত কঠিন তুমি!' যে-কথা রঞ্জন মনে-মনে ভাবছিলো, তা হঠাৎ বেরিয়ে গেলো তার মুখ দিয়ে।

অতসী বাঁ হাত দিয়ে তার কপালের উপর লুটিয়ে-পড়া চূর্ণকুন্তল সরিয়ে বললে, 'এখন তোমার যাওয়াই ভালো।'

রঞ্জন সম্মোহিতের মতো আস্তে-আস্তে বললে, 'নিজেকে এর চেয়ে ছোটো আমি করতে পারি না। আর-কিছু আমি করতে পারি না।'

'এ-সব কথা বলবার জন্যেই কি তুমি আজ এসেছিলে?'

রঞ্জন চুপ।

'এ-সব কথা বলবার জন্যেই?' আবার বললে অতসী। সে যেন কথা ক'য়ে উঠছিলো জ্বরের ঘোরে, তীব্র জ্বরের আত্মবিস্মৃতিতে। 'কেন তুমি এখানে আসো,' কোনো হিংস্র আবেগে তার ভিতর থেকে অদ্ভুত চাপা স্বরে কথাগুলো বেরুচ্ছিলো, 'কেন তুমি এখানে আসো?' তার ভিতর থেকে একটা উত্তপ্ত অন্ধ শক্তি যেন ঠেলা দিয়ে-দিয়ে উঠছিলো; সে সম্পূর্ণরূপে তার বশে।

রঞ্জন তার মুখের দিকে তাকালো, তারপর চোখ সরিয়ে নিলে বাইরে, সন্ধ্যায় ম্লান আকাশে। তারপর বললে, 'তুমি জানো, কেন।'

'জানি! আমার মনের কথা তুমি দেখছি ঢের বেশি জানো আমার চাইতে।' কথাগুলো স্পষ্ট ক'রে উচ্চারণ করতে অতসীর কষ্ট হচ্ছিলো। তার শরীর মাঝে-মাঝে দুর্নিবারভাবে কেঁপে-কেঁপে উঠছিলো: নিজেকে সে ঠিক সামলাতে পারছিলো না।

'তুমি কি চাও না যে আমি এখানে আসি?'

'তুমি আমাদের উপকার করেছো,' অতসী তার সমস্ত আত্মার সংহত বিষ প্রতিটি কথায় ঢেলে দিলে, 'তোমার কাছে আমরা সবাই কৃতজ্ঞ।'

হে বিজয়ী বীর

আর একটি কথা না-ব'লে রঞ্জন আস্তে-আস্তে বারান্দায় বেরিয়ে গেলো, বারান্দা থেকে রাস্তায়। অতসী রইলো তার পিছনে তাকিয়ে। আর, যে-মুহূর্তে সে অদৃশ্য হ'লো, অতসী নিজেকে ছুঁড়ে ফেললে বিছানার উপর, দু-হাতে একটা বালিশ আঁকড়ে ধ'রে। বালিশ ভ'রে ছড়িয়ে গেলো তার কালো চুল। একটা প্রবল, উত্তপ্ত স্রোত ঠেলে উঠছে তার গলা পর্যন্ত; তার চাপে যেন কুঁকড়ে যাচ্ছে তার সমস্ত শরীর। তার আঙুলগুলো বার-বার আপনা থেকেই বেঁকে যাচ্ছিলো: বালিশের মধ্যে নখ বসিয়ে দিয়ে শক্ত হ'য়ে সে প'ড়ে রইলো। চেষ্টা করলো সেই তপ্ত স্রোতকে প্রতিরোধ করতে, তার মুহ্যমান স্নায়ুর সমস্ত শক্তি দিয়ে। সহ্য হয় না, আর সহ্য হয় না। এখন আর কারো উপর রাগ নয়—এখন দুঃখ, নিজের জন্য, নগ্ন, তিক্ত, অসহায় দুঃখ। তার সমস্ত জীবনের ব্যর্থতা আর লাঞ্ছনা, সমস্ত গ্লানি, সমস্ত হতাশা—সব যেন এক নিরাবরণ, নিষ্ঠুর মুহূর্তে প্রগাঢ় হ'য়ে, বিশুদ্ধ হ'য়ে উদ্‌ঘাটিত হ'লো তার কাছে: যে-সব কথা সে ভুলে গিয়েছিলো, যত কথা তার কখনো মনে হয়নি—সব এক বিদ্যুৎ-উন্মেষে দীর্ণ ক'রে দিয়ে গেলো তার হৃৎপিণ্ড। সহ্য হয় না, আর সহ্য হয় না। পথের শেষ নেই; সীমা নেই পথ-ভরা অন্ধকারের। কেন তাকে চলতেই হবে; কেন হঠাৎ এক মুহূর্তে থেমে যাওয়া যায় না, কেন সে মিলিয়ে যেতে পারে না অন্ধকারের অসীমে? এ-ই যদি জীবন হয়, শুধু দু-হাতে অন্ধকার ঠেলে-ঠেলে এগোনো—তাহ'লে তার জন্ম হয়েছিলো কেনই বা। কেন তাকে দেয়া হয়েছিলো এই জীবন, সে তো তা চায়নি। কী মধুর, কী অনির্বচনীয় মধুর না-হ'তে পারা। না-হওয়া: প্রাক-জন্ম সেই অন্ধকার, গর্ভলীন শিশুর সেই

পরিপূর্ণ, স্বপ্নহীন ঘুম। কী প্রয়োজন ছিলো সে-ঘুম ভাঙবার? ফিরে কি যাওয়া যায় না সেই নিশ্চিহ্ন বিলুপ্তিতে, সেই গভীর নিশ্চেতন অস্তিত্বে— অস্তিত্বহীনতায়? নিজেকে প্রশ্রয় দিয়ে অতসীর অভ্যেস ছিলো না: ভাবের ব্যাপারে, সে ছিলো কঠোর তপস্বিনী। প্রাণ ভ'রে দুঃখ অনুভব করবার তৃপ্তি থেকেও বরাবর সে নিজেকে বঞ্চিত ক'রে এসেছে। কিন্তু এখন— তার মধ্যে কোথায় যেন একটা ছোটো বাঁধ ভেঙে গেছে, উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠছে—যা-কিছু এতদিন চাপা প'ড়েছিলো। তাকে নিলে ভাসিয়ে। যদি একেবারে ভেসে যাওয়া যেতো: যদি সে ডুবতে পারতো—অতল, নিবিড় কোনো শূন্যতায়—যেখানে অনুভূতি নেই, সেখানে সব শান্ত, সব স্তব্ধ, জীবনের স্বর যেখানে পৌঁছয় না, শতাব্দীর পর শতাব্দী যার উপর দিয়ে গড়িয়ে যায় একটু আঁচড় না-কেটে।

নিঃশব্দে, সরোজ ঘরে এসে ঢুকলো। একটু আগে সে ফিরেছে তার কাজ থেকে। তার হাতে নতুন একটা মাসিকপত্র—কিনে এনেছে ফেরার পথে। অতসীর প্রিয় এটা। এই একমাত্র উপহার, যা সে সরোজের হাত থেকে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করে, সানন্দে। ঘরে ঢুকে একটু অবাক হ'য়ে সরোজ ব'লে উঠলো, 'এ কী! এ-সময়ে শুয়ে আছো?'

অতসী মাথা তুললো না।

'অতসী,' সরোজ ডাকলো। জবাব নেই। স'রে এসে দাঁড়ালো তার মাথার কাছে। মাথাটা বালিশে ডোবানো—দেখবার উপায় নেই। ঘুমিয়েছে? তাকে স্পর্শ করতে সরোজের সাহস হ'লো না। নীরবে

সে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলে; তারপর হাতের মাসিকপত্রটা সশব্দে ছুঁড়ে ফেললো মেঝের উপর।

অতসী মুখ তুলে বললে, 'আঃ, কী করছো!' ব'লেই আবার মুখ ঢাকলো বালিশে। কিন্তু সেই চকিত মুহূর্তেই সরোজ তাকে দেখে নিলে, তাকে সম্পূর্ণ ক'রে দেখে নিলে। আর তার বুকের মধ্যে সব তন্ত্রীগুলো উঠলো মোচড় দিয়ে। সে মনে করতে পারলো না, অতসীর মুখের ও-রকম চেহারা সে দেখেছে কখনো। যেন কেউ শক্ত মুঠিতে তা আঁকড়ে ধরেছে ভিতর থেকে। সরোজের হৃৎপিণ্ড দ্রুত স্পন্দিত হ'তে লাগলো। 'কী হয়েছে? কী হয়েছে, অতসী?' সে ব'লে উঠলো।

উত্তরে, অতসী শুধু বালিশটাকে আরো শক্ত ক'রে নিজের সঙ্গে লেপটে নিলে।

'কী হয়েছে? কোনো অসুখ করেছে তোমার?'

অতসীর অস্ফুট, চাপা স্বর শোনা গেলো, 'তুমি যাও।'

অত্যন্ত নরম, আর্দ্রস্বরে সরোজ বললে, 'ওঠো না; এই সন্ধেবেলা শুয়ে থাকতে নেই?'

হঠাৎ মুখ তুলে অতসী ব'লে উঠলো, 'কেন মিছিমিছি আমাকে জ্বালাতে এসেছো? তুমি যাও!' বলতে-বলতে তার গলা ভেঙে গেলো; অদ্ভুত, বিকৃতস্বরে সে আবার বললে, 'যাও তুমি!'

আর পরমুহূর্তে সে ভেঙে পড়লো কান্নায় আর কান্নায়: ভিতর থেকে উথলে-ওঠা উত্তপ্ত বন্যার কাছে সে অসমর্থ, অসহায়। সে-কান্নার যেন শেষ নেই; সন্ধ্যার আসন্ন ধূসরতার ভিতর দিয়ে, তার বুকের

মধ্যে হঠাৎ গভীর নিশ্বাস টেনে নেবার শব্দ থেকে-থেকে বেজে উঠতে লাগলো। আর সরোজ দাঁড়িয়ে রইলো তার শিয়রের ধারে,

আট

সকাল ও সন্ধ্যা

কিন্তু রঞ্জন রায় হার মানবে না। এমন কিছু নেই, যা অতসী করতে পারে, রঞ্জনকে যা অপস্থত করবে—শেষবারের মতো। শেষ এর নেই। যেখানে শেষ, সেখানেই আবার নতুন স্থচনা। যতবার সে চ'লে আসে অতসীর কাছ থেকে, ততবার সে যেন ম'রে যায়—সাময়িক একটা মৃত্যু, অনিবার্য। কিন্তু সেই মৃত্যু-উৎস থেকেই নব-জীবন, প্রাণের পুনরুত্থান। যতবার সে মরে, ততবার সে বেঁচে ওঠে : ফিরে আসে অতসীর কাছে, বাসনায় প্রবল। কে তাকে ফিরিয়ে দেবে? তাকে রোধ করবে কে? তার বাসনার পক্ক, রক্তিম ফল—তাকে সে নেবে দু-হাতে তুলে, দু-হাতের মুঠির মধ্যে—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে সঞ্চিত সেই লাল ফল ঝলমল ক'রে উঠবে সময়ের আবরণ ছিন্ন ক'রে। মেঘস্তূপ থেকে ঠিকরে-পড়া একটি রোদ্দুরের রেখার মতো, বিজয়ীর হাতে ঊর্ধ্ব-উত্থিত তলোয়ারের অভীপ্সার মতো, ঈশ্বরের অঙ্গুলি-ইঙ্গিতের মতো। তার জয় হবে, তারই জয় হবে। আর কী অতসী করতে পারে? সে-ই বা আর কী করতে পারে? কিন্তু আর-কিছু করবার নেই যে। শুধু অপেক্ষা, শুধু নীরবে অপেক্ষা—যতদিন না সময় আসে, যতদিন না নিশীথের অন্তর্লীন স্বরে-স্বরে হৃদয়ের অন্ধকার ছেয়ে যায়। তা আসছে, তা হ'য়ে উঠছে, মৃত্যুর মতো নিশ্চিত। তারই ছায়া পড়েছে অতসীর চোখের পাতায় স্বপ্নের মতো, বিদ্রোহী নিশানের

মতো যা উন্মীলিত, উদ্ধত। অতসীর অশান্ত বিক্ষোভে তো উদ্বেল হ'য়ে ওঠে তারই পূর্বাভাস। অতসী তাকে যখন আঘাত করতে চায় নিষ্ঠুর কথায়, বিরূপ আচরণে—তখন তার আঘাত লাগে, খুবই লাগে—কিন্তু একদিক থেকে তা সে উপভোগও করে, তার নিপীড়িত অবরুদ্ধ হৃদয় যেন তা থেকেই নিংড়ে বের করে সুখের অবলেপ। কেননা, মনে-মনে সে জানে যে দু-জনের মধ্যে তারই জোর বেশি : তার ইচ্ছাই অলঙ্ঘ্য, চরম—শেষ পর্যন্ত। সেই ইচ্ছারই গোপন শক্তি ঢেউ তুলে যাচ্ছে অতসীর রক্তে। তাকে আঘাত করতে, অপমান করতে, তাকে কিছু-না ক'রে দিতে তার এই উন্মত্ত আগ্রহ সেইজন্যেই। অতসীর যুদ্ধ তার নিজের সঙ্গে, আর রঞ্জন—সে তার বাসনার শক্তিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত : সে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখতে পারে, অপেক্ষা করতে পারে।

সামনের বার অতসীর ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেয়া এক রকম ঠিক হলো। দু-হাত পেতে-নেয়া অনুগ্রহ—ভাবতে অসহ্য লাগে অতসীর। কিন্তু ভেবে কী হবে—উপায় যখন নেই। ব্যাপারটা এতদূর এগিয়ে গেছে, এখন আর এড়ানো যায় না। এ যদি হ'তেই হয়···হোক। যদি কোনো উপায়ে মনের সমস্ত অনুভূতিকে অসাড় ক'রে দেয়া যেতো! যদি, মুহূর্তের পর মুহূর্ত, যান্ত্রিক নিয়মে সে চলতে পারতো, কোনোদিকে না-তাকিয়ে, কিছু না-ভেবে। এ একটা সুযোগ, যা সে হেলায় হারাতে পারে না। কয়েকটা পরীক্ষা পাশের উপর তার ভবিষ্যৎ ঝুলে আছে—তার অন্নসংস্থান, তার নিছক অস্তিত্ব। এটা স্পষ্ট যে এ-ব্যবস্থা চিরকাল চলতে পারে না। জীবনে একটা অংশ তারও আছে—কেন সে তা দখল ক'রে নিতে পারবে না? না, তাকে নিতেই হবে; নিতেই হবে

একটু জায়গা ক'রে। সে-ও বাঁচবে। তার বুদ্ধি আছে যথেষ্ট, কাজে তার আলস্য নেই—কেন শুধু একটু সুযোগের অভাবে সে চাপা প'ড়ে থাকবে, ম'রে থাকবে? বাঁচতে তাকেও হবে। কিন্তু—যদি সেই জীবন তাকে নিতে হয় অন্যের হাত থেকে! কেন নয়? কোনো-কোনো হিংস্র মুহূর্তে তার মনে হয়, কেন নয়? দোষ কী তাতে। কেউ একজন যদি বোকামি করে, তার সুবিধে নিতে কী দোষ? প্রচুর যার আছে, তার মুঠো থেকে বাড়তি যেটা খ'সে পড়ে, তার কোনো কাজেই তা লাগবে না—অন্য কেউ যদি কাছে থেকেও সেটার ব্যবহার না করে, সেটাই তো অন্যায়। যার অনেক আছে, তার তো চাই-ই কোনো-না-কোনো বিলাসিতা। ওড়াবার কোনো রাস্তা না-পেলে সে বাঁচে না। হ'তে পারতো মদ: না-হয় হয়েছে দয়া। একই, আসলে। কোনো উপায়ে, কোনো অছিলায় মনকে দিতেই হয় খুলে, নয়তো সে বাঁচবে কী নিয়ে। তার জীবনের অবরুদ্ধ সংকীর্ণতায় তো হাঁপিয়ে উঠবে সে। তাকে দিয়ে যদি অপব্যয় করানো হয়, তাতে ভালো করা হবে তারই।

নিষ্ফল, নিষ্ফল, পরমুহূর্তেই হয়তো তার মধ্যে কথা ক'য়ে ওঠে হতাশার স্বর, নিষ্ফল তর্ক, ছেলেমানষি, মনকে ছেলে-ভুলোনো! শুধু, অপমানের উপর রঙিন কথার আচ্ছাদন। সে জানে, সে ভালো ক'রেই জানে।

কিন্তু এতে কী এতটাই এসে যায়—সত্যি-সত্যি? কেননা, অন্যের হাত থেকে আমরা সব নিতে পারি—সব; আমাদের অন্ন, নিশ্বাসের বাতাস; কিন্তু জীবনের সৃষ্টি হয় নিজেরই মধ্যে, নিজেরই উত্তাপ দিয়ে। কারণ, শুধু

সকাল ও সন্ধ্যা

বেঁচে থাকার নাম তো জীবন নয়; সেই বেঁচে থাকা নিয়ে আমরা কী করি, জীবন মানে তা-ই। সেখানে প্রত্যেকে স্বাধীন, প্রত্যেকে স্বতন্ত্র, অমোঘ। পৃথিবীর এমন কোনো পরাক্রম নেই, সেখানে যার এতটুকু প্রভাব ছড়াতে পারে। কেউ কাউকে ঘাঁটাতে পারে না, বাধা দিতে পারে না সেখানে। সেখানে আমার নিজের জন্য আমিই দায়ী, শুধু আমি। সে-দায়িত্ব চরম। অতসীরও আছে তার নিজের জীবন—বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গতায়; তারই অধিকারে সে ঐশ্বর্যময়। কেন সে ভয় পাবে, কিসের জন্য তার লজ্জা।

গতরাত্রে প্রায় নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টি হ'য়ে গেছে: সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে আকাশের দিকে তাকিয়ে অতসীর মন কৃতজ্ঞতায় ভ'রে গেলো এ-কথা ভেবে যে আজ রবিবার। সে কি স্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছিলো— না কি কোনো মোহ ছিলো ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে-ফাঁকে বেরিয়ে-পড়া আকাশের নীলে, রোদে চিকচিক ক'রে-ওঠা বৃষ্টিতে ধোওয়া সবুজ পাতায়—কী কারণ জানে না, যেন এক অকারণ, অসাধারণ সুখে গুনগুন ক'রে উঠছিলো তার সমস্ত মন। কী-যেন একটা গন্ধ, বাতাসে কিসের অনুভূতি। এই সমস্ত দিন তার, এই দীর্ঘ, সোনালি দিন—তার, উপভোগ করবার, অনুভব করবার, আত্মার গভীরে সঞ্চয় ক'রে রাখবার জন্য। তুলনা হয় না এই সৌভাগ্যের, তৌল করা যায় না এই ঐশ্বর্যকে। আর কিছু সে চায় না: শুধু মাঝে-মাঝে এমনি একটি সোনার দিন তাকে দেয়া হোক, সোনার সূর্যের এই দিন—যখন আকাশ নীলে-নীলে ভেঙে পড়ছে, স্বপ্নের সমুদ্রে নীল ঢেউয়ের মতো।

এই সুখ—তা নিষ্ক্রিয় হ'য়ে থাকতে পারে না: তা উছলে উঠবেই

হে বিজয়ী বীর

যে-কোনো রকমে, কোনো তুচ্ছ কাজে, সেই কাজের তুচ্ছতাকে অপরূপ ক'রে তোলায়। 'শোনো, একটা কাজ করতে পারবে?' সরোজ এলে পরে অতসী বললে। সাধারণত, নিতান্ত নিরুপায় নাহ'লে সরোজকে সে কোনো কাজের কথা বলে না: কিন্তু আজ এমন সহজ, স্বাভাবিকভাবে অতসীর মুখ দিয়ে কথাটা বেরুলো যে সরোজ একটু অবাক হ'য়ে তার মুখের দিকে তাকালো।

'বলো, কী।'

'একটু যদি বাজারে যাও—একটা ইলিশ মাছ আনতে পারবে, বেশ ভালো দেখে?'

'ইলিশ মাছ?' সরোজ সম্মতি জানাবার আর-কোনো ভাষা খুঁজে পেলো না।

'হ্যাঁ—ভালো দেখে একটা ইলিশ—আস্ত—কাটা নয় কিন্তু। এই নাও।' শেলাই রাখবার বিস্কুটের টিন থেকে অতসী একটা টাকা বের ক'রে দিলে। তার শেলাই-বিক্রির পয়সা থেকে সে সব সময় কিছু-কিছু সরিয়ে রাখতো নিজের কাছে: সংসার নামে যে-ব্যাপারটা সে দেখেছিলো, তাতে যত বেশি দেয়া যায়, ততই বেশি লাগে।

'এক টাকা! এত দিয়ে কী হবে?'

'যা লাগে। আর শোনো—একটা রুই মাছের মাথাও এনো, যদি পাও। চিঁড়ে দিয়ে রাঁধবো।'

'কী হবে এত দিয়ে?'

'কী আবার হবে। খাবো। তুমিও খাবে অবিশ্যি।' তারপর আবার বললে, 'তুমি এখানেই খাবে কিন্তু, বুঝলে?'

সকাল ও সন্ধ্যা

মাছ এলো।

হিরণ্ময়ী বললেন, 'মস্ত মাছ দেখছি। কত খাবি?'

'দু-জনের পক্ষে এমন কী বেশি।'

হিরণ্ময়ী হেসে উঠলেন, 'কথা শোনো মেয়ের!'

'তা হ'লোই বা বেশি। হাবুলকেও বলবো না-হয়। বড্ড ইচ্ছে করছে মা, ইলিশ মাছ খেতে; কতকাল যেন খাইনা মনে হচ্ছে।'

'ইলিশ ছাড়া কোনো মাছই তো আসে না আজকাল।'

'সত্যি? মনে পড়ছে না তো।'

'কী খাবি বল। কোলের মাছ কয়েকখানা ভাতে দিই, আর—'

'তুমি থামো, মা, তুমি যাও এখান থেকে। আমি সব করছি।' ব'লে অতসী রান্নাঘরের এক কোণে বঁটি নিয়ে ব'সে মাছ কুটতে বসলো।

'এই—করছিস কী?' একটু পরে হিরণ্ময়ী ব্যাকুলস্বরে ব'লে উঠলেন, 'ইলিশ মাছ ও-রকম ক'রে কাটতে হয় বুঝি?'

'তবে?'

'গলার কাছটা আড় ক'রে ধর, তারপর—'

'বেচারাকে যদি কাটতে পারি মা, তাহ'লে যেদিক দিয়েই কাটি না কেন, একই কথা।'

'বুঝেছি। তুই উঠে আয়, আমি দিচ্ছি কেটে-কুটে।'

'তুমি যাও, মা, এখান থেকে। ছাখো না কী করি।'

'নষ্ট করবি আরকি সব।'

'না-হয় করলুমই।'

হে বিজয়ী বীর

অতসীর রান্না যখন আদ্ধেকের কাছাকাছি, হিরণ্ময়ী এসে বললেন, 'এই, রঞ্জন এসেছে।'

'কে, রঞ্জন ?' ব'লে সে মাছেব ঝোলের কড়াইতে কয়েকটা কাঁচালঙ্কা ছেড়ে দিলে। আর-কিছু বললে না। উজ্জ্বল দিনের উপর হঠাৎ যেন একটা কালো পরদা নেমে এলো। ঠিক এই সময়েই সে কেন এলো—মেঘে-সোনায় ঝিলিমিলি এই সকালবেলায়, অতসী যখন সব ভুলে ছিলো, ভবিষ্যতের সব ভাবনা, অতীতের সব আক্ষেপ, যখন তার অন্তরে খুলে গেছে স্বতঃস্ফুর্ত সুখের উৎস ? ঠিক এই সময়েই কি ওকে আসতেই হ'লো—আমাকে মনে করিয়ে দিতে, আমাকে টেনে নামাতে বর্তমানের পঙ্ক-শয্যায়, আলোয় উদ্ভাসিত আকাশটাকে ভাবনার হিজিবিজি আঁচড়ে কালো ক'রে দিতে !

হিরণ্ময়ী বললেন, 'ওকে বলবি নাকি—এখানে খেয়ে যেতে ?'

'কাজ কী, মা।'

'বললে হয়। ভালো দেখায় না একদিন ওকে খেতে বললে ?'

'বলতে হয় একদিন ওকে আলাদা ক'রে বোলো—বাড়িতে গিয়ে নেমন্তন্ন ক'রে এসো।'

'তেমন কি আর সুবিধে হবে আমাদের।'

'কিন্তু এসেছে ব'লেই খেয়ে যেতে বলাটা অভদ্রতা বোঝো তো।' অতসী হাত দুটো ধুয়ে নিয়ে আঁচলে মুছলো। 'মাছের ঝোলটা একটু দেখো, মা—এক্ষুনি আসছি !'

উনুনের ধার থেকে স'রে এসে অতসী চোখ নামিয়ে নিজের শরীরটার দিকে একটু তাকালো। ময়লা শাড়ি তার পরনে : আঙুলে, আঁচলে,

মশলার দাগ। চেহারার ছিরি হয়েছে বটে—এতক্ষণ উনুনের ধারে বসে-বসে! কিন্তু এ-সব কথা ভাবছেই বা কেন? ওঃ, চেহারা আর পোশাক নিয়ে মেয়েদের এই চিরন্তন ভাবনা! জ্ঞানবৃক্ষের সবচেয়ে পচা ফল। তার মনে পড়লো, এগজিবিশনে সেই সন্ধ্যায় সে তার বন্ধুর সঙ্গে তর্ক করেছিলো। তর্ক করা সহজ: বুদ্ধি থাকলে যে-কোনো পক্ষ নিয়ে লড়াই করা যায়। সে বলেছিলো, মেয়েরা যে সাজে, তার মধ্যে পুরুষকে আকর্ষণ করবার কোনো ইচ্ছে নেই। নেই? কে জানে আছে কি নেই। এটুকু শুধু বলা যায় যে মেয়েদের সাজ তাদের আত্মার একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ; সেটা একটা প্রবৃত্তিরই মতো, তাকে উপড়ে ফেলা যায় না, তার বশ্যতা, জেনে কি না-জেনে, স্বীকার করতে হয় সব মেয়েকেই। কেন সাজ? সুন্দর হবার জন্য? সুন্দর দেখাবার জন্য? ও-দুটোয় স্বর্গ-মর্ত্যের ব্যবধান। না কি, মূলে ও-দুটো একই জিনিশ: বিশুদ্ধ রসের প্রেরণায় কেউ সুন্দর হ'তে পারে না—একটা লক্ষ্য থাকা চাই, অন্তত উপলক্ষ্য; সৌন্দর্যেরও একটা উদ্দেশ্য থাকা চাই পূর্ণ করবার, তাকে হ'তে হবে অন্য কোনো-কিছুর সঙ্গে সম্পৃক্ত; শূন্যতায়, কোনো বৃন্তহীন, আশ্চর্য দৈবফুলের মতো তা ফুটে উঠতে পারে না।

অতসীর সমস্যা অমীমাংসিত র'য়ে গেলো। ঘরে ঢুকে সে বললে, 'কী, হঠাৎ এ-সময়ে?' অতসী সর্বদা রঞ্জনকে এমনভাবে সম্ভাষণ করতো যেন সে হঠাৎ এসে পড়েছে, অসময়ে, যেন তারা কেউ তাকে আশা করেনি, তার আসবার জন্য প্রস্তুত ছিলো না।

রঞ্জন বললে, 'এক সময়ে তো আসতেই হবে।' তারপর তাকে ভালো ক'রে লক্ষ্য ক'রে বললে, 'রান্না করছিলে?'

'দেখছোই তো।'

রঞ্জন অপরাধীর মতো বললে, 'কয়েকটা বই এনেছিলাম।'

'বই!' রঞ্জনের মুখের এক-একটা কথার অতসী যে-রকম ক'রে পুনরাবৃত্তি করতো, তা যে-কোনো যুবকের রক্ত জল ক'রে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

'বই,' রঞ্জন তার হাতে ধরা ব্রাউন পেপারে জড়ানো প্যাকেটটার দিকে ইঙ্গিত করলো। 'দরকারি বই। তোমার পরীক্ষার জন্যে।'

'পরীক্ষা—কিসের?'

'তোমার ইণ্টারমিডিয়েট—'

'তার এখনই কী?'

'এখন থেকেই একটু-একটু ক'রে পড়ো। সংস্কৃত আর অঙ্ক আর লজিক বলেছিলে না?'

'সবগুলো বই তোমাকেই বুঝি আনতে হ'লো?'

'যদি তোমার আপত্তি না থাকে, আমি তোমার পড়াতেও সাহায্য করতে পারি তোমাকে।'

'পারো।' অতসীর মনে নামহীন একটা আবেগ যেন মাথা খুঁড়ে মরছে, তার কোনো ভাষা নেই।

'ছাখো, সবগুলো ঠিক আছে কিনা।' রঞ্জন প্যাকেটটা তুলে অতসীর হাতে দিলে।

সেটা খুলে অতসী ছাখে, ঝকঝকে নতুন একরাশি পাঠ্য বই, কাগজের গন্ধে ভরপুর। তার দুই হাতের মধ্যে ঠিক ধরছিলো না, বইগুলো তক্তাপোশের উপর রেখে নেড়ে-চেড়ে দেখতে লাগলো একটার পর একটা।

'ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে।'

ছেদ। অতসী একটা বই তুলে নিয়ে মসৃণ, শাদা কাগজের উপর আঙুল বুলোতে লাগলো, আস্তে-আস্তে, যেন আদর ক'রে, ভালোবেসে। নাকের কাছে এনে ঘ্রাণ নিলে দু-একবার। সেই ফাঁকে রঞ্জন দেখতে লাগলো তাকে—আনত তার মুখ, মলিন; অস্নাত, রুক্ষ চুল, ব্লাউজটা পিঠের দিকে খানিকটা ভিজে গেছে ঘামে। মনে হ'লো, অতসীকে এত কাছে থেকে আগে কখনো ছাখেনি। এত নিকট, এত নিবিড়—মশলার চিহ্ন আঁকা তার শাড়ি, অগোছালো চুল আর করুণ ক্লান্ত মুখ নিয়ে। তবু, কোথায় যেন বিচ্ছিন্নতা, স্বপ্নাভ একটা অস্পষ্টতা—সে কি তার দাঁড়াবার ভঙ্গিতে না মুখের ম্লানিমায়, না কি কাঁধের উপর দিয়ে তার আঁচলের বিষণ্ণ লুটিয়ে পড়ায়, না কি এর কোনো একটাতে নয়, সব-কিছু জড়িয়ে এরই মধ্যে, না কি আরো বেশি অন্য কিছুতে—কোথায় যেন কী-একটা ছিলো, যাতে তাকে মনে হয় একটা উপস্থিতি, সময়ের অনাদি গহ্বর থেকে আকস্মিক কোনো আবির্ভাব। আর হঠাৎ, রঞ্জনের হৃদয়ের অরণ্য মর্মরিত হয়ে উঠলো, দোলা দিয়ে গেলো পল্লবে-পল্লবে আর্ডেনের হাওয়া। আ—রোজালিণ্ড, রোজালিণ্ড, আমি তোমাকে দেখেছি, আমি তোমাকে চাই। ভয় কোরো না, আর ভয় কোরো না: ছিন্ন করো এই ভান; প্রকাশিত হও ছদ্মবেশ ছিন্ন ক'রে, দূর হোক সংশয়।

আর তাই রঞ্জনকে চ'লে যেতে হবে, যেহেতু সে অতসীকে দেখেছে অত কাছে থেকে, যেহেতু তার মনের মধ্যে কথা ক'য়ে উঠেছে আর্ডেনের বন।

আর থাকা বৃথা। অতসী তার দিকে মুখ ফেরাবে না; সে জেগে উঠবে না—সে থাকবে সুদূর, তার নিঃসঙ্গতার খোলশে স্পর্শাতীত। আর-কিছু বলবার নেই, কিংবা করবার। রঞ্জন উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আচ্ছা আমি তাহ'লে—'

অতসী তীক্ষ্ণ ভঙ্গিতে মুখ ফেরালো।—'যাচ্ছো নাকি?'

'ভাবছিলুম—'

'শোনো। তোমার সব দিকেই দৃষ্টি আছে, দেখছি। আমার পরম ভালো না-ক'রে ছাড়বে না কিছুতেই।'

'অতসী, আমি কি তোমার কোনো কাজে লাগতেও পারি না?'

'নিশ্চয়ই পারো! আমাদের যে-উপকার তুমি করেছো—'

'মুহূর্তের জন্যও কি ওটা ভুলতে পারো না?'

'ভুলতে! তুমিই তো আছো সব সময় মনে করিয়ে দিতে।'

'আমি!' রঞ্জনের ঠোঁটে ক্ষীণ, সূক্ষ্ম একটু হাসি ফুটে উঠলো। 'ভেবে নাও না যে আমি নেই! তুমি আমাকে ভুলে যাও না!'

'তুমি কি তার সুযোগ দিচ্ছো?'

'বেশ, আর আসবো না।'

'কোনোদিন না?'

'তুমি বললে আসবো।'

'আমি বললেই আসবে? কেন, আমার কথার এত মূল্য কিসের?'

'মূল্য আছে তা তুমি জানো, আর জানো ব'লেই—'

'থামলে কেন? সাহস থাকে তো বলো।'

'সাহস আছে, বলতেও পারি অনেক কথা। কিন্তু বলবার কি দরকার আছে?'

দু-জনেই কথা বলছিলো যেন কোনো সম্মোহনের গাঢ় নেশার ভিতর থেকে—কী বলছে নিজেরাই ঠিক না-বুঝে। যে-সব কথা তারা কখনো ভাবেনি বলবে, তা উদ্বেল হ'য়ে উঠছিলো রক্তের স্রোতে, আঘাত করছিলো এসে ঠোঁটের তটরেখায়। উন্মেষের মুহূর্ত এসেছে, উন্মীলনের। কিছুই আর চাপা থাকবে না: সংঘাতে, ব্যথায় শতচ্ছিন্ন হ'য়ে যাবে স্নায়ুতন্ত্রী। রঞ্জনের বুক কেঁপে উঠলো, আতঙ্কে। তবু সেই আতঙ্কেই জয়ের স্বাদ, গোপন আনন্দের চেতনা। আর দেরি নেই। এক অদ্ভুত, উন্মাদ আনন্দে তার বুক ভ'রে গেলো—আবিষ্কারের তীব্র প্রতীক্ষায় তার মাথার দু'-পাশে রক্ত বাজতে লাগলো ঢিপঢিপ ক'রে।

যেন স্বপ্নের ভিতর থেকে অতসী আস্তে-আস্তে বললে, 'আর না, এখানেই শেষ। এখনো সময় আছে। এখনো তুমি আমাকে শাস্তি দাও।'

'কিন্তু শান্তি কি তুমি আর পাবে? তুমি জানো না তোমার জীবন আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে?'

'এ-কথা বলবার জন্যেই এতদিন অপেক্ষা করছিলে তুমি?'

'অতসী, নিজেকে আর আঘাত দেবে কত?'

'তোমার কী? তোমার তাতে কী এসে যায়? আমি যা-ই করি, আমি যা-ই হই—তোমার তাতে কী এসে যায়?'

'একবার যদি নিজেকে দেখতে পেতে আমার চোখে!'

'তা পারি না? তা পারি ব'লেই তো—' অতসীর নিশ্বাস হঠাৎ

মাঝপথে থেমে গেলো। একটু চুপ ক'রে থেকে সে বললে, 'অনেক সময় তোমার—একটা-কিছু তোমার চাই, যা নিয়ে খেলা ক'রে অবসর কাটাতে পারো। এই তো?'

'তুমি যা ছিলে, এখন তো আর তুমি তা নেই। তুমি আলাদা, তুমি অন্য কিছু—'

'সেই তোতা-বুলি, তোতা-বুলি! চাঁদ-তারার গল্প!'

'গল্প বুঝি? কিন্তু আমি যে দেখতে পাচ্ছি তোমার চোখে জ্বলছে চাঁদ—'

রঞ্জনের কথা শেষ হ'লো না, অতসী একটা ভারি, শক্ত বই তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারলো তার দিকে। রঞ্জন তাড়াতাড়ি সরে গেলো, বইটা সশব্দে গিয়ে লাগলো পিছনের দেয়ালে। কিন্তু যাবার পথে রঞ্জনের কানের কাছটা ছুঁয়ে গেলো একটুখানি; তার চশমাটা প'ড়ে গেলো মেঝেতে। আর সেই সঙ্গে একটা চাপা আওয়াজ বেরোলো আতসীর গলা দিয়ে।

'কিছু হয়নি', ব'লে রঞ্জন কুড়িয়ে নিলে তার চশমা।

'ভাঙলো?' কথাটা অতসী হঠাৎ এমন চেঁচিয়ে ব'লে উঠলো যে রান্নাঘর থেকে হিরণ্ময়ী তা শুনতে পেলেন। 'কী ভাঙলো রে, অতসী?' সেখান থেকেই তিনি ব'লে উঠলেন।

অতসী জবাব দিলো না। পাংশু তার মুখ, ঠোঁট কাঁপছে, নিশ্বাস পড়ছে যেন সমস্ত অন্তর মথিত ক'রে।

রঞ্জন ভাঙা চশমাটা রেখে দিলে পকেটে। বইটাও তুলে রাখলো। তারপর স'রে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়ালো শান্তভাবে, রুমালে মুখ মুছে।

হিরণ্ময়ী মাছের ঝোলটা নামিয়ে রেখে ভাবলেন যে রঞ্জনকে খেতে বললেই হ'তো। কী আর—একদিন না-হয় সাধারণভাবেই একটু খেয়ে যেতো। ঘটা ক'রে নেমন্তন্ন করা কি আর তাঁকে মানায়!

ও-ঘরে গিয়ে তিনি বললেন, 'কী ভাঙলো?'

রঞ্জন বললে, 'কিছু না। আমার চশমাটা প'ড়ে গিয়েছিলো হাত থেকে।'

'চশমা ভেঙেছে?'

'হঠাৎ কী-রকম হোঁচট খেলুম', বোকার মতো অনর্থক জবাবদিহি দিলে রঞ্জন। খালি চোখে সে ভালো ক'রে তাকাতে পারছিলো না; মাথার মধ্যে টিপটিপ করছিলো। 'আচ্ছা, চলি আজ।'

অতসী, একটু দূরে দাঁড়িয়ে, দ্রুত দৃষ্টিতে একবার তাকালো তার দিকে। চশমা ছাড়া রঞ্জনের চোখ বড়ো-বড়ো লালচে দেখাচ্ছে, দৃষ্টিহীন। শিরা ফুলে উঠেছে চোখের পাশে, কপালের নীচে। চোখের উপর যেন চোখের পাতা নেমে আসতে চাইছে আলোর পীড়নে। রঞ্জনকে একেবারে অন্য রকম দেখাচ্ছিলো—তা'র সেই ঘোলাটে চোখের বোবা দৃষ্টি নিয়ে—তাকে যেন ঠিক চেনা যাচ্ছে না। তার মধ্যে কোথায় যেন একটা করুণ শিশু-ভাব—এত নিষ্ফল সে, এমন অসহায় ঐ চশমাটি ছাড়া। এখন এত সহজ আরো, আরো আঘাতে তাকে চূর্ণ ক'রে দেয়া। যদি অতসী পারতো, যদি পারতো—তার চোখের সমস্ত আলো নিবিয়ে দিতে, দু-হাতের মধ্যে শিখার মতো তাকে নিঃশেষ ক'রে দিতে—যাতে আর কখনো তাকে দেখতে না হয়, কখনো, কখনো না!

'আমি যাই,' আবার বললে রঞ্জন।

হিরণ্ময়ী বললেন, 'একটু বোসো—এই তো এলে।' রঞ্জনকে খেয়ে যেতে বলবেন কিনা, তিনি ঠিক ক'রে উঠতে পারছিলেন না। একবার তাকালেন মেয়ের দিকে কিন্তু তার সঙ্গে চোখোচোখি হ'লো না। এমনভাবে সে দাঁড়িয়ে আছে যেন সে সেখানে নেই।

'নাঃ—রোদ বাড়ছে, চ'লেই যাই।'

ইতস্তত করতে-করতে হিরণ্ময়ীর বলাই হ'লো না কথাটা। রঞ্জন চ'লে গেলো।

তখন তিনি বললেন, 'বললেই হ'তো ওকে খেতে।'

এতক্ষণে, এতক্ষণে অতসীর মুক্তি। যে-প্রচণ্ড শক্তি তাকে আঁকড়ে ধ'রে ছিলো, তা শিথিল করেছে তার মুঠি। অতসীর সমস্ত শরীর বিবশ, মুহ্যমান: তার হাঁটুর গাঁট যেন জল হ'য়ে গেছে। ধুপ ক'রে সে ব'সে পড়লো, যেখানে তক্তাপোশের উপর বইগুলো ছড়ানো।

'এত বই কিসের?' হঠাৎ লক্ষ্য করলেন হিরণ্ময়ী।

'দিয়ে গেছে,' অস্ফুট, ক্ষীণস্বরে অতসী বললে।

'কে, রঞ্জন?'

অতসী মাথা নাড়লো।

হিরণ্ময়ী বইগুলোর দিকে একটু তাকিয়ে বললেন, 'এত?'

'পাঠ্য বই সব—পরীক্ষা পাশের।'

'সমস্ত বই দিয়ে গেছে?'

'সমস্ত।' অতসীর আর কথা বলতে ইচ্ছে করছিলো না; এক বিশাল, অনির্বচনীয় ক্লান্তিতে তার শরীর ভেঙে আসছিলো। বাহুর উপর মাথা রেখে নিজেকে সে এলিয়ে দিলে।

সকাল ও সন্ধ্যা

'এ কী ? শুয়ে পড়লি এই অসময়ে ?'

অতসী চুপ।

'রান্না তো সব তৈরি—স্নান করতে যা।'

'যাচ্ছি, মা।'

দু-হাত দিয়ে একটা অন্ধকার গহ্বর রচনা ক'রে অতসী তার মধ্যে মুখ গুঁজলো। ঘুম, ঘুম, ঘুম; ঘুমের নেশা তার সমস্ত রক্তে। সেই অগাধ অন্ধকার, বিস্মৃতির কালো সমুদ্র, অন্ধকারে প্রাণের পুনরুজ্জীবন। সেই শান্তির সম্পূর্ণতা। অতসীর শরীর যেন আর নেই: অসীম অন্ধকারে সে শুধু একটা হৃৎস্পন্দন। শুধু যদি সে একটু ঘুমোতে পারতো, মিলিয়ে যেতে পারতো তার বাহু-গহ্বরের এই অন্ধকারে—সময়ের অতীত, জীবনের অতীত এই শূন্যে যদি পারতো লীন হয়ে যেতে। সময়ের শেষ নেই; সমস্ত জীবন প'ড়ে আছে বাঁচবার, বহন করবার—তা তো আছেই: এই একটুখানি সময় তার হোক না, বিস্মৃতিতে সম্পূর্ণ, শান্তিতে শুদ্ধ।

কিন্তু তাও হবার উপায় নেই; তাকে উঠতে হ'লো, যেতে হ'লো স্নান করতে। মাথায় এক ঘটি জল ঢেলে সে ভাবলে, 'ও চ'লে গেছে, ও আর আসবে না।' শান্তির স্পর্শের মতো জল বেয়ে পড়তে লাগলো তার গা দিয়ে। 'বাঁচা গেলো।' একটু সময়, সে জল ঢাললে অবিচ্ছিন্ন, যতক্ষণ না জলে তার দৃষ্টি অন্ধ হ'য়ে গেলো, শ্বাস এলো রুদ্ধ হ'য়ে। কয়েক গোছা চুল লেপটে গেলো তার মুখের উপর, সেগুলো সরিয়ে দেবার কথাও তার মনে হ'লো না। 'বাঁচলাম, বাঁচলাম।' জল—তার শরীরের উপর বিস্মৃতির প্রবাহের মতো, দু-চোখে জড়িয়ে-ধরা

নরম ঘুমের মতো, মৃত্যুর মধুরতার মতো। টিনের বেড়া-দেয়া সেই খুপরির মধ্যে সে চৌবাচ্চা প্রায় খালি ক'রে ফেললে। ছলছল, ঝপঝপ —জল ঝ'রে-ঝ'রে পড়লো তার শরীরে, স্বচ্ছ স্রোতে; মুক্তো ছিটিয়ে দিয়ে আশে-পাশে, ছোটোছোটো ধারায় পথ ক'রে নিয়ে তার শরীরের আনাচে-কানাচে, তাকে আচ্ছন্ন ক'রে। জল ঢেলে-ঢেলে নিজেকে সে যেন শেষ ক'রে দিতে চায়। তবু তার ভিতর থেকে, সেই জলধারার স্বরে-স্বরে ঠেলে উঠতে লাগলো এক দুর্নিবার স্রোত: 'তাকে আর দেখবো না। বাঁচলাম।'

খাবার সময় হিরণ্ময়ী বললেন, 'তোর হ'লো কী, অতসী, কিছুই খাচ্ছিস না।'

'কত আর খাবো, মা।'

'আগেই যত লাফালাফি, এখন তো দেখছি সবই প'ড়ে রইলো। মাছ নে আর-একখানা!'

'দাও।' মাছ নিয়ে অতসী একটু-একটু ক'রে খেতে লাগলো, নিঃশব্দে। এক রকম জোর ক'রে, শুধু মুখরক্ষার জন্য। খাওয়ার এতটুকু তাগিদ সে অনুভব করছিলো না। তার শরীরের আর যেন কোনো প্রয়োজন নেই: নিজের ইন্ধন তা নিজেই।

'অতসীকে দেখে তুমি যেন আবার লজ্জা কোরো না, সরোজ; তুমি ভালো ক'রে খাও।'

'আমি তো খাচ্ছিই।' নিয়মিত, অভ্যস্ত মন্থরতায় সরোজ তার জঠরে খাদ্য প্রেরণ করছিলো। কিন্তু সে আশা করেছিলো অন্য-কিছু। সকালবেলায় অতসীর লঘু কণ্ঠস্বর গানের মতো এসে লেগেছিলো

তার মনে; সে উৎসুক হ'য়ে উঠেছিলো প্রতীক্ষায়। দিনের একটা মুখোশ যেন খ'সে পড়েছিলো, সব জেগে উঠেছিলো একটা নতুন অর্থ নিয়ে। আর অতসীর এই নিমন্ত্রণ—তাতে সে অনুভব করেছিলো বন-ভোজনের মুক্ত উল্লাস: খাওয়াটা আসল ব্যাপার নয়, খাওয়াকে উপলক্ষ্য ক'রে উচ্ছল হ'য়ে উঠছে আনন্দ। যদি, সে ভেবেছিলো, যদি আমাদের জীবনের প্রত্যেক বারের খাওয়ায় এই আনন্দ থাকতো, তাহ'লে জীবন কত বেশি বাঁচবার যোগ্য হ'তো! তাহ'লে খাওয়া শুধু একটা আবশ্যিক শারীরিক প্রক্রিয়া হ'তো না, হ'য়ে উঠতো ধর্মের আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান। শুধু যদি সমস্ত জীবনে আমরা বনভোজন ভাবটা আনতে পারতাম! তাহ'লে ভালো-মন্দ সুখ-দুঃখ নিয়ে ভেবে-ভেবে এত কপাল কুটে মরবার কিছুই দরকার হ'তো না; সবই সহজ হ'তো।

তা হয় না; কিন্তু হঠাৎ এক-এক সময় দিন আসে, যখন ঘোমটা ছিঁড়ে যায়, মর্মে মর্মে আমরা রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠি। সেই বিরল এক দিন। ছোটো-ছোটো কথায় আর হাসির টুকরোয়, প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষণিক সুখের ভিতর দিয়ে সম্পূর্ণ হ'য়ে উঠবে এই সোনালি দিন। সরোজ তা-ই ভেবেছিলো।

কিন্তু খেতে ব'সে সে দেখলে, সব বদলে গেছে। অতসীর সঙ্গে তার আর কোনো সংস্পর্শ নেই। সে যে আছে, অতসী যেন তা জানেই না। আয়োজন সবই আছে, কিন্তু প্রাণ গেছে নিবে। দিনের মুখ যেন কম্বলে চাপা। মৃত স্তূপ, সব আয়োজন; কেবলই ক্ষুন্নিবৃত্তি এই খাওয়া। হঠাৎ কী হ'লো?

একটু পরে অতসী জলের গেলাশে চুমুক দিয়ে বাকিটা জল পাতে

ঢেলে ফেললে। 'এ কী! হ'য়ে গেলো খাওয়া!' হিরণ্ময়ী ব'লে উঠলেন।

'হ'লো।' পাতে এঁটো তুলতে-তুলতে অতসী বললে।

'তোর শরীর ভালো নেই, না, কী?'

সরোজ চোখ তুলে তাকালে অতসীর দিকে; অতসীর চোখ কিছুই বললে না। সরোজের আস্তে খাওয়া অভ্যেস; তার তখনো দেরি ছিলো। 'তুমি ওঠো না, হ'য়ে গিয়ে থাকলে। ব'সে আছো কেন?'

আর অতসীর বুকের মধ্যে হঠাৎ একটা ধাক্কা লাগলো, সরোজের কথা শুনে। কী অধিকার তার ছিলো, তাকে অমন ক'রে বিপর্যস্ত করবার, ব্যর্থ করবার? তাকে ডেকে এনেছে সে-ই তো। তার বেসুরো মনের আঘাত কেন সে দিতে যাবে সরোজকে? কিন্তু তার দিনও যে নষ্ট হ'য়ে গেছে, এমন সুন্দর দিন, লুপ্ত হ'য়ে গেছে, হারিয়ে গেছে চিরকালের মতো। অনন্ত কাল বাঁচলেও এই দিনটিকে সে ফিরে পাবে না। আর এই দিনের মধ্যে কী ঐশ্বর্যই না থাকতে পারতো, কী স্বপ্নের মর্মর, কোন সূর্য-গৌরব! এখন আর কোনো গৌরব নেই। গৌরব বিদায় নিয়েছে, গৌরব বিদায় নিয়েছে। এখন কোনো কথা বলতে গেলেই মিথ্যে শোনাবে। কাজ নেই। চুপ ক'রে থাকাই ভালো তার চেয়ে। 'আচ্ছা, উঠি তা হ'লে।' অতসী উঠে দাঁড়ালো, ভাতের থালাটা হাতে ক'রে।

খাওয়া শেষ ক'রে এসে সরোজ দেখলে, অতসী শুয়ে পড়েছে পাটি পেতে। সে উপরে চ'লে গেলো নিজের ঘরে, শুয়ে-শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করলো। অনেকক্ষণ চেষ্টা ক'রেও ঘুম এলো না। তখন সে উঠলো,

একটা জামা দিলো গায়ে। তারপর বেরিয়ে পড়লো রোদ্দুরে তার এক বন্ধুর বাড়ির দিকে। রবিবার ছুপুরে সেখানে তাসের আড্ডা বসে।

আর স্তব্ধ, স্তব্ধ হ'য়ে অতসী শুয়ে রইলো, চোখ বুজে। পড়বার চেষ্টা করলে না, চেষ্টা করলে কিছু না-ভাবতে। নিজের উপর সে ডেকে আনলে অন্ধকারের বন্যা, বিস্মৃতি-ফেনিল। তার বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে অন্ধকারের চিরন্তন আত্মা স্পন্দিত হচ্ছে। তবু সেই অন্ধকারের ফাঁকে ফাঁকে চমক দিয়ে উঠছে কী স্বপ্ন, ভাবনার কোন বিদ্যুৎরেখা! 'তাকে আমি আর দেখবো না, আর দেখবো না—বাঁচলাম। শেষ ক'রে দিয়েছি; আমি তাকে উপড়ে ফেলেছি। বাঁচা গেলো।' 'বাঁচা গেলো, বাঁচা গেলো,' বার-বার সে বললে নিজের মনে। নিঃশব্দে উচ্চারণ ক'রে বললে, যেন নিজেকে বিশ্বাস করবার জন্য; যেন, উচ্চারণ না-করলে কথাটার অর্থ সে উপলব্ধি করতে পারছে না। না—সন্দেহ নেই, কোনো সন্দেহ নেই, সে বেঁচেছে। বিষময় রক্তফল—দু-হাতের মধ্যে নিয়ে সে তা চূর্ণ ক'রে দিয়েছে। কিন্তু সেই ফলের রক্তচ্ছটা—এই অন্ধকারের স্রোতেও তা ঢেউ তুলে দিচ্ছে যে। তার রক্তেও কি তা জ্বলছে না, কোনো নিহিত আগুনের মতো? এখনো কি সে শেষ ক'রে দিতে পারলে না তাকে, নিবিয়ে দিতে পারলে না চিরকালের মতো? কিন্তু—তা এত সুন্দর, এত সুন্দর: এত সুন্দর তা হয়েছিলো—সে কি শুধু এরই জন্যে, হাতের মুঠির চাপে চূর্ণ হ'য়ে যাবে ব'লে? কেন তা ফ'লে উঠলো না এই উজ্জ্বল দিনে, লাল-সোনালি; কেন তার ছায়া এই দিনের উপর নামলো কুয়াশার মতো—যাতে উঠছে সব বিকৃত হ'য়ে।

হে বিজয়ী বীর

মুহূর্তগুলো খ'সে-খ'সে পড়তে লাগলো, কোনো গভীর কূপের অন্ধকারে ছোটো-ছোটো পাথরের মতো। তারপর ঘুম নামলো অতসীর চোখে গাঢ় হ'য়ে, ঘুমের মধুরতায় তার আত্মা আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়লো; বিস্মৃতির ফেন-মদিরতায় সে মূর্ছিত। মৃত্যুর মতো স্তব্ধ সে-ঘুম।

মৃত্যুর মতো। নিশ্চিহ্ন বিলুপ্তি; অবিচ্ছিন্ন নীরন্ধ্র অন্ধকার। অস্ফুটতম স্বপ্ন-মর্মর সে-স্তব্ধতাকে মুহূর্তের জন্য ভেঙে দিলে না। শান্তি: সৃষ্টির আগেকার বিশ্বের অনির্বচনীয় শান্তি।

সময় আর নেই। সমস্ত সময়ের শেষ—সমস্ত বাসনার, বাসনার সব সংঘাতের, সব আশার, জল্পনার, ক্লান্তির। শুধু এই অন্ধকারের বন্যা। শুধু শান্তি।

তবু এলো স্বপ্ন, অনিবার্য। অন্ধকারের ঠাশবুনোন কোথায় যেন একটু ফাঁক হ'য়ে গেলো; রূপহীন শূন্যপুঞ্জ আলোড়িত হ'য়ে উঠলো কোন গোপন প্রেরণায়। আলো এসে পড়ছে কোথা থেকে, দোলা দিয়ে যাচ্ছে কোন দক্ষিণ সমুদ্রের হাওয়া। অস্ফুট মর্মর, অলক্ষ্য চঞ্চলতা। বিশাল অন্ধকার আবর্তে মথিত হ'য়ে গ'ড়ে তুলছে এই স্বপ্ন: চেতনার মুখ থেকে ঘন ধোঁয়ার আবরণ সরিয়ে নিলে কে—সেই ধোঁয়া পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে উঠছে প্রত্যক্ষ হ'য়ে, নির্দিষ্ট একটা রূপ নিয়ে। সে কি বেরিয়ে এলো অতসীরই মগ্নমনের আলোহীন গুহা থেকে, তারই রক্তের ফেনা থেকে কি উঠে এলো, এই বাসনার মূর্তি? পৃথিবী স্তব্ধ, রুদ্ধশ্বাস; সৃষ্টি যেন থেমে আছে। রাত্রি নয়, দিন নয়, স্বপ্নের ছায়া-মধুর গোধূলি, চিরন্তন। অতসী যেন চোখ মেলে দেখলে তার পায়ের কাছে রঞ্জন ব'সে আছে, তার মুখের দিকে তাকিয়ে। ভালো

ক'রে তা'র মুখ দেখা যাচ্ছে না : কিন্তু সে যেন নতুন হ'য়ে এসেছে—সেও যেন এই স্বপ্ন-গোধূলিরই মতো শান্ত, শুব্ধ ; তার মধ্যেও যেন সময়হীনতার চিরন্তনতা। অতসী মূঢ়ের মতো তাকিয়ে রইলো।

রঞ্জন ডাকলো, 'অতসী, ওঠো !'

কিন্তু অতসী শুধু তার ঘুমভাঙা চোখের বিহ্বল দৃষ্টি মেলে দিলে ; কিছু বললে না। সে বুঝতে পারছিলো না। তার মন তখনো অস্পষ্ট ; বিস্মৃতির নেশায় বিজড়িত।

রঞ্জন আবার ডাকলো, 'ওঠো।'

আর হঠাৎ, রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে অতসীর মনে পড়লো। সঙ্গে-সঙ্গে, তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো লজ্জার এক বিশাল ঢেউ। আবার বুজে এলো তার চোখ।

সে উঠলো খানিক পরে। বেলা আর নেই। ঘরের ভিতর প্রায় অন্ধকার ; জানলার বাইরে একটা কাঁঠাল গাছের পাতায় ঘোলাটে রোদ।

'মা কোথায় ?' অতসীর গলা ব'সে গেছে, এত সে ঘুমিয়েছে।

রঞ্জন বললে, 'জানি না তো।'

'কখন এলে ?'

'অনেকক্ষণ। কী ক'রে এত ঘুমোতে পারো বলো তো ?'

অতসী ক্ষীণ হাসলো। এখনো ঘুমের মোহ তার শরীরে। নতুন ক'রে জন্ম নেবার মত—এই রকম দীর্ঘ, গাঢ় ঘুম থেকে জেগে ওঠা। ঘুমের সমুদ্র থেকে সে উঠে এলো এইমাত্র—আফ্রোদিতের মতো সদ্যোজাত। এখন আর তার কোনো অতীত নেই। এখন—নতুন ক'রে সব আরম্ভ

করবার। সে যতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলো, ম'রে ছিলো, অলক্ষিতে নতুন প্রাণ-সঞ্চার হয়েছে তার রক্তে। সে এখন নতুন।

'তুমি বোসো, আমি একটু স্নান ক'রে আসি।'

সাবানের গন্ধ তাকে ফিরিয়ে আনলো পৃথিবীতে, তার অভ্যস্ত জীবনে। না—সে-জীবন আর নেই; সব বদলে গেছে।

যত্ন ক'রে সে গা ধুলে। তারপর ও-বেলার ছাড়া শাড়ি প'রে ঘরে ফিরে এসে বাক্স থেকে বের করলে খয়েরি বুটি-তোলা ঢাকাই শাড়ি, হলদে পপলিনের ব্লাউজ। ঈষৎ চোখ তুলে বললে, 'তুমি একটু বাইরে যাও তো।'

রঞ্জন বারান্দায় গিয়ে অপেক্ষা করলে। কয়েক মিনিট পরে—আশ্চর্যরকম অল্প সময়ে, রঞ্জনের মনে হ'লো—অতসী বেরিয়ে এলো কাপড়চোপড় প'রে। তার কাছে এসে মাথা ফিরিয়ে বললে, 'ছাখো তো চুলটা ঠিক আছে কিনা; এত কম আলোয় দেখতে পারিনি ভালো ক'রে।'

'ঠিক আছে।'

'শাড়িটা কেমন?'

'খুব সুন্দর!'

'খয়েরি বুঝি তোমার পছন্দ? একটু ছেলেমানষি—না? তা যা-ই বলো, এই সিঁদুরে পাড়টা চমৎকার।'

'চমৎকার,' প্রতিধ্বনি করলে রঞ্জন।

'লাল হ'লে অত ভালো হ'তো না—তা-ই না? শাড়িটা আমি এত ভালোবাসি যে এটা পরতেই কষ্ট হয়। দাঁড়াও একটু; মা বোধহয় উপরে আছেন, তাঁকে ব'লে আসি।'

সকাল ও সন্ধ্যা

উপরে হিরণ্ময়ী সরোজের বৌদিকে বেলের মোরব্বা তৈরি করবার গূঢ় রহস্যে দীক্ষা দিচ্ছিলেন, অতসীকে দেখে ব'লে উঠলেন, 'বাবাঃ, তোকে আজকে ভূতে পেয়েছিলো নাকি—সারাটা দিন প'ড়ে-প'ড়ে ঘুমোলি!' তারপর তার সাজগোজ লক্ষ্য ক'রে: 'বেরুচ্ছিস?'

'একটু ঘুরে আসি, মা, বাইরে থেকে। মাথাটা কেমন ভার হ'য়ে আছে।'

'হবে না! কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমোলে—! কদ্দূর যাবি?'

'এই তো রমনায়। রঞ্জন যাবে সঙ্গে।'

'রঞ্জন এসেছে আবার?'

'আমি ঘুম থেকে উঠে দেখি, ও ব'সে আছে। তুমি কোথায় যে থাকো!'

'বাঃ, ডাকলি না কেন আমাকে? চল, তোদের চা ক'রে দিই।'

অতসী বাধা দিয়ে বললে, 'না, মা, চা খেতে গেলে আবার দেরি হ'য়ে যাবে। থাক এখন।'

'তুইও তো কিছু খেলি না এ-বেলা।'

'ফিরে এসে খাবো যা-হয়। চলি এখন।'

'রঞ্জনকেও নিয়ে আসিস সঙ্গে। আমি খাবার করে' রাখবো।'

'আচ্ছা।'

অতসী যখন সিঁড়ি দিয়ে নামছে, হিরণ্ময়ী তার পিছনে চেঁচিয়ে বললেন, 'দরজার শিকলটা টেনে দিয়ে যাস কিন্তু।'

নিচে এসে অতসী বললে, 'চলো।'

হে বিজয়ী বীর

'কোনদিকে যাবে ?'

'চলোই না।'

রাস্তায় বেরুলো দু-জনে। হাঁটলো পাশাপাশি, নিঃশব্দে, কেউ কারো দিকে না-তাকিয়ে। এসে পড়লো রমনার প্রান্তে, ফাঁকা মাঠে। সূর্য অস্ত গেছে, কিন্তু এখনো আগুনের স্রোত পশ্চিমের মেঘে-মেঘে। দিনের মধ্যে দু-এক পশলা বৃষ্টি হয়তো হ'য়ে থাকবে, ঘাস ভেজা, ঝিরঝিরে, ঠাণ্ডা হাওয়া। বৃষ্টিতে ধোওয়া বায়ুমণ্ডলে আশ্চর্য স্বচ্ছতা। সেই সূর্যাস্ত-আভার নিচে, ঘাসে আর পল্লবে আর গাছের মাথায়-মাথায় জ্ব'লে-ওঠা সবুজ আগুনের স্রোতে সমস্ত পৃথিবী যেন হঠাৎ কোনো রক্তিম ফলের মতো পেকে উঠলো —তাদের চোখে। স্তব্ধ, দু'জনে হেঁটে চলেছে নিরুদ্দেশ, পাকা-রাস্তা ছেড়ে ঘাসের উপর দিয়ে সূর্যাস্তে পরিপ্লুত, স্তব্ধতার সম্পূর্ণ বাণী-বিনিময়ে মগ্ন। আকাশে আলো মিলিয়ে এলো, ঘাসের বুকে নামলো ছায়া, ম্লান-নীল আকাশে দু-একটি তারা চিকচিক ক'রে উঠলো।

অতসী খুব নিচু গলায় বলে উঠলো, 'কী সুন্দর !'

'কী ?'

'কী নয় ? সব, সব। কে জানতো এত সুন্দর এই পৃথিবী।'

রঞ্জন চুপ। অতসী আবার বললে, 'মনে হচ্ছে, আজই যেন প্রথম দেখলুম—এই মাঠ আর এই আকাশ। কতদিন তো গিয়েছি এ-পথ দিয়ে সন্ধেবেলা, কিন্তু কখনো তো চোখে পড়েনি—'

'অতসী, এ-রং তোমারই চোখের।'

'আমারই!' অতসীর গলায় ঢেউ লাগলো, 'আমারই! যাদু করেছে আমাকে কেউ। জানো, আজ সমস্ত দুপুর আমি এমন ঘুমিয়েছি যেন ম'রে ছিলুম—'

'তারপর?'

'তারপর জেগে উঠে নিজেকে আর চিনতে পারি না।'

অতসীর কথা শুনতে-শুনতে রঞ্জনের বুকের ভিতরটা ঢিপঢিপ করছিলো। মৃদু স্বরে বললে, 'আমিও হয়তো চিনতে পারতুম না, যদি না—'

অতসী প্রশ্নময় চোখ তুলে রঞ্জনের দিকে তাকালো।

'যদি না,' যেন তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে কথাগুলো উচ্চারণ করলে, 'যদি না আমি রোজালিণ্ডের নাম শুনতুম, ছদ্মবেশে সে ঘুরে বেড়ায়।'

অতসী মুখ ফিরিয়ে নিয়ে একটু চুপ ক'রে রইলো। তারপর আস্তে-আস্তে বললে, 'একটা কথা আমি আজ জানলুম: মাঝে-মাঝে না-মরলে বাঁচা কাকে ব'লে বোঝা যায় না। যে কখনো মৃত্যু-কামনা করেনি, জীবনের সে কী জানে?'

রঞ্জনের কানে কথাগুলো অদ্ভুত শোনালো, প্রায় ভীতিকর। সে যেন অনুভব করলে, অতসী যে-অভিজ্ঞতার কথা বলছে, তা তার পরিধির বাইরে। সে শুধু অন্ধকারে হাৎড়াচ্ছে, শুধু তার মস্তিষ্কে পৌঁচচ্ছে কথাটা —কিন্তু মস্তিষ্ক দিয়ে আমরা কী বা জানতে পারি। না, সে জানে না, সে জানে না। অতসীর মধ্যে যে-রহস্য, তা এখনো তার অতীত।

রঞ্জনের মনে তা একটা ভয়ের মতো, সেই নিগূঢ় বিস্ময়। এতদিন সে চ'লে এলো দৃঢ় দুঃসাহসে ; আর আজ, পথ যখন ফুরিয়ে এলো, আজ কেন তার ভয় করছে ?

রঞ্জন যে চুপ ক'রে আছে, অতসী যেন তা লক্ষ্যই করলে না। আপন মনে বলতে লাগলো, 'যারা সব সময় ভালো-লাগার কাঙালপনা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, তারাই তো নষ্ট করে জীবনকে—তাদের ভালো-লাগাকেও সেই সঙ্গে। এমন জীবন তুমি পেতেই পারো না, যা সব সময় উড়ে চলেছে উপভোগের পাখায়। বাঁচতে হ'লে, মাঝে-মাঝে তোমাকে মরতেই হবে। হবেই। তাছাড়া উপায় নেই। এক-এক সময়, জীবনের ক্লান্তি যখন অসহ্য হ'য়ে ওঠে, মৃত্যু দিয়ে তাকে নতুন ক'রে না-তুলতে পারলে তোমার চলবে না।'

'অতসী, কী বলছো তুমি ?'

'বুঝতে পারছো না,' কেমন অদ্ভুত, উদ্দীপ্ত স্বরে অতসী ব'লে উঠলো, 'বুঝতে পারছো না—মৃত্যুতে কী রহস্য! কবিরা যখন মৃত্যুকে মধুর বলেন, যখন তাকে ডেকে আনতে চান মন্ত্রের উচ্চারণে, ঘুমের মতো। এতদিন আমি ভাবতুম, ও-সব বাজে কথা, কবিদের কথা নিয়ে খেলা। কিন্তু তাদের কথাই ঠিক : মৃত্যু তো ঘুমেরই মতো, মৃত্যু অন্ধকার। সেই অন্ধকারের আড়ালে—আস্তে-আস্তে, তোমার অজান্তে, আগুন ধ'রে যায় তোমার শরীরে, নতুন প্রাণের আগুন। জেগে উঠে তুমি অবাক হ'য়ে যাও।'

'তোমার কথা ভালো বুঝতে পারছি না, অতসী।' আর সত্যি, অতসী এমন ভাবে কথা বলছিলো যেন তাকে ভূতে পেয়েছে, যেন কোনো

সম্মোহন কাজ করছে তার মধ্যে, যেন সে নিজেই জানে না, সে কী বলছে।

কিন্তু তারপর অনেকক্ষণ, অতসী আর-কিছু বললে না। আলো জ্ব'লে উঠলো রমনার পথে-পথে। বেশি লোক নেই রাস্তায়: শুধু মাঝে-মাঝে হয়তো দু-চারজন ইউনিভার্সিটির ছাত্র তাদের পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে চেঁচিয়ে কথা বলতে-বলতে। একটা মোড়ে এসে তারা যে-রাস্তা নিলে, সেটা আরো বেশি নির্জন, তা যে কোথায় গেছে, তার যেন দিশে নেই, তা যেন নিজেকে মেলে দিয়েছে পৃথিবীর শেষ দিগন্তরেখায়।

'তোমার ক্লান্ত লাগছে না তো?' জিগেস করলে রঞ্জন।

'না—আমি হাঁটতে পারি খুব। যত বলো।'

আবার চুপচাপ। অতসীর চলার ছন্দের তালে-তালে শাড়ির খশখশানি। রাস্তার একটা আলোর কাছে দিয়ে যখন যাচ্ছে, অতসী রঞ্জনের দিকে চোখ ফিরিয়ে বললে, 'তুমি যে একেবারে চুপ?'

'বেশ লাগছে চুপ ক'রে থাকতে।'

'কিছু বলো!'

'কী বলবো বলো তো?'

'যা তোমার খুশি। একটু শুনতে দাও তোমার গলার আওয়াজ।'

'অতসী, এ যে কষ্টের মতো!'

'কিন্তু এ তো তোমাকে সইতেই হবে। তুমিই তো ডেকে আনলে একে।'

হে বিজয়ী বীর

'আমি কখনো ভাবিনি—' রঞ্জন যেন আপন মনে বলতে আরম্ভ করলো, কিন্তু থেমে গেলো হঠাৎ।

'কী ভাবোনি?'

'যে এর মধ্যে এত আছে। যদি বিছানায় শুয়ে অন্ধকারে তাকিয়ে মনে-মনে ভাবাই সব হ'তো—'

অতসী চাপা গলায় হেসে উঠলো। রঞ্জন আবার বললে, 'এ আমি ঠিক বুঝতে পারি না। কেন এই আকর্ষণ—আর কেন এই কষ্ট।'

'বুঝতে চেয়ো না—বোঝবার জিনিশ এ তো নয়। আগে যা-কিছু ভেবেছো, তার সঙ্গে মেলাতে যেয়ো না। এই মুহূর্তকে নাও, এই কষ্টকে নাও। তা তোমার।'

'আমি ভাবছিলুম, কী ক'রে এ-রকম হয়—'

'কিছু ভেবো না, ভেবে কূল পাবে না—মাঝখান থেকে কেন একে নষ্ট করতে যাবে। মুক্তোর মত এই মুহূর্ত—তাকে কেন ভেঙে দিতে যাবে? এতদিন যা-কিছু তুমি ভেবেছো আর করেছো, সব ডুবে যাক। শুধু তুমি থাকো। শুধু তুমি হও।'

'অতসী, তুমি তখন মৃত্যুর কথা বলছিলে। এও তো মৃত্যুর মতো; এও তো চায় যে আমি কিছু-না হ'য়ে যাবো।'

'না—এ শুধু চায় যে তুমি সবচেয়ে বেশি তুমি হ'য়ে উঠবে। এ যেন ঘুম থেকে জেগে ওঠা—যে-ঘুম মুছে নিয়েছে সমস্ত অতীত।'

'একে সহ্য করা এত কঠিন তো সেই জন্যেই।'

'সমস্ত অতীত!' অতসী আবার বললে, 'এই মাত্র যেন অন্ধকার থেকে উঠে এলাম—আমরা দু-জন। পিছনে কিছু নেই; এইমাত্র

আরম্ভ। যে-পরিচয় নিয়ে আমরা পথ চলেছি এতদিন, তা হারিয়ে গেছে। কোনো পরিচয় নেই, স্মৃতির কোনো বন্ধন, অন্য কোনো সম্পর্কের দায়িত্ব। সম্পূর্ণ মুক্তি। নতুন জন্মের এই মুহূর্তে পরস্পরকে মুখোমুখি দেখছি—তুমি আর আমি।'

'আর বোলো না, অতসী, আর বোলো না,' হঠাৎ প্রায় ব্যাকুলভাবে রঞ্জন ব'লে উঠলো।

খুব আস্তে, অতসী মুহূর্তের জন্য রঞ্জনের হাত স্পর্শ করলে, যেন আশ্বাস দিয়ে, যেন একটা নতুন সংস্পর্শ স্থাপন করবার জন্য। লক্ষ বিদ্যুৎ এক সঙ্গে ঝিলিক দিয়ে উঠলো রঞ্জনের শরীরে। বন্যার মতো দু'লে উঠলো তার রক্ত। ওঃ, যন্ত্রণা, যন্ত্রণা—এত সহ্য করতে পারে কি মানুষের শরীর? তার সমস্ত সত্তা যেন ফেটে পড়ছে শরীরকে ছাড়িয়ে যেতে, উচ্ছিন্ন হ'য়ে যাচ্ছে মৃত্যুর উন্মুখতায়। কোনো সন্দেহ নেই, মৃত্যু মধুর—যদি মৃত্যু নিয়ে আসে শরীরের চরম অবলুপ্তি—এখন, এই মুহূর্তে।

এ-রাস্তায় ছাড়া-ছাড়া দুটো চারছে বাড়ি—মেহেদির বেড়ায় ঘেরা মস্ত আঙিনার মধ্যে ইউনিভার্সিটির দেবতাদের আবাস। শেষ বাড়িটার ভিতর থেকে ভেসে আসছে অতি মৃদু পিয়ানোর স্বর। রেশমের মতো স্পর্শে অন্ধকারকে আদর ক'রে যাচ্ছে সেই নরম স্বর: যেন চারদিককার নীরবতারই অন্তর থেকে উৎসারিত ক্ষীণ ফোয়ারা। ফোঁটার পর ফোঁটা অন্ধকারের গহ্বরে তা ঝ'রে পড়লো, স্ফটিক-স্বচ্ছ, বিশুদ্ধ। দু-জনে বাড়িটা ছাড়িয়ে এলো চুপচাপ। চললো এগিয়ে। শূন্যতায় মিশে গেলো পিয়ানোর স্বর। রাস্তাটা থামকা চ'লে গেছে আরো অনেকখানি:

হে বিজয়ী বীর

তারপর রেল-লাইন ছাড়িয়ে গ্রামের মধ্য দিয়ে কোথায় কে জানে। কিন্তু শহরের এখানেই শেষ: শেষ ইলেকট্রিক আলোটি কেমন ব্যর্থভাবে জ্বলে যাচ্ছে। তার আলো ছড়িয়ে পড়েছে একটু দূরে, তারপরেই অন্ধকারের সমুদ্র। লেভেলক্রসিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে তারা সেই আলো-অন্ধকারের সঙ্গমরেখার দিকে তাকালো।

রঞ্জন বললে, 'চলো আর-একটু যাই।'

রেল-লাইন পার হ'য়ে তারা এসে পড়লো এক বিশাল শূন্য প্রান্তরের মাঝখানে। চারিদিকে কিছু নেই, আর-কিছু নেই: শুধু আকাশ, শুধু অন্ধকার, শুধু অবাধ, সমতল মাঠ দিগন্ত থেকে দিগন্তে। সেখানে, সেই অন্ধকারে, নির্জনতায়, তারা দু-জন; আর শুব্ধতা কোনো অস্পষ্ট-অনুভাব্য প্রেত-উপস্থিতির মতো। সমস্ত পৃথিবী নীরব, তারা নীরব, তারায়-তারায় হারিয়ে-যাওয়া আকাশের মতো, তার মধ্যে যেন চিরকালের এক বিস্মৃতি। অনির্দিষ্ট, নিরবয়ব, সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তর অসম্পূর্ণ, অসমাপ্ত, যেন তার সৃষ্টি এখনো শেষ হয়নি, যেন তাকে তৈরি করতে-করতে বিধাতা হঠাৎ অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিলেন—আর সেই অর্ধ-সমাপ্ত অবস্থাতেই তা প'ড়ে আছে, যুগের পর যুগ, আশাহীন উদাসীন, অন্ধ, নিশ্চেতন একটা পুঞ্জ। শহরের আলোর চক্র অতিক্রম ক'রে রাস্তা ছেড়ে মাঠের উপর দিয়ে তারা এগোতে লাগলো, অন্ধকারের অভ্যন্তরে।

রঞ্জন বললে, 'একটু বসি, এসো।'

'এখানে?'

'হ্যাঁ, এখানে।'

সকাল ও সন্ধ্যা

'ঘাস যে ভিজে।'

'ভিজে?' জুতো থেকে পা খুলে কড়ে আঙুল দিয়ে রঞ্জন একটু পরখ করলে। 'তা-ই তো।'

খুঁজে খুঁজে একটু শুকনো জায়গা পাওয়া গেলো, তার চারদিকে গাছ। ধূ-ধূ শূন্যতার মধ্যে একটুখানি দ্বীপের মতো। সেখানে বসলো দু-জনে। গাছগুলো আড়াল করেছে দূরের আলোর আভাস। তারা যেন জায়গা ক'রে নিয়েছে পৃথিবীর বুকের মাঝখানে; তাদের উপর দিয়ে ব'য়ে চলেছে অন্ধকারের নিঃশব্দ সমুদ্র।

সেখানে তারা ব'সে রইলো, কথা না-ব'লে, পরস্পর-বিস্মৃত, পৃথিবী-অতীত, সময়-স্বাধীন।

আর হঠাৎ সেই অন্ধকারের সমুদ্রে উঠলো ঢেউ। দূরে শোনা গেলো গুরু-গুরু গর্জন, যেন পৃথিবীর অবরুদ্ধ, মূক আত্মা কথা ক'য়ে উঠতে চায়। দিগন্তে জেগে উঠলো প্রচণ্ড আলো, জয়ধ্বজার মতো উদ্ধত। এ কোন বিজয়ী সেনাবাহিনী এগিয়ে আসছে রাত্রির ভিতর দিয়ে আকাশে নিশান তুলে ধ'রে, ভীষণ কলরোলে চূর্ণ ক'রে দিয়ে রাত্রির হৃৎপিণ্ড! তা এগিয়ে এলো, তা কাছে এলো, প্রান্তর থেকে প্রান্তরে প্রতিধ্বনি তুলে আলোর দীর্ঘ, তীব্র, দ্রুত-ধাবমান বর্শায় অন্ধকারকে দ্বিখণ্ডিত ক'রে। রুক্ষ-সবুজ বিদ্যুতে দিগন্তব্যাপী শূন্য উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো কয়েক মুহূর্তের জন্য।

'ট্রেন!' রুদ্ধ, যেন আতঙ্কিত স্বরে অতসী ব'লে উঠলো।

হু-হু ক'রে ছুটে গেলো রেলগাড়ি, যেন তাদের দু-জনের বুকের উপর দিয়ে, তাদের হৃৎস্পন্দনে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠলো তার উন্মাদ লৌহ

চীৎকার। চাকার ঘর্ষণে-ঘর্ষণে যেন নিষ্পেষিত হ'য়ে গেলো তাদের শরীর। আতঙ্কের আনন্দের মূর্ছাময় এক মুহূর্ত। গাড়ি চ'লে গেলো; আলো গেলো স'রে; অনেক দূরের শব্দ স্বপ্নের মতো অস্পষ্ট। আবার অন্ধকার। আবার চিরন্তন রাত্রির স্তব্ধতা।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত তারা শুনলো নিজেদের হৃদয়ের শব্দ। তারপর অতসী বললে, 'মনে হচ্ছে এতদিন এরই জন্যে অপেক্ষা ক'রে ছিলুম।'

'আমি ঠিক জানতুম এ আসবে,' রঞ্জন বললে।

'জানতে?'

'মুহূর্তের জন্যও আমি সন্দেহ করিনি।'

'আর কখনো, কখনো তুমি দুঃখ পাওনি।'

'তোমার মতো নয়।'

অন্ধকারে মৃদু মর্মরিত দুই স্বর। তা যেন কান দিয়ে শোনবার নয়, রক্তের উচ্ছ্বাসে অনুভব করবার।

'আ, তুমি জানতে!' অতসী বলে উঠলো।

'কাছে এসো,' রঞ্জন বললে।

'কেন তুমি আমাকে চাও? কী চাও তুমি আমার মধ্যে?'

'আমি তোমাকে চাই, আমি তোমাকে চাই।'

হঠাৎ একটা হাওয়া জেগে উঠলো, শিরশির ক'রে উঠলো গাছগুলো, কী ইঙ্গিত ঝলসে গেলো তারা থেকে তারায়। অতসীর স্নায়ু-কেন্দ্রের ভিতর থেকে এক প্রবল কম্পন উত্থিত হ'য়ে যেন তার ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে বেরিয়ে গেলো: অস্ফুট গলায় সে ব'লে উঠলো, 'বলো, বলো, বলো তুমি আমাকে ভালোবাসো!'

আর রাত্রির জোয়ার স্ফীত হ'য়ে উঠলো, মহাশূন্যে তারারা জায়গা বদল করলে, কৃষ্ণতিথি পাংশু হ'য়ে উঠতে লাগলো চাঁদের সম্ভাবনায়। অন্ধকার কেটে যেতে লাগলো ঘুমের স্বপ্নের মতো, ছায়ার রহস্যে ভ'রে গেলো পৃথিবী, দিগন্তে দেখা দিলো ভাঙা, তামাটে চাঁদ। একটা প্যাঁচা তার গম্ভীর স্বরের ঢেউ তুলে উড়ে চ'লে গেলো নির্জনতা থেকে নির্জনতায়।

তখন রঞ্জন বললে, 'রাত হ'লো।'

অতসী কোনো সাড়া দিলে না।

'চলো,' রঞ্জন আবার বললে।

সে-রাত্রে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে অতসী মনে-মনে বললে, তুমি আমাকে নাও। আঃ, নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করবার পরম মোক্ষ! সে তাকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখুক, ভাসিয়ে নিয়ে যাক বন্যার মতো, অতসী মগ্ন হ'য়ে যাক তার মধ্যে। আর-কিছু সে চায় না। সে দেখা দিক জ্বলন্ত তারার মতো, তার হৃদয়ের দিগন্তে; তার বুকের মধ্যে পথ ক'রে নিক অগ্নিরেখায়। সে তার বুক পেতে দেবে; সে নিজেকে তুলে ধরবে তার মুখের কাছে, মদের মতো। এতদিন তার গর্ব ছিলো—ওঃ, সে ম'রে যাচ্ছিলো তার গর্বের পীড়নে। কিন্তু এখন···কেন সে এখন এখানে নেই? একবার সে কি আসতে পারে না? অতসী নিজেকে নিঃশেষে নিষ্কাশণ ক'রে তার সমস্ত সত্তার সার কোনো দুর্লভ সুগন্ধির মতো তাকে উপহার দেবে—সে যদি এখন আসে। সে যদি এখন আসে, সে যদি তাকে চায়, নিতে চায়। তার প্রেম যে দারুণ খড়্গের মতো দীপ্তিময়, কে তাকে রোধ করবে? এই রাত্রির মতো

হে বিজয়ী বীর

উষ্ণ অন্ধকার তার যৌবন—উপায় কি তার মধ্যে ডুবে না-গিয়ে? আমি এতদিন চোখ বুজে ছিলুম—যাতে তোমাকে না-দেখতে পাই; কিন্তু এখন তুমি দেখা দিয়েছো, বজ্র-স্বরে, বিদ্যুৎ-স্পর্শে, মেঘের সমারোহে। আমার সমস্ত বিশ্ব তোমার অন্ধকারে মিশে গেলো যে। যা-কিছু আমার ছিলো, যা-কিছু আমি দিতে পারি, সব তোমাকে দিয়েছি; এইবার তুমি আমাকে নাও। হে বিজয়ী বীর, তুমি আমাকে নাও।

নয়

রীতিমতো বিয়ে

চিঠিখানা পাবার পর রঞ্জন আধ ঘণ্টার মধ্যে দু-বার পড়েছে, তবু তাকে আর-একবার পড়তে হবে :

'রঞ্জন,

অনেকদিন পর—না? এর মধ্যে আমাদের একেবারে ভুলে যাওনি নিশ্চয়ই? বলো—তোমার পড়াশুনো আর রমনা বেড়ানো আর সিনেমা-দেখা আর আড্ডা—তোমার সব কাজ আর অকাজের ফাঁকে-ফাঁকে দু-একবার কি মনে পড়েছে—সেইসব সন্ধ্যা, সেই হাসি আর গল্প, সেই—সব-কিছু। মনে প'ড়ে একটু কি মন-খারাপও হয়নি? হয়নি জানি, তবু মিথ্যে ক'রে একবার বলো।

ভেবেছিলুম তুমি এতদিনের মধ্যে হয়তো একবার কলকাতায় আসবে। এত বড়ো একটা গ্রীষ্মের ছুটি গেলো! মা অনুমতি দিলেন না বুঝি? না কি, সদ্য-বৈধব্যিত মা-কে সান্ত্বনা দেবার জন্যে থেকে গেলে? তোমাদের দুর্ঘটনার কথা শুনে মর্মাহত হয়েছিলুম, আর এমন হঠাৎ—! তখন ভেবেছিলুম একটা চিঠি লিখি তোমাকে, কিন্তু লেখবার কী-ই বা ছিলো! একটা কথা তবু, এত দেরি হ'য়ে গেলেও, না-লিখে পারছি না : তোমার কামানো মাথা নিয়ে তুমি রীতিমতো দ্রষ্টব্য হয়েছিলে নিশ্চয়ই! কিন্তু হায়, এ-দৃশ্য আমি দেখতে

পেলুম না। তোমার ভিতরকার গভীর আধ্যাত্মিকতা সে-ক'দিনে নিশ্চয়ই এমন ফুটে বেরিয়েছিলো যে—যে—তুমি নিজে যা-হোক একটা কিছু বসিয়ে নিয়ো, আর ভাবতে পারি না। তখন একবার এলে না কেন? এলে তো না-ই, চিঠিপত্রও লিখলে না। শেষ চিঠিতে লিখেছিলে বাবার অসুখের কথা; তারপর চুপ। অনুমান করছি, তোমার অসংখ্য আত্মীয়ের সান্ত্বনাময় চিঠির উত্তর দিতে-দিতে চিঠি-লেখালেখি ব্যাপারটার উপরই তোমার অরুচি ধ'রে গিয়েছিলো।

তোমাকে মনে পড়ে, তোমার সেই মস্ত টেবিলে সবুজ ঢাকনা-দেয়া আলোয় মাথা নিচু ক'রে ব'সে। কী করো তুমি আজকাল সেই টেবিলে ব'সে? এখনো কি নিও-হেগেলিজম আর প্রাগমাটিজম আর এটা-ইজম আর ওটা-ইজম-এর ফাঁকে-ফাঁকে টুংটাং ছন্দওলা পদ্য লেখো? তোমার সে-পদ্যটা আমার এত ভালো লেগেছিলো—

লাগলো আগুন ঘরে।
গিন্নি বলেন, "এবার ঠিকই
মরবো আমি জ্বরে।"
উনি বলেন, "জ্বর নয় গো,
আগুন লাগলো ঘরে।"
গিন্নি বলেন বিষম রেগে,
"এখনো ফাজলামি!
সর্বশরীর যাচ্ছে পুড়ে
জ্বরে মরছি আমি।"

রীতিমতো বিয়ে

উনি বলেন, "ওঠো শিগগির,
আগুন লাগলো ঘরে।"

আর আমি বলি, উনি যদি এত ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে না-উঠে গিন্নিটিকে ধীরে-সুস্থে আগুনে পুড়ে মরতে দিতেন, তাহ'লেই সমস্ত ব্যাপারটার একটা মধুর সমাপন হ'তে পারতো।

আমাদের খবর যদি শুনতে চাও, একটা খবর এই যে সম্প্রতি আমাদের বাড়িতে এক ভদ্রলোক আনাগোনা করছেন, যিনি আড়াই মাস ইওরোপে থেকে এসে এখন অতি-আধুনিক বিলিতি মেয়েদের গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন করছেন বাংলা সাপ্তাহিকের পৃষ্ঠায়। বিলিতি মেয়েদের কথা জানিনে, কিন্তু নিজেকে তিনি যে উদ্‌ঘাটন করেছেন খুব ভালো ক'রেই, এ-কথা সবাই মানছে। সেদিন তিনি বলছিলেন যে প্যারিস হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে dull শহর। প্যারিসে তিনি ছিলেন ঠিক তিন দিন, এবং ফরাশিভাষার ইয়েস-নো-ভেরি-গুডও তিনি জানেন না। হায় আড়াইমাসের ইওরোপ-ফেরতা!

এ ছাড়া খবর এই যে সামনের পুজোর ছুটিতে আমরা ঢাকায় যাচ্ছি। মা বলেছিলেন বিন্ধ্যাচল, কিন্তু বাবা বলছেন বাড়িটা মিছিমিছি প'ড়ে আছে—আর তাছাড়া, যে-রকম দিনকাল পড়েছে, খরচের কথাও ভাবতে হয়। ঢাকা শুনতে মোটেও রোমান্টিক নয়—তা না-ই বা হ'লো, আমার খুব ভালোই লাগছে ভাবতে। তুমি আবার চট ক'রে অন্য কোথাও চ'লে যেয়ো না যেন। সেইজন্য সময় থাকতে এই চিঠি। আমরা পৌঁছবো সাতাশে তারিখ। কতদিন পরে আবার

দেখা হবে তোমার সঙ্গে! কেমন আছো তুমি? সব খবর জানতে ইচ্ছে করে তোমার। যদি ইচ্ছে করে, আর খুব বেশি ব্যস্ত না থাকো, একটা চিঠি লিখো।

সম্প্রতি, এ-চিঠির এখানেই শেষ—বাংলা লেখা যা কষ্ট!

মিলি'

মিলি! স্বাক্ষরটা যেন রঞ্জন এই প্রথম বার লক্ষ্য করলো, কান গরম হ'য়ে উঠলো তার। মিলি নামে স্বাক্ষর—এত অনুগ্রহ রঞ্জনকে কেন? কিন্তু পরমুহূর্তেই তার মনে পড়লো, প্রমীলাকে সে ডাকতো মিলি ব'লেই। তা সেটা আর বিশেষ কী—ওকে তো মিলি ব'লেই ডাকে সবাই। কিন্তু কিসের জোরে, কোন অধিকারে সে তাকে এ-রকম চিঠি লিখতে সাহস পেলো? দুঃসাহস, অবিশ্বাস্য দুঃসাহস! এ-চিঠি যে-কোনো তৃতীয় ব্যক্তি পড়লে ভাববে—যা ভাববে তা আর মনে না করাই ভালো। কী নির্লজ্জ! স্তম্ভিত হ'তে হয় গায়ে-পড়া আহ্লাদিপনা দেখলে। রঞ্জন মনে করবার চেষ্টা করলো, কখনো তার আর প্রমীলার মধ্যে এমন কিছু ছিলো কিনা যাতে—যাতে এই দীর্ঘকাল পর এ-রকম একটি চিঠি লেখা যায়। না, কিছু নয়, একেবারেই কিছু নয়: প্রমীলা চ'লে যাবার পর সে দু-একখানার বেশি চিঠি লেখেনি পর্যন্ত—আর তাও এমন চিঠি, কল্পনাকে বিস্তর টানা-হেঁচড়া করলেও যাকে ঠিক 'মারাত্মক' ব'লে ভাবা যায় না। এ কী ক'রে হতে পারলো, রঞ্জন ভেবে পেলে না। প্রায় ঠাট্টার মতো ঠেকছে। যদিও ঠাট্টা ব'লে একে উড়িয়ে দেয়াও যায় না। গেলো বছর কেশববাবু নামে এক সরকারি ডাক্তার তাদের কয়েকটা প্লট পরে বাড়ি করেন, তাঁরই

মেয়ে প্রমীলা। নীলবনে প্রতিবেশিতার ভাব অত্যন্ত প্রবল: কেশব-বাবুদের সঙ্গে তাদের বাড়ির জানাশোনা, আসা-যাওয়া হয়—তেমনি অন্যসব বাড়ির সঙ্গেও হয়ে থাকে। সে-মেলামেশায় অসাধারণ কি উল্লেখ-যোগ্য কিছু ছিলো না—রঞ্জনের অন্তত তা-ই মনে হ'লো। সেই সূত্রে প্রমীলার সঙ্গে তার—আলাপ হয়। সে মাঝে-মাঝে যেতো ওদের বাড়িতে, চা খেতো, গল্প করতো। প্রমীলাও আসতো কখনো বা। মোটের উপর ব্যাপারটা এত সহজ, এত বেশি সহজ যে তা চোখে পড়বার মতোই নয়—মনে ক'রে রাখা তো দূরের কথা। মেয়েটি ছিলো সপ্রতিভ, দেখতে মন্দ না—রঞ্জনের তাকে ভালোই লাগতো। অনেক সময় সে নষ্ট করেছে তার সঙ্গে গল্প ক'রে। দু-একদিন ছবি দেখতেও নিয়ে গেছে—নেহাৎই শোভনতার খাতিরে। রঞ্জনের কাছ থেকে লোকে যা আশা করে, সে তা-ই করে—সব সময়। হ্যাঁ, মিলিকে তার ভালো লাগতো—কিন্তু পৃথিবীর কত লোককেই তো আমাদের ভালো লাগে। তাদের সবার সঙ্গেই আমরা কোনো স্থায়ী, গভীর সম্বন্ধ স্থাপন করতে চাই না। কেশববাবু যখন বদলি হ'য়ে চ'লে গেলেন কলকাতায়, তার একটু খারাপই লেগেছিলো। সে তখন বলেছিলো সে শিগগিরই যাবে এবার কলকাতায়, গিয়ে তাদের বাড়িতেই উঠবে। কারো সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার সময় কোন কথাই বা আমরা না বলি? আর এমন যদি নিয়ম থাকতো যে মুখে আমরা যা কিছু বলি তার প্রত্যেকটা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেই হবে, তাহ'লে আত্মহত্যা ছাড়া উপায় থাকতো না। মিলিটা কি ইডিয়ট নাকি?

হে বিজয়ী বীর

না কি গভীর, বড়ো বেশি গভীর—মেয়ে-মনের সূক্ষ্মতায় নিগূঢ়? চিঠিখানা একটি ছোটোখাটো সাহিত্যিক কীর্তি: ওতে যা লেখা হ'য়েছে, না-লেখা হয়েছে, তার ঢের বেশি: অনেক জিনিশ আছে লাইনের ফাঁকে-ফাঁকে পড়বার। আড়াই মাসের বিলেত-ফেরতার প্রসঙ্গটিকে ঘিরে যে অতি সূক্ষ্ম একটা ইঙ্গিত রয়েছে, রঞ্জনের মন থেকে সেটা গোপন রইলো না। এটা ধ'রে নেয়া হয়েছে যে রঞ্জনের স্বার্থ তার সঙ্গে জড়িত, ও-বিষয়ে কৌতূহলী হবার যেন বিশেষ-কোনো কারণ আছে রঞ্জনের। এটাও স্পষ্ট যে আড়াই মাসের বিলেত-ফেরতার কোনো আশা নেই। কিন্তু সেটা অত কায়দা ক'রে উহ্য রেখে অথচ অত স্পষ্ট ক'রে জানানো কেন? আর শেষের ক-টা লাইন—ওঃ, কী মিষ্টি, কী শান্ত, তার অধিকার-চেতনায় কী আশ্চর্যরকম শান্ত! 'তুমি আবার অন্য কোথাও চ'লে যেয়ো না যেন।' বাধিত হলাম। তোমার চিরানুগত দাস। রানীগিরি করবার এতটুকু সুযোগও কি ছাড়তে পারে না কোনো মেয়ে? আর সুযোগ না-পেলেও তা তৈরি ক'রে নেবেই? কল্পনা করবে—না, তাও নয়, সব জেনে-শুনে নিজের রানীত্বকে জোর ক'রে চাপাবে হাতের কাছে যে-কোনো পুরুষকে পাবে, তারই ঘাড়ে। রানী তাকে হ'তেই হবে; নিজের ইচ্ছাকে সে জোর ক'রে খাটাবেই। 'কতদিন পর আবার দেখা হবে তোমার সঙ্গে!' অসহ্য! কিন্তু এই মেয়ের ইচ্ছার দড়ির কাছে রঞ্জন মাথা পেতে দেবে না —না, ধন্যবাদ। সে পালাবে, সে অদৃশ্য হবে। সে এমন ব্যবস্থা করবে যাতে মিলি এসে পৌঁছবার আগেই তার অন্য কোথাও যাওয়া হয়। দার্জিলিঙ কি পশ্চিম কি পদ্মা পার হ'য়ে তাদের দেশের বাড়ি

—যে-কোনো, যে-কোনো জায়গায়। রঞ্জন একবার ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকালো: ওরা আসতে ঠিক সাতদিন বাকি। সময় থাকতে মিলি চিঠি লিখেছে; সময় থাকতে সে—স'রে পড়বে। তবু ভালো যে চিঠিটা লিখেছিলো। একটা জবাব লিখে গেলে কেমন হয়—'মিলি, অত্যন্ত দুঃখিত, দেশের বাড়িতে আমার বুড়ো পিসিমা মারা যাচ্ছেন, তাঁকে দেখতে যেতে হচ্ছে। সুতরাং—' নয়তো: 'অসুস্থ হ'য়ে পড়েছি: যেতে হচ্ছে শিলং পাইনের হাওয়া খেতে। মনে কিছু কোরো না।' যা-হোক একটা লিখলেই চলে। না লিখলেও চলে। সে যা চায় না, তা হ'তে দেবে না কিছুতেই। অদৃশ্য হ'য়ে যাওয়া সব সময়েই সহজ।

কিন্তু এই ছুটিটা যে ঢাকাতেই কাটাবার ইচ্ছে ছিলো তার, অন্য কোথাও সে যেতে চায় না। অতসী তাকে পরিপূর্ণ ক'রে, আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে: প্রদীপের শিখা জ'লে উঠছে ঊর্ধ্বে, আরো ঊর্ধ্বে, আকাশকে স্পর্শ করবে ব'লে, কেঁদে উঠছে কোনো অজ্ঞাত সুদূরের বাসনায়। আঃ, এ-সময়ে অতসীকে ছেড়ে সে কোথায় যাবে?

আর, কেন তাকে পালিয়ে যেতে হবে একটা মেয়ের ভয়ে—হ্যাঁ, ভয়েই তো। কেন সে মিলিকে এতটা ক্ষমতা দেবে তার উপর, যাতে সে তাকে স্বস্থান থেকে চ্যুত করতে পারে, ভ্রষ্ট করতে পারে নিজের ইচ্ছা থেকে? সে যা চায় না, তা সে হ'তে দেবে না, এই না তার পণ? কিন্তু এই তো সে হার মানছে মিলির কাছে; তার পালিয়ে যাবার সংকল্পে তো মিলিকেই স্বীকার ক'রে নিচ্ছে সবচেয়ে বেশি। মিলি তার উপর যে-ক্ষমতা বিস্তার করতে চায়, এ তো তারই অন্য একটা রূপ। মিলির

ইচ্ছার ঠিক উল্টো আচরণ ক'রে সেই ইচ্ছাকেই তো সে বড়ো ক'রে তুলছে। তাই তো, তাই তো!

কিন্তু মিলির কথা সে এত ভাবছে কেনই বা? কেন তাকে এতটা আমল দিচ্ছে? আসুক না সে। রঞ্জন তাকে ভয় পায় না। রঞ্জন তাকে এড়াবার চেষ্টা করবে না—হ'লোই না-হয় দেখা তার সঙ্গে, কী ক্ষতি সে করতে পারে তার? রঞ্জন একচুল নড়বে না নিজের জায়গা থেকে। মিলির চক্রান্ত ব্যর্থ করবার কোনোরকম চেষ্টা না-করেই সে তাকে পরাস্ত করবে সবচেয়ে বেশি। হঠাৎ ব্যাপারটা এত সহজ হ'য়ে গেলো যে একটু আগেই সে অমন বিচলিত হয়ে পড়েছিলো ব'লে রঞ্জন একটু লজ্জিত হ'য়ে উঠলো মনে-মনে।

এমন সময় মৃণালিনী এলেন সে-ঘরে। রঞ্জনের হাতে চিঠি দেখে বললেন, 'কার চিঠি রে?'

'আমার এক বন্ধুর।'

টেবিলের উপর খামটা প'ড়ে ছিলো, মৃণালিনী সেটা লক্ষ্য করলেন। 'কে বন্ধু?' খামের উপরের লেখাটা মেয়েলি ছাঁচের, মৃণালিনী সেটা পছন্দ করলেন না। ছেলের জন্য কেমন একটা ভয় ছিলো তাঁর মনে—তাকে তিনি সব সময় আগলে রাখবেন, সব সময় আড়াল ক'রে রাখবেন স্ত্রী-সংসর্গের অশুভ হাওয়া থেকে। কেননা এটা তিনি স্থির জানতেন যে পুরুষ যে-যে কারণে নিজের সর্বনাশ নিজে ডেকে আনে, তার মধ্যে স্ত্রীলোক জাতটাই অগ্রগণ্য। সব সময় সতর্ক থাকতেন তিনি, যাতে রঞ্জন কোনো মেয়ের সঙ্গে বেশি মেলামেশা না-করতে পারে। কোনো মেয়ে তাঁদের বাড়ি বেড়াতে এলে তিনি

নিজে তাকে দখল ক'রে রাখতেন যতদূর সম্ভব। বলা যায় না, বলা যায় না; সব সময় ভয়ে কাঁপছে তাঁর বুক। মেয়েগুলো আজকাল যা হ'য়ে উঠছে···যা-সব শোনা যাচ্ছে চারদিকে। মনে-মনে তাঁর ইচ্ছে, আর কিছুদিন গেলেই রঞ্জনের বিয়ে দেবেন। বিয়ে দিলেই চুকে যায় সব ভাবনা। অল্প বয়সের বিয়েতে তাঁর গভীর আস্থা ছিলো। খামকা দেরি ক'রে লাভ নেই। এদিকে ছেলে মাঝখান থেকে একটা হাঙ্গাম বাধিয়ে বসুক। যে-কোনো রকম হাঙ্গামাকে তাঁর বড় ভয়। তাঁর জীবন কেটেছে নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে: গতানুগতিক মসৃণতার এতটুকু ব্যতিক্রম হ'লে সেটা তাঁর সইতো না। 'কে বন্ধু?' আবার জিগেস করলেন তিনি।

'ছিলো এক বন্ধু ইস্কুলের,' রঞ্জন অনায়াসে বললে, 'কানপুর থেকে লিখেছে।'

'কী লিখেছে? চুপ ক'রে ব'সে ভাবছিস কী?'

'লিখেছে, ওখানে নতুন একটা কাপড়ের মিল খোলা হচ্ছে—আমি দু-একটা শেয়ার কিনবো কি না।'

'কাজ নেই আর শেয়ার কিনে—চায়ের বাগানে অতগুলো টাকা গেলো—'

'কিন্তু মা, আজকাল কাপড়ের মিলেই তো লাভ।'

'তা ভালো ক'রে খোঁজ নিয়ে ছাখ চারদিকে। না-হয় ঠাকুরপোকে চিঠি লেখ একটা। নিজের বুদ্ধিতে কিছু করতে যাসনে বাপু। যদি চায়ের শেয়ারগুলো বিক্রি করা যায় কোনো-রকমে—'

এর পর মা-ছেলে খানিকক্ষণ শেয়ার বিষয়ে আলাপ করলে।

ছুটি এলো। এলো সাতাশ তারিখ। বিকেলের দিকে বই নিয়ে ইজি-চেয়ারে শুয়ে-শুয়ে রঞ্জনের চোখে তন্দ্রা জড়িয়ে আসছিলো, তার-স্বরে বেজে উঠলো ট্যাক্সির হর্ন রাস্তায়। অলস চোখ মেলে সে তাকালো জানলা দিয়ে: মালপত্র মানুষে বোঝাই দুটো ঝরঝরে ট্যাক্সি প্রচুরতম শব্দ করতে-করতে চ'লে গেলো। ওরা এলো। মিলির চিঠির শেষ পর্যন্ত একটা জবাব দিয়েছিলো সে। যা লিখেছিলো, তাতে কোনো ঝাঁঝ ছিলো না, কোনো রংও ছিলো না। তা কিছুই বলে না। নিরুত্তরতায় তার চেয়ে বেশি অর্থ থাকতো। সেইজন্যই লিখেছিলো মিলিকে সে অপদস্থ ক'রে দেবে ওকে একান্ত সহজভাবে নিয়ে: ওকে নিয়ে কোনোরকম হৈ-চৈ না ক'রে, ওকে অবজ্ঞা করবার কিছুমাত্র চেষ্টা না ক'রে। ওকে ঠিক ততটুকু লক্ষ্য করবে, যেটুকু না-করলে লক্ষ্য না-করাটাই লক্ষ্যণীয় হয়। আ—ও জানবে, ও বুঝবে। নিজের মনে একটু হাসলো রঞ্জন। বইখানা আবার খুলে ধরলো চোখের সামনে। চার-পাঁচ লাইন পড়বার পর পড়লো ঘুমিয়ে।

পাঁচটার সময় তা'কে চা দিতে এসে মৃণালিনী বললেন, 'আজ কেশববাবুরা এলেন।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ—ওদের চাকর এসে দুধ চেয়ে নিয়ে গেলো চায়ের জন্যে।'

'ওঁরা কি সবাই এসেছেন?' জিগেস করলে রঞ্জন।

'তা-ই তো মনে হ'লো।'

রীতিমতো বিয়ে

'যাক,' খবরের কাগজের পাতা উল্টিয়ে রঞ্জন বললে, 'তোমার গল্প করবার লোক হ'লো একজন।'

'বড়ো ভালো মানুষ মিলির মা। ওঁরা চ'লে যাবার পর খারাপই লেগেছিলো কয়েকটা দিন।'

রঞ্জন জবাব দিলো না। পৃথিবীর খবরের সঙ্গে চা গলাধঃকরণ করলো নিঃশব্দে। তারপর জামাকাপড় প'রে বেরিয়ে পড়লো রাস্তায় সাইকেল নিয়ে।

'এতদিন পর!' তাকে দেখামাত্র ব'লে উঠলো অতসী।

'দু-দিন, অতসী, দু-দিন।'

'কী করলে এতদিন—এই দু-দিন?'

'কাজ—'

'কাজ! এত কাজ তোমার!'

'রাগ কোরো না। না-এসে কি আমারই ভালো লেগেছে?'

মুহূর্তের জন্য, অতসীর চোখের পাতা নেমে এলো তার চোখের উপর। আস্তে-আস্তে বললে, 'থাক, আর বোলো না। আমার মাঝে-মাঝে কেমন ভয় করে, কেবলই মনে হয়, এ টিঁকবে না, টিঁকতে পারে না। শেষ হ'লো ব'লে, শেষ হ'লো ব'লে।'

'এ-সব কথা বোলো না, অতসী।'

'কেবলই মনে হয়, আমার তো কিছুই নেই তোমাকে দেবার মতো।'

'অতসী, আমি তোমাকে—'

'বোলো না,' প্রায় আর্তস্বরে অতসী ব'লে উঠলো, 'বোলো না। একটা মুখের কথায় সমস্ত ভবিষ্যৎ বিকিয়ে দেবে কেন? চুপ

করো। চুপ ক'রে থাকো। এই মুহূর্তকে নাও। এই মুহূর্তই চরম।'

রঞ্জন মুখ ফিরিয়ে রইলো চুপ ক'রে। তার মস্তিষ্কের মধ্যে শূন্যতা। কী করবে সে এই ভীষণ ভালোবাসার ভার নিয়ে? কী ক'রে তাকে নেবে, তাকে সহ্য করবে কেমন ক'রে? সব অস্পষ্ট, সব নিরবয়ব। এক জ্যোতির্ময় অন্ধকারের কেন্দ্রে সে ব'সে। আর তার মধ্যে ঘুমন্ত অনেক শক্তি তার নাভিমূল থেকে তীব্র স্রোতে ঠেলে-ঠেলে উঠছে, তার স্নায়ুমণ্ডল দীর্ণ ক'রে। বিদ্যুৎ-বহ একটা তারের মতো, তার শরীর। কী করবে, কী করবে সে এখন?

'আর-কোনো কথা তুমি বোলো না,' অতসী বলতে লাগলো, 'আর-কিছু আমি চাইনা তোমার কাছে। কী-ই বা চাইবো আর? তুমি আমাকে রানী করেছো, সমস্ত আকাশ তুলে দিয়েছো আমার হাতে—'

'সেই চাঁদ-তারা, অতসী!'

অতসীর নিবিড়-কালো চোখ ঝলসে উঠলো রঞ্জনের মুখের উপর। 'কিন্তু তা-ই যে!' মৃদু-স্পন্দিত তার স্বর, 'তা-ই যে! আমিও একদিন ছিলাম—তুমি জানো, কী ছিলাম। আমিও হাসতাম ও-সব শুনলে—আমার মতো কেউ হাসতো না। কিন্তু এখন—এখন আমি জানি। আমি জানি।'

একটু চুপ ক'রে থেকে রঞ্জন অন্যরকম গলায় বললো, 'নিয়ে এসো তোমার বই-পত্র। তোমাকে লজিকটা একটু ধরিয়ে দিয়ে যাই।'

'এখন থাক।'

'থাক কেন?'

'অন্ধকার হ'য়ে আসছে, দেখছো না?'

রীতিমতো বিয়ে

'একটা আলো নিয়ে এসো।'

'না, বেশ আছে। এর মধ্যে একটা আলো কী বিশ্রী।'

'পড়বে না?'

'কী হবে প'ড়ে?'

'বাঃ, পুজো এসে পড়লো—আর ক'-মাসই বা বাকি পরীক্ষার? এখন থেকে না-পড়লে—'

'কী হবে পাশ-টাশ ক'রে? বেশ তো আছি।' অতসী মৃদুস্বরে হেসে উঠলো।

রঞ্জন তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। 'কী হবে ও-সব ঝকমারি ক'রে?' একটু পরে অতসী আবার বললে, 'অন্য যে-কোনো মানুষের তুলনায় আমিই বা কম সুখে আছি কী?' তার কণ্ঠস্বরে আলস্য; দেয়ালে হেলান দিয়ে সে বসেছে, কোলের উপর হাত দুটি স্তব্ধ। তার যেন কোনো তাড়া নেই, কেনো ভাবনা নেই; নিজের ভিতরকার এক গভীর প্রশান্তিতে সে সমাহিত। বসেছে হাঁটু উঁচু ক'রে, পায়ের আঙুলে মেঝে খুঁটছে কখনো বা।

'কই',—রঞ্জন মাস্টারি স্বরে বললে, 'নিয়ে এসো বই।'

'থাক না,' অতসী অনুনয়ের স্বরে বললে, 'আর-একটু যেতে দাও, আর-একটু।'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত অতসীকে উঠতে হ'লো: নিয়ে আসতে হ'লো একটা লণ্ঠন আর গুটিকয়েক বই। 'নাও, হ'লো?'

রঞ্জন পিঠ খাড়া ক'রে আসনপিঁড়ি হ'য়ে বসলো। আলোটা উস্কে নিলে। 'বোসো তুমি।'

হে বিজয়ী বীর

লণ্ঠনের লালচে, কেরোসিনগন্ধী আলোয় দু-জনে বসলো মুখোমুখি। বাইরের হাওয়ায় আলোটা মাঝে-মাঝে কেঁপে উঠছে, অতসীর মুখের উপর ফেলছে অদ্ভুত ছায়া। তার কপালের উপর একটা চুলের গোছা বিস্রস্ত। সেই একটি চুলের গোছা তার কিছুতেই ঠিক থাকে না।

খানিক পরে মৃদু একটা শব্দ হ'লো। রঞ্জন চোখ তুলে দেখলে, সরোজ। হঠাৎ থেমে গেলো।

'আপনারা কাজ করুন,' সরোজ তাড়াতাড়ি বললো, 'আমি শুধু একটু বসবো এখানে খোলা হাওয়ায়।'

একটু দূরে আধো অন্ধকারে সরোজ বসলো মেঝের উপর। গা থেকে খুলে ফেললে পাঞ্জাবি। হাতপাখা নিয়ে একটু হাওয়া করলে গেঞ্জি-পরা পিঠে। রঞ্জন আবার পড়ানো শুরু করলে। কে জানতো লজিকে এত রস।

আর সেই আধো অন্ধকার থেকে সরোজের শুদ্ধ জ্বলন্ত দৃষ্টি অতসীর উপর, অতসীর মুখের উপর।

বাজলো সাড়ে-আটটা। রঞ্জন বই বন্ধ ক'রে উঠলো। 'যাই এবার।'

'এখনই যাবে? রোজই কি তোমায় ফিরতে হবে ন-টার মধ্যে? হবেই?'

রঞ্জন উঠে ধুতির কোঁচাটা পাট ক'রে নিয়ে বললে, 'এখন যাই?'

অতসীও উঠলো, গেলো রঞ্জনের সঙ্গে-সঙ্গে আলো হাতে ক'রে। 'তুমি আর এসো না—' আবছা আলোয় তার চোখের দিকে তাকালো রঞ্জন।

'রাস্তাটা ভালো না,' অতসী বললে, 'যা বৃষ্টি হ'য়ে গেলো ক-দিন—ঘাসগুলো মস্ত হ'য়ে উঠেছে—কে জানে ওর মধ্যে কী—'

রীতিমতো বিয়ে

দরজা থেকে বাড়ি পর্যন্ত আদিযুগে একটা ইটে-বাঁধানো পথ ছিলো—এখন তা চাপা পড়েছে ঘাসে। বাইরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো দু-জনে। দেয়ালের গায়ে দাঁড়িয়ে আছে রঞ্জনের সাইকেল। রঞ্জন সাইকেলের ল্যাম্পের ঢাকনা খুলে দেশলাই ধরালো। আলো নিবে গেলো হাওয়ায়। মাথা নিচু ক'রে চেষ্টা করলো আবার, সলতেটাকে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে আঙুলে গন্ধ ক'রে ফেললো, তবু জ্বললো না আলো।

তখন অতসী বললে, 'তেল নেই বোধহয়—ছাখো তো।'

রঞ্জন ল্যাম্পটা খুলে কানের কাছে তুলে ঝাঁকানি দিয়ে বললে, 'তা-ই তো মনে হচ্ছে। তাই তো, ভুল হ'য়ে গেছে।'

'দাও, তেল ভ'রে আনি,' অতসী হাত বাড়িয়ে দিলে।

'কী দরকার, এমনিই চ'লে যেতে পারবো।'

'না, না—আলো ছাড়া যাবে কী, যা বিশ্রী রাস্তা। দাও—ভ'রে আনি।' অতসী ল্যাম্পটা নিলে রঞ্জনের হাত থেকে। 'নারকোল তেল তো—কেরোসিনের সঙ্গে মিশিয়ে।'

'দরকার ছিলো না কিন্তু।'

এক হাতে সাইকেলের আলো, অন্য হাতে লণ্ঠন নিয়ে অতসী বাড়ির ভিতর চ'লে গেলো। রঞ্জন একা দাঁড়িয়ে রইলো অন্ধকারে। অনেক তারা আকাশে।

'নাও,' খানিক পরে অতসী ফিরে এলো তেলে ভরা ল্যাম্প নিয়ে। এবার আর তার লণ্ঠনটা আনতে মনে নেই। অন্ধকারে দু'-জনে লুপ্ত।

রঞ্জন হাত বাড়িয়ে সেটা নিলে। হাতের সঙ্গে হাত ঠেকে গেলো: অতসীর আঙুল তেলে চিটচিটে।

'সত্যি, কেন তুমি মিছিমিছি হাত নোংরা করতে গেলে!'

অতসী মাথার চুলে আঙুল মুছে বললে, 'তা আর কী হয়েছে।'

ল্যাম্পটা বসিয়ে রঞ্জন সাইকেলের সঙ্গে প্রায় মাথা ঠেকিয়ে দু-হাতের মধ্যে সযত্নে আড়াল ক'রে একটা দেশলাইয়ের কাঠি ধরালো। জ্ব'লে উঠলো চওড়া সলতের শাদাটে গোল আলো। সেই অন্ধকারের মধ্যে, রঞ্জনের মুখ মুহূর্তের জন্য উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো।

'আচ্ছা—'

সাইকেলটাকে সামনের দিকে ঠেলা দিয়ে রঞ্জন বেরিয়ে এলো রাস্তায়। একবার পিছন ফিরে অতসীর দিকে তাকিয়ে লাফিয়ে উঠে বসলো। অতসী দাঁড়িয়ে রইলো দরজার ধারে। সাইকেল এগিয়ে গেলো অন্ধকারের মধ্যে; বাজলো ঘণ্টা। একটু পরে পিছনের ছোটো, লাল আলোটাও তার দৃষ্টি থেকে লুপ্ত হ'য়ে গেলো।

অতসী বারান্দায় উঠে আসছে, এমন সময় ছায়ার ভিতর থেকে সরোজের গলা এলো, 'তোমার পড়াশুনো ভালোই এগোচ্ছে, দেখছি।'

'সরোজ!' অতসী যেন সরোজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এইমাত্র সচেতন হ'লো 'অ, কখন থেকে তুমি ব'সে আছো ওখানে?'

'তোমরা পড়ছিলে, তাই—'

'আচ্ছা সরোজ, সব সময় তুমি এমন চুপচাপ, এমন শান্ত কেন?'

'কেন আবার? ওটাই আমার স্বভাব ব'লে।'

'কখনোই কি তোমার অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করে না,

চেঁচিয়ে হাসতে ইচ্ছে করে না, হঠাৎ কোনো অন্যায় কাজ ক'রে ফেলতে ইচ্ছে করে না?'

প্রশ্নগুলো ঝড়ের ঝাপটের মতো সরোজের মুখের উপর এসে লাগলো। 'কী বলছো তুমি?' প্রায় ভীতস্বরে সে বললে, 'তুমি কী বলছো ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'বলছি এই কথা যে তুমি এত ভালো কেন? তোমার এই ভালোত্ব তোমার রক্ত শুষে নিচ্ছে। কিন্তু তোমার ভালো-হওয়া কে চায় বলো তো? সুখী হ'তে পারো না তুমি? সুখী হও, সরোজ, সুখী হও—সুখী হওয়ার মতো আর-কিছু নেই জীবনে।'

'তা আমি জানি,' সরোজ উঠে দাঁড়ালো, 'তা আমি বুঝতে পারছি।' আর কিছু না-ব'লে, অতসীকে আর-কিছু বলার সময় না-দিয়ে, তাড়াতাড়ি চ'লে গেলো উপরে।

সেই রাত্রে, অন্ধকার নির্জন মাঠের উপর দিয়ে এলোমেলোভাবে সাইকেল চালাতে-চালাতে, রঞ্জনের মনে একটা অদ্ভুত অনুভূতি এলো। কোনো সূক্ষ্ম সৌরভের মতো অতসীর অশরীরী উপস্থিতি তাকে আচ্ছন্ন করেছে—অনির্দেশ্য সেই সৌরভ, কিন্তু সর্বব্যাপী। অতসী সব সময় তার সঙ্গে আছে, সব সময়; অতসীকে ছেড়ে, অতসীকে ছাড়িয়ে সে কখনো যেতে পারবে না। সে যখন দূরে থাকে, তখনো তার সত্তার সূক্ষ্মতম সার রঞ্জনকে ব্যাপ্ত ক'রে থাকে—সৌরভের মতো, পৃথিবীর মুখের উপর লুটিয়ে-পড়া এই রাশি রাশি অন্ধকারের মতো। অর্ধ-স্ফুট উচ্চারণ ক'রে সে বললে, 'অতসী, অতসী।' জীবনের কী দুর্লভ চরিতার্থতা—এই রাত্রিতে অতসীর নাম উচ্চারণ করতে পারা, অন্ধকারের

হৃদয়ের কাছে, তারাদের নিচে। তার হৃৎপিণ্ড যেন মূর্ছিত হ'য়ে পড়ছে আনন্দের দুঃসহ নিষ্ঠুরতায়। তার আর মুক্তি নেই—না, আর মুক্তি নেই। সমস্ত বাকি জীবন তাকে বাঁচতে হবে অতসীর মধ্যে, অতসীকে কেন্দ্র ক'রে, অতসীতে পরিপূর্ণ হ'য়ে। সমস্ত জীবন। আঃ, তাছাড়া আর উপায় নেই তার।

প্রমীলা, এদিকে, আশা ক'রে ছিলো যে রঞ্জন সেই সন্ধ্যাতেই তাদের বাড়িতে একবার আসবে। বাক্স-তোরঙ্গ খুলে জামা-কাপড় বার করতে-করতে, শাড়ির ভাঁজ খুলতে-খুলতে, বহুদিনের অব্যবহারে মলিন আশবাবপত্রের ভদ্র চেহারা ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করতে-করতে —সেই সদ্য-আগত বাড়ির বিশৃঙ্খল ব্যস্ততার মধ্যে ঘুরে বেড়াতে-বেড়াতে প্রতি মুহূর্তেই তার মন চঞ্চল হ'য়ে উঠছিলো প্রত্যাশায়। চায়ের পর সে বাইরের ঘরে গিয়ে বসলো পাখা খুলে দিয়ে। হাতে বই—খামকা ব'সে থাকাটা ভাল দেখায় না। মাঝে-মাঝে চোখ চ'লে যাচ্ছে সামনের ছোটো বাগান পার হ'য়ে রাস্তায়, বিকেলের সোনালি রোদে প্রসারিত। এমন শান্ত, বিকেলের গাঢ় হ'য়ে-আসা রোদে প্লাবিত এই ঘরবাড়ি, গাছপালা আর সবুজ প্রান্তর—এমন শান্ত, ছবির মতো। কোথায় যেন পাড়ার ছেলেমেয়েরা খেলা করছে, ভেসে আসছে জানলা দিয়ে তাদের উল্লাসের স্বর। প্রমীলা ব'সে-ব'সে বইয়ের পাতাগুলো উল্টিয়ে যেতে লাগলো অন্যমনে। সন্ধে হ'লো। ছোটো বোন উর্মিলা এসে বললে, 'বেড়াতে যাবে দিদি, বীণাদের বাড়ি ?'

প্রমীলা মাথা নেড়ে বললে, 'না—তুই যা।'

রীতিমতো বিয়ে

'আমি তো যাবোই—তুমি যাবে কি না তা-ই জিগেস করতে এসেছিলাম।'

অন্ধকার হ'য়ে এলো ঘর। পাশের বাড়ির ইনকম-ট্যাক্স অফিসারেব বারো বছরের মেয়েটা ইনিয়ে-বিনিয়ে নটরাজের গান গাইতে আরম্ভ করলে। তার প্রত্যুত্তরে একটু দূরে আর-এক বাড়িতে বেজে উঠলো হার্মোনিয়ম। পিঠের উপর ফেরতা দিয়ে আঁচল-জড়ানো একদল ইউনিভার্সিটির মেয়ে চ'লে গেলো রাস্তা দিয়ে। রাত হ'লো।

তখন প্রমীলা উঠলো, আলো জ্বাললো ঘরের। কোথায় কাগজ আর কলম—কে এখন খোঁজ করে। হাতে যে-বইটা ছিলো, তার প্রথম শাদা পাতাটার উপর পেন্সিল দিয়ে লিখলে :

'রঞ্জন : তুমি কি ভুলে গিয়েছো যে আজ আমাদের আসবার কথা? একবার এলে না কেন? সন্ধেটা একা ব'সে কাটিয়ে দিচ্ছি। আজ যদি আর না-ও পারো, কাল এসো—অবশ্য এসো। এখানেই চা খেয়ো বিকেলে। নিমন্ত্রণ রইলো তোমার।

মিলি'

পাতাটা ছিঁড়ে ভাঁজ ক'রে ছোটো ভাইকে ডেকে বললে, 'টুনু, লক্ষ্মী, এ-চিঠিটা চট ক'রে দিয়ে আয় তো রঞ্জনবাবুকে।'

টুনু ফিরে এলে পর প্রমীলা জিগেস করলে, 'দিয়ে এসেছিস চিঠি ঠিক?'

'ঠিক দিয়েছি, দিদি। তুমি আমাকে ভাবো কী?'

'রঞ্জনবাবু বাড়ি ছিলেন?'

'না তো।'

'তবে কাকে দিয়ে এলি ?'

টুন্নু একটু ভেবে বললে, 'তাঁর মা-কে।'

রঞ্জন বাড়ি ফিরে দেখলে তার মা-র মুখ ভয়ংকর গম্ভীর। অতি সামান্য কারণেই তাঁর মুখ গম্ভীর হয়, তাই সেটাকে সে আমলের মধ্যে আনা দরকার মনে ক'রে না। তা ছাড়া, বাইরের কোনো জিনিশ ভালো করে লক্ষ্য করবার মতো মনের অবস্থা তখন তার নয়। বাইরের জগৎ মিলিয়ে গেছে শূন্যতায়: সে মগ্ন তার নিজের মধ্যে, কোন নিগূঢ় স্বপ্নে, যন্ত্রণার মতো কোন আনন্দের চেতনায়। এই বাড়ি, তার চারদিককার জিনিশপত্র, খাট-চৌকি, অভ্যস্ত জীবনের যা-কিছু উপকরণ—সব যেন তার কাছে ঈষৎ অবাস্তব ঠেকছে, যেন এগুলো শুধু ধ'রে-নেয়া, মনে-হওয়া ব্যাপার—যেন এতদিন ধ'রে অবিচ্ছিন্নভাবে মনে ক'রে নেয়া হচ্ছে ব'লেই এরা আছে, এমন নিরেট-ভাবে আছে। কিন্তু যে-সূক্ষ্মতর অনুভূতির জগৎ আজ হঠাৎ রঞ্জনকে টেনে নিয়েছে নিজের মধ্যে, সেখানে, সেখান থেকে, এ-সব জিনিশ অস্পষ্ট, ছায়াময়—তাদের মনে-হওয়ার খোলশ থেকে মুক্ত হ'য়ে শূন্যতার মধ্যে বিলীয়মান। তাকে যে এখন খেতে বসতে হবে এ-ব্যাপারটাও রঞ্জনের কাছে একটু অসংগত ঠেকলো।

কিন্তু খেতে সে বসলো—খুব শিগগিরই বসলো। এ-সব অবান্তর এবং অনিবার্য ব্যাপারে যত কম সময় নষ্ট হয়, ততই ভালো। খাওয়া হ'য়ে গেলেই সে মুক্ত: তার উপর আর-কোনো দাবী নেই পৃথিবীর। খাওয়া হ'য়ে গেলেই সে একা: নিজেকে নিয়ে, এই রাত্রিকে নিয়ে একা। তার নিজের ঘরের নির্জনতায়। আঃ, পৃথিবীর

রীতিমতো বিয়ে

মুখের উপর নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করতে পারার আনন্দ! একা থাকবার উন্মাদনা, উন্মাদনা!

নিঃশব্দে খাওয়া সেরে উঠলো সে। একটি কথা, একটি কথা বললে না—পাছে সুর কেটে যায়, পাছে এই তীব্রতার এক কণা সে হারায়, একটি মুহূর্ত থেকে সে বঞ্চিত হয়; পাছে এই বিদ্যুৎ-প্রেরণার বিশুদ্ধতায় কোনো ফাঁকে কোনোরকম ভেজাল মেশে। নিশ্বাস ফেলতেও যেন তার ভয়।

খাওয়ার পরেই সে চ'লে যাচ্ছিলো উপরে, এমন সময় তার মা ডাকলেন, 'শোনো।'

সঙ্গে-সঙ্গে একটা আতঙ্কের ছায়া ফুটে উঠলো রঞ্জনের চোখে। না, এখন না, এখন না। কাল আমি সব শুনবো, যত নালিশ, যত উপদেশ, যত কান্না, যত খুশি তোমার। কিন্তু এখন না। পায়ে পড়ি তোমার, এখন রেহাই দাও আমাকে।

তবু সে নিজেকে বিপর্যস্ত হ'তে দেবে না; কঠিন চেষ্টায় নিজেকে গুছিয়ে রাখবে, ধ'রে রাখবে জমাট ক'রে; তার অন্তরের সৌরকেন্দ্র থেকে ভ্রষ্ট হবে না সে। খুব মৃদুস্বরে সে বললে, 'কী?'

'শোনো, কথা আছে,' ব'লে মৃণালিনী তাঁর নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। রঞ্জন গেলো তাঁর পিছনে, না-গেলেই কথা-কাটাকাটি।

মৃণালিনী তাঁর হাত-বাক্স থেকে ছোটো ভাঁজ-করা এক টুকরো কাগজ বের ক'রে বললেন, 'এই নাও।'

রঞ্জন ভাঁজ খুলে সেটা পড়লো, কিছু বললো না। কাগজটা ধরা রইলো তার হাতে।

হে বিজয়ী বীর

মৃণালিনী বললেন, 'এ-সব কী ?'

রঞ্জন নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো। ঈশ্বর, ঈশ্বর, আমাকে শক্তি দাও, শান্তি দাও। আমি যেন নিজেকে হারিয়ে না ফেলি, নিজেই নিজেকে ধ্বংস না-করি যেন। এখন, এখন কেন? সমস্ত জীবন তো প'ড়ে আছে বাদ-বিসংবাদের জন্য, নিজের ভগ্নাংশের স্তূপের মধ্যে গড়াগড়ি যাবার জন্য। এই একটুখানি সময় আমাকে অক্ষুণ্ণ রাখো, সম্পূর্ণ রাখো: এই একটি রাত্রি আমাকে দাও।

'কেন, হয়েছে কী ?'

'কী হয়েছে ? বুঝতে পারো না কিছু ?'

হাসবার একটা অত্যন্ত দুর্বল চেষ্টা ক'রে রঞ্জন বললে, 'কেন, দোষ হয়েছে কী ?'

'তোমার কি একটু লজ্জাও নেই ?'

রঞ্জনের একবার চোখের পাতা পড়লো। কিন্তু নিজেকে ঢিল দিলে তা'র চলবে না: সহ্য তাকে করতেই হবে, রাখতেই হবে নিজেকে সংহত ক'রে। 'কেউ কাউকে চা খেতে বললে দোষ কী ?'

'চা খেতেই তো বটে! এ-সব ইয়ার্কি তুমি কবে থেকে শিখলে শুনি ?'

'মা—'

'তোমার কাছ থেকে আমি এ-সব আশা করি নি। তোমার বাবা তোমাকে অনেক যত্নে শিক্ষা দিয়েছিলেন—'

'চুপ করো, মা, চুপ করো!'

'আজ তিনি নেই, তাই তোমার এত বাড় বেড়েছে!'

'মা, তুমি বুঝতে পারছো না—'

'সবই আমি বুঝতে পারছি। ওরা আজ মাত্র এসেছে—আজই তোমাকে এ-রকম চিঠি লেখে! এ-স্পর্ধা কেমন ক'রে হয় মেয়েটার তা শুনি?'

রঞ্জনের বুকের ভিতর আস্তে-আস্তে একটা বাঁধ যেন ভেঙে যাচ্ছিলো। আর সে নিজেকে ধ'রে রাখতে পারছে না, শিথিল হ'য়ে আসছে তার শরীরের গাঁটগুলো। গেলো বুঝি ভেসে।

'কেমন ক'রে, তার আমি কী জানি!' নিজের অজান্তেই তার গলার স্বর চড়লো, 'ওরা তো এখানে ছিলোই না—'

'চিঠি-লেখালেখি করছো!' মৃণালিনী উত্তর দিলেন।

'না, করিনি।'

'প্রমাণ রয়েছে।'

'যদি ক'রেই থাকি, তাতে হয়েছে কী? মানুষ মানুষকে চিঠি লিখতেও পারে না ইচ্ছে করলে?'

'তুমি জানতে,' কঠিন, ঠাণ্ডা কণ্ঠস্বরে মৃণালিনী ছেলেকে অভিযোগ বর্ষণ করলেন, 'তুমি জানতে ওরা আজ আসছে—অথচ আমি যখন তোমাকে বললুম, তুমি এমন ভান করলে যেন কিছু জানোই না। তোমার মনে যদি কিছু না-ই থাকবে তাহ'লে এই মিথ্যা কেন?'

হঠাৎ রক্ত উঠে এলো রঞ্জনের মাথায়। তার মনের সমস্ত বাঁধ এলো আলগা হয়ে; তীব্রস্বরে সে ব'লে উঠলো, 'তুমি ব'লেই ত মিথ্যার দরকার। তোমার মনে এত সন্দেহ—'

'হ্যাঁ, এই তো তুমি শিখেছো, মা-কে নির্যাতন করা! মনে রেখো, তোমার বাবা স্বর্গ থেকে দেখছেন।'

হে বিজয়ী বীর

'বার-বার ঐ এক কথা' যে ম'রে গেছে, তাকেও কি তুমি শান্তি দেবে না?'

'কী!' মৃণালিনীর শরীর কেঁপে উঠলো। 'এমন কথাও বলতে পারলে তুমি! বলতে পারলে! তোমার বাবার স্মৃতির অপমান করতেও বাধলো না তোমার!' বলতে-বলতে, কাঁপতে-কাঁপতে মৃণালিনী ব'সে পড়লেন, তারপর দু-হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে।

আর রঞ্জনের রাত্রি চুরমার হয়ে ভেঙে পড়লো এক টুকরো রঙিন কাচের মতো, সে আছাড় খেয়ে পড়লো সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে। সে ম'রে গেছে, তার সমস্ত মন পাষাণ হ'য়ে গেছে।

আর পরের দিন সে তার মা'র উপর, নিজের উপর প্রতিহিংসা নিলে—গেলো প্রমীলার নিমন্ত্রণ-রক্ষা করতে। সাজগোজ ক'রে খুব ঘটা ক'রেই বেরিয়ে গেলো তার মা-র নাকের তলা দিয়ে। মৃণালিনী চুপ।

বসবার ঘরে কেউ ছিলো না: রঞ্জন একটা সোফায় ব'সে অপেক্ষা করলো। মা-কে জব্দ করবার উৎসাহের আতিশয্যে সে বোধহয় একটু আগেই এসে পড়েছে।

খানিক পরে ঘরে এলো প্রমীলা। থমকে দাঁড়ালো দরজার কাছে রঞ্জনকে দেখে। রঞ্জন উঠে দাঁড়ালো।

'এ কী! কখন এলে তুমি?'

'একটু আগেই এসে পড়েছি ব'লে মনে হচ্ছে।'

'বাঃ! এখানে ব'সে আছো কেন? বাড়ির ভিতরে যেতে পারলে না?'

রীতিমতো বিয়ে

'এখানে বেশ লাগছিলো।'

'কী অন্যায় তোমার! বাইরের ঘরে এসে ব'সে আছো! যদি এখন আমি না আসতুম?'

'অন্য কেউ আসতো।'

প্রমীলা হেসে বললে, 'দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বোসো। ছাখো—পাখাটাও খোলোনি! এ-ঘরটায় আবার যা রোদ আসে বিকেলে।' প্রমীলা পশ্চিমেব জানলাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে পাখা খুলে দিলে। তারপর বসলো এসে রঞ্জনের কাছে।

'যাক, তবু যে আসতে পারলে। কেমন আছো?'

'তুমি কেমন আছো?'

প্রমীলা রঞ্জনের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বললে, 'এ-ক'মাসেই তোমার মুখটা কেমন বুড়ো-বুড়ো হ'য়ে গেছে।'

'বয়স বাড়ছে আমাদের সবারই,' রঞ্জন লঘুস্বরে বললে। তারপর একটা রসিকতা করবার লোভ সামলাতে পারলে না, 'তোমার ছাড়া।' কথাটা এমন লাগসই, এমন সুন্দর, প্রসঙ্গক্রমে এমন অনিবার্য, এত সহজে তা উঠে আসে মুখে, এত ভালো শোনায় যে—মোটের উপর, কথাটা না-বলা অসম্ভব।

'যাওঃ!' প্রমীলার গাল একটু লাল হ'লো। 'একটু চুপ করো তো, তোমাকে দেখি ভালো ক'রে।'

প্রমীলার দৃষ্টির সামনে রঞ্জন নিজেকে সমর্পণ করলে।

'কাল আসোনি কেন?' একটু পরে প্রমীলা জিগেস করলে।

'আসতে পারিনি।'

'কেন ?

'কাজ ছিলো।' ব'লেই মনে পড়লো এই কথাটা অন্য একদিন অন্য একজনকে বলেছিলো।

'কী কাজ ?'

'তাও বলতে হবে ?'

'কাল তুমি যখন এলে না—' প্রমীলা হঠাৎ থেমে গেলো। জিগেস করলে, 'আমার চিরকুট কখন পেয়েছিলে ?'

'রাত্রে।' ব'লেই তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলো, 'কল্‌কাতা কেমন আছে বলো।'

'গেলে না তো একবার।'

'সেইজন্যই জিগেস করছি।'

প্রমীলা কাঁধের একটা দুর্লক্ষ্য ভঙ্গি করলে।—'নতুন কিছুই নেই।'

'নতুন!' রঞ্জন ঈষৎ নাটকীয়ভাবে হাত ঘোরালো। নিজেকে সে খুব উপভোগ করছিলো, নিজের উপর এই প্রতিহিংসা। মিলি তাকে যে-পার্টে দেখতে আশা করছে, সেই পার্টই সে নেবে—জীবন সম্বন্ধে ঈষৎ-বিতৃষ্ণ সুসভ্য যুবক, ঈষৎ ক্লান্ত, সেই বিতৃষ্ণা আর ক্লান্তি হাতের আঙুলের আংটির মতো প'রে রয়েছে, আর থেকে-থেকে তা থেকে ঠিকরে পড়ছে চমক-লাগানো কথার ছটা। মজা মন্দ না—মিলির সঙ্গে এই খেলা, তাকে নিয়ে এই খ্যাপানো, আর সে—বোকা মেয়ে!—তা জানতেও পারছে না! মেয়েরা এক-এক সময় কী বোকাই হ'তে পারে! 'নতুন কিছু কোনখানেই বা কী আছে!' মানানসই উদাসীনতার সুরে সে বললে।

রীতিমতো বিয়ে

'নতুন খোঁজবারই বা কী দরকার। যা আছে, তা-ই তো যথেষ্ট—যথেষ্ট ভালো।'

'তা-ই মনে হয় তোমার?'

'তোমার হয় না?' তারপর, রঞ্জনকে নীরব দেখে: 'চুপ ক'রে আছো কেন? বলো না।'

'ভাবছিলুম, কী বলি।'

'ওঃ, চিন্তাশীল!' ঠাট্টা করলে প্রমীলা।

রঞ্জন তার ঘনসন্নিবিষ্ট উজ্জ্বল দাঁত বের ক'রে হাসলো।—'তোমার মতো সহজাত বোধের ক্ষমতা সকলের থাকে না।' ভালো হয়েছে কথাটা, রঞ্জন খুশি হ'লো মনে-মনে। কী সহজ মিলির মতো মেয়েকে আকাশে তোলা!

'যেমন তোমাব ঠাট্টা করার ক্ষমতা অতুলনীয়,' জবাব দিলো মিলি।

এই গোছের হালকা, পিংপং আলাপ চললো খানিকক্ষণ। চায়ের সময় হ'য়ে এলো। মিলি উঠে বললে, 'একটু বোসো তুমি, আমি এই এলুম ব'লে।'

প্রমীলা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ামাত্র রঞ্জন যেন অবসাদে ভেঙে পড়লো। ভালো লাগে না—আর এ-সব ভালো লাগে না—কেনই বা সে এসেছিলো। এরই মধ্যে সে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে; তার ভিতর থেকে যেন ঠেলে উঠছে একটা আধ্যাত্মিক ঝঙ্কার। ভারি বীরত্বের কাজ সে করছে—মা-র সঙ্গে জেদ ক'রে ব'সে আছে এখানে এসে। কাকে সে জব্দ করেছে? সবচেয়ে বড় লাঞ্ছনা

তার নিজেরই তো! আর, এই তো বিকেল হ'য়ে এলো—এ-সময়ে অতসীর সঙ্গে থাকা, অতসীর সঙ্গে! তাকে দেখা, তার কণ্ঠস্বর শোনা, তার কাছাকাছি চুপচাপ ব'সে থাকা! হয়তো সে ব'সে আছে তা'র অপেক্ষায়—আর পাপড়ির পর সোনার পাপড়ি, মুহূর্তে-মুহূর্তে খ'সে পড়ছে এই বিকেল। আর, কী ক'রে, কী ক'রে সে এখানে ব'সে থাকতে পারছে? এখনো সময় আছে, এখনো। সবে তো বিকেল ছড়িয়ে যাচ্ছে আকাশ ভ'রে—এখনো সে এমন সময়ে গিয়ে পৌঁছতে পারে যখন তাদের কাঁঠাল গাছের ফাঁক দিয়ে সোনালি আলোর রেখা এসে খেলা করছে অতসীর চুলে। সদ্য-ঝাট-দেয়া ঘর তকতকে পরিষ্কার; নিচু হ'য়ে সে মা-র বিছানা পাতছে, বালিশে-চাদরে রোদের গন্ধ। রঞ্জনের দিকে একবার তাকিয়ে সে কাজ করতে থাকবে, কোনো কথা বলবে না। শুধু, ক্ষীণ একটি হাসি তার ঠোঁটের উপর। ওঃ, তার ঠোঁটের সেই একটু রেখার জন্য,—রঞ্জন মরতে পারে, হাজারবার মরতে পারে।

উঠে দাঁড়ালো রঞ্জন। যেতে হবে, তাকে যেতেই হবে। আমি আসছি, অতসী, আমি আসছি। তোমার মুখ আমাকে দেখতেই হবে, তোমার ঠোঁটের সেই রেখা।

রঞ্জন দরজা পর্যন্ত এসে পড়েছিলো, এমন সময় প্রমীলা পিছন থেকে তাকে ডাকলো, 'যাচ্ছো কোথায়?'

রঞ্জন থমকে দাঁড়ালো, বোকার মতো থেমে গেলো। ফিরে তাকিয়ে কথা বলতে পারলো না। উপস্থিত সময় আর পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে একটু সময় লাগলো তার। অল্প একটু।

তারপর বললে, 'ভাবছিলুম তোমাদের বাগানটা একবার দেখে আসি।'

'বেশ, চলো!' খুশি হ'লো প্রমীলা। 'চায়ের এখনো একটু দেরি আছে।' সে, ইতিমধ্যে, হাতমুখ ধুয়ে শাড়ি বদ্‌লে এসেছে। পরেছে কালো চীনে সিল্কের শাড়ি—তাতে আরো উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটেছে তার দেহবর্ণের শুভ্রতা। রঙিন লতার পাড় পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে উঠে এসেছে তার পায়ের পাতা থেকে, কোমর পার হ'য়ে, বুকের উপর দিয়ে—তারপর কাঁধ বেয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে পিঠের উপর, দীর্ঘ পথশেষের ক্লান্তিতে। একটু দ্বিধার পর সে তার গলায় এঁটে নিয়েছিলো একটি মালা—বাঁকা টেরচা নানা আকৃতির ও নানা রঙের কতগুলো পাথরের কুচি একসঙ্গে গাঁথা—শাড়ির পাড়ের সঙ্গে মিলিয়ে।

দু-জনে নেমে এলো বাগানে। প্রমীলা বললে, 'নষ্ট হ'য়ে গেছে সব। এতদিন কেউ ছিলো না—মালিটা প্রাণ ভ'রে কুড়েমি করেছে।'

'ফাঁকি দিতে পারলে আমরা কে-ই বা ছাড়ি?'

'ওদিকটায় চলো—কয়েকটা গোলাপের চারা ছিলো।'

লম্বা-লম্বা ঘাসের উপর দিয়ে হেঁটে তারা বাগানের একপ্রান্তে এসে দাঁড়ালো। শুকনো, ছোটো-ছোটো কয়েকটা গোলাপের চারা, পাতা খ'সে পড়ছে, বড়ো শ্রীহীন দেখতে। শুধু একটা গাছে, যেন দৈবের কোনো বিশেষ অনুগ্রহে ফুটে রয়েছে নিঃসঙ্গ একটি হলদে গোলাপ।

'বাঃ,' রঞ্জন ব'লে উঠলো, 'কী সুন্দর গোলাপ।'

'দাঁড়াও—ওটা দিচ্ছি তোমাকে তুলে।'

'না, না,' রঞ্জন তাড়াতাড়ি বাধা দিলে, 'খামকা ওটা ছিঁড়ো না।'

হে বিজয়ী বীর

'খামকা তো নয়, তোমার জন্য।'

'আমার জন্য?' রঞ্জন হেসে কথাটা হালকা করার চেষ্টা করলে, 'কী করবো আমি ফুল নিয়ে?'

একটি চূর্ণকুন্তল দাঁতের ফাঁকে চেপে ধরলো প্রমীলা। 'যা খুশি কোরো। ফেলে দিয়ো।' ব'লে রঞ্জনের মুখের উপর ভরা-চোখে একটু তাকিয়ে থাকলো।

রঞ্জন নিরুপায় হ'য়ে তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলো, 'কী যে বলো! কিন্তু এ-ফুল তোমার খোঁপাতেই মানাবে বেশি।'

'থাক, আর বলতে হবে না।' প্রমীলা হেসে ফেললো। তার দাঁতের ফাঁক থেকে স্খলিত হ'য়ে চুলের গোছা লুটিয়ে পড়লো বুকের উপর। নীচু হয়ে অতি সন্তর্পণে সে ছিঁড়ে আনলে ফুল। তারপর মুখ তুলে বললে, 'নাও।'

তার হাত থেকে গোলাপটা নিতে গিয়ে রঞ্জন একটু তাকিয়ে রইলো—তার মুখের দিকে, তার গলার মালার কোণাচে পাথরের দিকে, তার মিশকালো শাড়ির রঙিন লতার মতো পাড়ের দিকে। তারপর, যেহেতু সে ভালো ক'রে কথা বলতে পারে, যেহেতু ঠিক সময়ে, ঠিক জায়গায়, ঠিক কথাটি স্বতই উঠে আসে তার মুখে, যেহেতু সামাজিক জীবনে যে যেমন আশা করে, তার সঙ্গে তেমনি ব্যবহার করতে সে অভ্যস্ত, যেহেতু অতি-মার্জিত সভ্যতার পরিবেষ্টনীতে সে লালিত, এবং যেহেতু তার ছিলো সহজ হাস্যরসবোধ—এইসব কারণে, প্রায় নিজেরই অজান্তে, প্রায় অভ্যেসের অর্ধচেতন প্রেরণায় সে ব'লে ফেললো, 'ফুলের বাগানে ফুলের বাগান।'

রীতিমতো বিয়ে

'দুষ্টু!' প্রমীলা মুখ ফিরিয়ে নিলে।

তারপর চা। চায়ে সমস্ত পরিবার উপস্থিত। প্রমীলার মা তার পিতৃবিয়োগ সম্বন্ধে দু-একটা সান্ত্বনার কথা বললেন রঞ্জনকে। প্রমীলার দাদা নীহার—সে আইন পাশ করবার পর ইংরেজি কাপড়চোপড়ের ফরমাশ দিয়েছে, ছুটির পরেই যাতায়াত শুরু করবে হাইকোর্টে—তাকে জিগেস করলে ভবিষ্যতে সে কী করবে।

'কিছু একটা করতেই হবে,' বললো রঞ্জন।

'কোনো সরকারি পরীক্ষা-টরীক্ষা—'

'দেখি।' সত্যি বলতে, এ-সব বিষয়ে সে কিছুই ভাবেনি, ভাববার দরকার হয়নি কখনো। আর দরকার হ'লেই বা ভেবে লাভ কী? ভবিষ্যৎ তো অনেক দূরে, এই নিবিড়, উজ্জ্বল, সর্বব্যাপী বর্তমান—তার মধ্যে বাঁচাই যথেষ্ট।

কেশববাবু জিগেস করলেন, 'তুমি বিলেত যাবে না?'

'কী হবে গিয়ে?'

'হবে না! যে-রকম দিনকাল, বিলেত না-গেলে তেমন কী আর হবে তোমার!'

রঞ্জন বলতে যাচ্ছিলো, 'না-ই বা হলাম তেমন কিছু!' কিন্তু শেষ মুহূর্তে সে সামলে গেলো। কথাটা বড্ড বেসুরো শোনাতো এখানে।

'তুমি এমন ব্রিলিয়্যাণ্ট ছেলে—তোমার তো বিলেতে যাওয়াই উচিত।'

'ব্যারিস্টার হ'য়ে আসুন না,' বললে নীহার।

'দেখি—' অস্পষ্ট উত্তর রঞ্জনের।

'নয়তো,' কেশববাবু বললেন, 'যদি প্রোফেসরিই করতে চাও, অক্সফোর্ডের মডার্ন গ্রেটস-এর মতো আর কিছু না। আমার তো মনে হয় তুমি একটু চেষ্টা করলেই একটা ফার্স্ট পেতে পারো।'

'দেখি, এম. এ.-টা হ'য়ে যাক তো।'

'তোমার মা কী বলেন ?'

'মা আর কী বলবেন।'

'তোমার নিজের কী ইচ্ছে ?'

'আমার !' রঞ্জন একটি পেঁপের টুকরোকে খামকা কাঁটা দিয়ে বিঁধতে লাগলো, 'আমি তো কিছু ভাবিনি এখনো—'

'প্রথম থেকে কিছু একটা ঠিক ক'রে নেয়াই ভালো,' কেশববাবু বললেন।

'দেশের যা অবস্থা,' নীহার বললে, 'কোনো সুযোগই আজকাল ছাড়তে নেই।'

তিনজন পুরুষ দেশের বর্তমান দুরবস্থা দিয়ে আলাপ করলো।

চায়ের পর বসবার ঘরে ফিরে এসে প্রমীলা বললে, 'কী করা যায় এখন ?'

'সে-বিষয়ে,' রঞ্জন বললে, 'তোমাকে পরামর্শ দিতে যাওয়া স্পর্ধা।'

'একটু পরেই পাশের বাড়ির একটা মেয়ে হৃদয়-বিদারক গান গাইতে শুরু করবে। সে-তারস্বর যাতে তোমার কানে ঢুকতে না পারে, সেই জন্য নিজেই একটা গান গাইবো কি ?'

উর্মিলা সেখানে ছিলো, ব'লো উঠলো, 'ওঃ, সেইটে গাও দিদি, সেই যে—'

প্রমীলা বোনের উদ্দেশে কটাক্ষপাত ক'রে বললে, 'তুই থাম। তুমি কী বলো?'

রঞ্জন বললে, 'মিলি, পাশের বাড়ির মেয়ের সংগীত-শ্রবণে আমার আত্মায় দারুণ যন্ত্রণা হবে, এটা অনুমান ক'রে নিয়ে তুমি আমাকে যে সম্মান করেছো, তার প্রতিদানে এ-কথা আমাকে বলতেই হবে—'

প্রমীলা হেসে উঠলো।—'উঃ, থামো, থামো! না-হয় না-ই গাইলুম।'

'বাঃ, গাইবে না! তা কি হয়!'

উর্মিলা ব'লে উঠলো, 'দিদি একটা যা নতুন গান শিখেছে—চমৎকার।'

'বললেন এক কথা! ভারি তুই বুঝিস চমৎকারের। কোনটা বল তো।'

শেষ পর্যন্ত গাওয়া হ'লো সেইটেই। তারপর উর্মিলা গাইলো একটা, তারপর দু-বোনে মিলে আর-একটা। পাশের বাড়ির মেয়ে আত্মধিক্কারে চুপ করেছে অনেক আগেই। রঞ্জন হাই চেপে ব'সে থাকলো।

গান শেষ ক'রে প্রমীলা বললে, 'খুব খানিকটা বিরক্ত করা গেলো তোমাকে।'

রঞ্জন জবাব দিলে, 'গান যে আমি কত ভালোবাসি, আজই প্রথম বুঝলুম।'

প্রমীলা তরল দৃষ্টিতে রঞ্জনের দিকে তাকালো।

বিদায়ের সময় হলো এবার। প্রমীলা এলো সঙ্গে-সঙ্গে বাগানের দরজা পর্যন্ত। 'কাল আবার আসবে তো?'

হে বিজয়ী বীর

রঞ্জন চিন্তিতমুখে বললে, 'কাল সন্ধেয় তো আমাকে যেতে হবে উকিলের বাড়ি।'

'উকিলের বাড়ি কেন?'

'আর বোলো না!' রঞ্জন তখনই কারণটা উদ্ভাবন করলো, 'বাবার একটা ইনশিওরেন্স-পলিসি নিয়ে হাঙ্গামা বেধেছে—ভালো লাগে না আমার এ-সব।'

'তাহ'লে পরশু?'

'খুব ইচ্ছে থাকলো।'

কিন্তু পরশু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হ'লো না। পরের দিনই বিকেলে, রঞ্জন যখন বাইরের ঘরের দরজা ভেজিয়ে দাড়ি কামাচ্ছে, দরজার বাইরে শোনা গেলো খটাখট' জুতোর আওয়াজ, হাসি আর কথার মিশ্রণ, তারপর এক ধাক্কায় দরজা খুলে হুড়মুড় ক'রে ঢুকে পড়লো প্রমীলা আর উর্মিলা।

রঞ্জনকে দেখেই প্রমীলা ব'লে উঠলো, 'এই যে।'

রঞ্জনের হাতের উদ্যত ক্ষুরটা ক্ষণকাল স্থির হ'য়ে রইলো। মুখে হাসি টেনে বললো, 'কী ব্যাপার?'

'চলো শিগগির।'

'কোথায়?'

'আমরা সিনেমায় যাচ্ছি—একটা খু-উ-উ-ব ভালো ছবি নাকি এসেছে। তুমি চলো আমাদের সঙ্গে।'

রঞ্জন গলায় একটা উল্টো পোঁচ দিয়ে বললে, 'আমি তো যেতে পারবো না।'

রীতিমতো বিয়ে

'বাঃ, তুমি না গেলে চলবে কী ক'রে? আমরা যে ঠিক ক'রে রেখেছি যে তুমিও যাবে। চলো—দাড়ি-কামানো সেরে নাও শিগগির। দাদা বাইরে অপেক্ষা করছেন গাড়ি নিয়ে।'

'আসতে বলো না তাঁকে ভিতরে।'

'না, না—একবার গল্প করতে বসলেই হয়েছে। ও কী—আবার সাবান ঘষছো কেন? শিগগির করো!'

রঞ্জন আয়নার দিকে তাকিয়ে বললে, 'আমার যে কাজ রয়েছে—'

'রাখো কাজ! উকিলের বাড়ি কাল গেলেও চলবে তোমার। তোমাকে নিয়ে যাবো ব'লে এলুম—আর তুমি যাবে না?'

'আর একদিন না-হয়—'

'না, আজই, আজই! কোনো কথা শুনবো না—যেতেই হবে তোমাকে।'

পাশের ঘর থেকে মৃণালিনী শুনলেন, রঞ্জন কার সঙ্গে যেন কথা-কাটাকাটি করছে। মেয়ের গলা। তিনি আর থাকতে পারলেন না, চলে এলেন সে-ঘরে। প্রমীলা আর ঊর্মিলা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলো তাঁকে দেখে। দু-বোনে প্রণাম করলো তাঁকে।

প্রমীলা অতি মধুর স্বরে জিগেস করলে, 'কেমন আছেন, মাসিমা?' তারপর, তাঁকে কোনো কথা বলবার সময় না-দিয়েই: 'কালই ভাবছিলুম, আপনাকে একবার দেখতে আসবো—হ'য়ে উঠলো না।'

'তোমার মা ভালো আছেন?'

'মা ভালোই আছেন। কিন্তু আপনার শরীরটা তেমন ভালো দেখছি না।'

'আর শরীর!' বিধবা অবস্থায় কেউ তাঁকে প্রথম দেখছে, এ-কথা মনে করতে তাঁর গলা বুজে এলো। ছলছলিয়ে উঠলো চোখ। প্রমীলা একটু চুপ ক'রে রইলো। তারপর খুব আস্তে বললে, 'মা আসবেন আপনার কাছে শিগগিরই। বাড়ি-ঘর সব এখনো গুছিয়ে উঠতে পারেননি, তাই—'

মৃণালিনী মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চোখ মুছলেন। তারপর বললেন, 'উমি দেখছি মস্ত বড়ো হ'য়ে গেছিস এরই মধ্যে। বোস।'—

'আর-একদিন এসে বসবো, মাসিমা, আজ আমরা একটু বেরোচ্ছি।'

'বেড়াতে যাচ্ছো?'

'যাচ্ছি সিনেমায়। আপনার ছেলেকেও নিয়ে যাচ্ছি,' প্রমীলা একটু হাসলো, 'ফিরিয়ে দিয়ে যাবো ঠিক ন-টার মধ্যে, ভাববেন না।'

মৃণালিনীর মুখের উপর একটা ছায়া পড়লো। মনের ভাব গোপন করতে ভদ্রমহিলা একেবারেই পারেন না। দাড়ি-কামানো সেরে ক্ষুরটা বাক্সে তুলে রাখতে-রাখতে রঞ্জন তা লক্ষ্য করলো। কিন্তু নিজের উচ্ছ্বাসে প্লাবিত, প্রমীলার কিছুই চোখে পড়লো না। 'দেখুন তো, মাসিমা,' সে ব'লে চললো, 'ও কেন যেতে চাইছে না আমাদের সঙ্গে? আপনি একটু বলুন না ওকে।'

'তুমি বলাতেই যখন যেতে চাইছে না, আমি বললে কি আর যাবে?' মৃণালিনীর কথায় একটা তির্যক সুর বেজে উঠলো।

প্রমীলা আরো যেন কী বলতে যাচ্ছিলো, হঠাৎ মৃণালিনীর মুখের

দিকে তাকিয়ে থমকে চুপ ক'রে গেলো। মৃণালিনী আবার বললেন, 'আমার ছেলের কি ইচ্ছা আর অনিচ্ছা, তা তুমিই তো সবচেয়ে ভালো জানো, মিলি, আমাকে কেন জিগেস করছো।'

প্রমীলা একবার তাঁর মুখের দিকে, একবার রঞ্জনেব মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে রইলো। ম্লান হয়ে গেলো তার মুখ।

রঞ্জন আরম্ভ করলো, 'মা, তুমি—'

কিন্তু কথা শেষ করতে পারলো না। তার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে মৃণালিনী ঠাণ্ডা, শান্ত গলায় বললেন, 'রঞ্জন, তুমি এতদূর নামতে পারো, তা আমি কোনোদিন ভাবিনি।' ব'লে তিনি দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মুহূর্তের স্তব্ধতা। তারপর রঞ্জন প্রমীলার কাছে এসে আস্তে বললে, 'তোমরা গাড়িতে গিয়ে বোসো, মিলি, আমি আসছি এক্ষুনি।'

সিনেমায় যখন ইণ্টার্ভেল এলো, উর্মিলা দাদার সঙ্গে বাইরে গেছে আইস-ক্রীম খেতে, রঞ্জন খুব নিচু গলায় বললে, 'বাবার মৃত্যুর পর মা যেন কেমন হয়ে গেছেন। মিলি, তুমি কিছু মনে কোরো না।'

মিলি চোখ মেলে রঞ্জনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো চুপ ক'রে। একটু পরে বললে, 'পাগল!'

গেলো এক সপ্তাহ। রঞ্জনের বাড়ির আবহাওয়ায় গুমোট। মা-ছেলের মধ্যে ঝলসাচ্ছে বিরোধের অদৃশ্য বিদ্যুৎ। কেউ কারো সঙ্গে ভালো ক'রে কথা কয় না।

তারপর কোনো-এক রাত্রে, মৃণালিনীর শুয়ে-শুয়ে অনেকক্ষণ ঘুম এলো না। ছেলের মন যদি প'ড়েই থাকে, আর কি তাকে ফেরানো যাবে

এখন? কতদিন আর সইবে এই টানা-হেঁচড়া? কী লাভ হবে এতে? ছেলে যদি গোপনে কিছু ক'রে বসে, যদি কোনো কেলেঙ্কারি—ভগবান না করুন, ভগবান না করুন। তার চেয়ে···তা মন্দই বা কী। মিলি মেয়েটি ভালোই তো—সবদিক থেকে দেখতে গেলে। দেখতে মন্দ না—সুন্দরী নয় অবশ্য, কিন্তু মন্দই বা কী? একমাত্র ছেলে তাঁর—মনে-মনে তিনি তার জন্য রীতিমতো রূপসী কল্পনা ক'রে রেখেছিলেন। কিন্তু সব কি আর ইচ্ছেমতো হয়। ভাবি তো আমরা অনেক-কিছুই, আশা তো কতই করি। তা চেহারা ভালো না-ই বা হ'লো, বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে, গুছিয়ে চালাতে পারবে সংসার। বয়স একটু বেশি, কিন্তু তেমন অল্প বয়সে আজকাল ক-টা বিয়েই বা হয়। মোটের উপর, কেউ যদি তাঁর কাছে এসে এটা উত্থাপন করতো, তিনি হয়তো মত করতেন না, কিন্তু এমন যদি হয় যে ছেলে তাঁর মতের অপেক্ষা না-রেখেই—তার চেয়ে মত দিয়ে ফেলাই অনেক ভালো—, অনেক ভালো। তাছাড়া, যে-রকম মতিগতি দেখছেন ছেলের, এখন বিয়ে হওয়াই দরকার। বিয়ে হ'লেই মাথা ঠাণ্ডা হবে। তা-ই হোক তবে, তা-ই হোক, অশান্তি আর ভালো লাগে না।

পরদিন তিনি এই চিঠি লিখে প্রমীলার মা-কে পাঠালেন:

'প্রিয় ভগিনী,

আমি জানতে পেরেছি আমার পুত্র শ্রীমান রঞ্জন আপনার জ্যেষ্ঠ্য কন্যাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক। আমার কোন আপত্তি নাই। যদি আপনাদের সম্মতি থাকে, আগামী অঘ্রানেই শুভকর্ম সম্পন্ন হ'তে পারে। এ-বিষয়ে যথাকর্তব্য আপনারা করলে বাধিত হবো, আমার শরীর বড়ো ক্লান্ত। ইতি—

মৃণালিনী দেবী।'

রীতিমতো বিয়ে

এ-চিঠি পেয়ে প্রমীলার বাড়ির কেউ অবাক হলেন না, তাঁরা জানতেন। এই জন্যই, সত্যি বলতে, তাঁদের এবার ঢাকায় আসা। দু-একদিনের মধ্যে তাঁরাই ভাবছিলেন মৃণালিনীর কাছে প্রস্তাব ক'রে পাঠাবেন। রঞ্জনের সঙ্গে মিলির বিয়ে দেবার ইচ্ছে তাঁদের বরাবর। আর মিলিও যে সেটা টের পায়নি, তা নয়। ভালোই হ'লো। ব্যাপারটা যে এত সহজে হবে, তা তাঁরা আশাও করেননি।

পরের দিনই দুপুরবেলায় মিলির মা এলেন। দুই মায়ে কথা হ'লো অনেকক্ষণ। রঞ্জন তখন তার দোতলার ঘরে ঘুমুচ্ছে। দু-দিন বাদে এক ফাঁকে মৃণালিনী গিয়ে নিয়ম-মাফিক 'দেখে' এলেন মিলিকে। রঞ্জন তখন আড্ডা দিচ্ছে বন্ধুদের নিয়ে।

তারপর রাত্রে, রঞ্জন যখন খেয়ে উঠে দক্ষিণের জানলার ধারে ইজি-চেয়ারে বসেছে, তিনি এসে বললেন, 'তুমি যা চাও, তা-ই হবে।'

'কী হবে?' বুঝতে না-পেরে রঞ্জন তাকিয়ে রইলো।

'তুমি যা চাও', মৃণালিনী আবার বললেন, 'তুমি যা চাও। আর তুমি আমাকে দোষ দিয়ো না, মিলির সঙ্গেই তোমার বিয়ে ঠিক করেছি। তুমি সুখী হও।'

রঞ্জন প্রবল বেগে খাড়া হ'য়ে উঠে বসলো।—'কী বললে?' তার চোখ বিস্ফারিত হ'লো, নিশ্বাস পড়লো জোরে-জোরে।

'বুঝতে পারছো না? এর জন্যে এত—আর এখন বুঝতে পারছো না?'

রঞ্জনের মনে হ'লো, হঠাৎ যেন পৃথিবীর সমস্ত হাওয়া মরে গেছে। লোপ পেয়েছে বিশ্ব। হাঁপাতে-হাঁপাতে বললে, 'কী বললে? মিলির সঙ্গে—'

'হ্যাঁ, মিলির সঙ্গে, মিলির সঙ্গে। যার জন্যে মা-র মনে কষ্ট দিতে তোমার বাধেনি। যার জন্যে—'

'এ করেছো কী?' রঞ্জনের গলা ভেঙে গেলো।

'কেন, এ-ই তো তুমি চাও।'

'আমি চাই!'

'চাও না?'

'তুমি পাগল হয়েছো?' বলতে-বলতে রঞ্জন উদ্‌ভ্রান্তভাবে উঠে দাঁড়ালো, 'তুমি পাগল হয়েছো? এ-বিয়ে হওয়া অসম্ভব।'

একটু সময়, মৃণালিনী কঠিন দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'দ্যাখো, অনেক সয়েছি, আর পারি না। আর ছেলেমানষি কোরো না। আমি ওঁদের কথা দিয়েছি—এখন আর তা ফেরানো যাবে না। বিয়ে তোমাকে করতেই হবে।'

পরদিন সকালেই কেশববাবু এসে রঞ্জনকে 'আশীর্বাদ' ক'রে গেলেন। সে কী করবে? সে কী করবে? সে কি ভদ্রলোককে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দেবে, না কি ছুটে বেরিয়ে যাবে বাড়ি থেকে? কিন্তু মনে-মনে সে হাসছিলো। তামাশা, তামাশা। এ-বিয়ে হবে না, এ-বিয়ে হ'তে পারে না, হ'তেই পারে না। হাস্যকর, অবিশ্বাস্য! করুক না এরা যা খুশি। সে জানে এটা হ'তে পারে না।

সেই অকারণ অন্ধ বিশ্বাসের মোহের মধ্যে আচ্ছন্নের মতো তার দিন কাটতে লাগলো। কিছুই বললে না, কিছুই করলে না, শুধু দিনের মধ্যে লক্ষবার নিজের মনে বলতে লাগলো, 'এ হ'তে পারে না, এ হ'তে পারে না।' এখনো অনেক সময় আছে। এর মধ্যে

রীতিমতো বিয়ে

কিছু একটা ঘটবেই। যেদিক থেকেই হোক, যেমন ক'রেই হোক, ঘটবেই। ব্যাপারটা আগাগোড়া তার কাছে প্রহসনের মতো ঠেকলো। এমনকি, বন্ধুদের সঙ্গে সে হাসাহাসি করলে এ নিয়ে।

দশ

পারিবারিক

মৃণালিনী আত্মীয়-স্বজন সবাইকে চিঠি লিখলেন খবরটা জানিয়ে। একে-একে উত্তর আসতে লাগলো। তারপর সব ওলোট-পালোট হ'য়ে গেলো।

প্রথম চিঠি এলো রঞ্জনের পিসেমশাইর কাছ থেকে। তিনি বুড়ো মানুষ, বি. এ. ফেল-করা শাবেক কালের ডেপুটি। বরাত জোরে উঠেছিলেন জেলার হাকিম পর্যন্ত। প্রচুর টাকা জমিয়ে এখন পেনসন নিয়ে আছেন কলকাতায়। তিনি লিখেছেন :

'মেজ-বৌ,

তোমার চিঠি পেয়ে অবাক হলুম। হঠাৎ তাড়াহুড়ো ক'রে কেন যে একটা বিয়ে ঠিক ক'রে ফেললে বুঝতে পারলুম না। মেয়ের বংশ ও অন্যান্য বিষয়ে ভালো ক'রে খোঁজ নিয়েছো ব'লেও মনে হ'লো না। কোষ্ঠী মিলিয়েছো কিনা তাও জানি না। দেনা-পাওনার কথাও কিছু লেখোনি। তোমার একমাত্র ছেলে, আর এমন উপযুক্ত ছেলে—কত ভালো বিয়ে ওর হ'তে পারে। সোনায় ঢেকে দেবে। তুমি এখনই ছেলের বিয়ে দিতে চাও, এ-কথা যদি আমাকে জানাতে, তাহ'লে আমি অনায়াসে আমার দাদার ছোটো মেয়ের সঙ্গে ঠিক করতে পারতুম। এই তাঁর শেষ মেয়ে—তার বিয়েতে তিনি দশ হাজার

টাকা খরচ করবেন ব'লে ধ'রে রেখেছেন। আর শোভা, তোমরা তো জানো, পরমা সুন্দরী।

যা-ই হোক, তুমি যখন ঠিক ক'রেই ফেলেছো, আমরা আর কী বলবো। তবে তোমার ঠাকুর-কন্যা শিগগিরই যাচ্ছেন ঢাকায়, ইচ্ছে করলে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে পারো। আমার শুধু এই মনে হয় যে কেশববাবু তো বড়ো চাকরিই করেন, ইচ্ছে করলে তিনিও তো প্রচুর দিতে পারেন।'

রঞ্জনের কাকা, তিনি আলিপুরে মুন্সেফ, লিখেছেন :

'শ্রীচরণেষু,

মেজ বৌ-ঠাকরুন, কেশববাবুরা এখানে থাকতে আমরা তাঁদের কথা কিছু-কিছু শুনেছি। তিনি থাকতেন আমাদের পাড়াতেই। মেয়েটিকেও দেখেছি। সুন্দরী নয়। রঞ্জনের বৌ সুন্দরী না-হ'লে মানাবে কেন? তাছাড়া, মেয়ের বয়সও বেশি, কুড়ির কম তো নয়ই। এত বড়ো মেয়ে ঘরে এনে কি সুখ হবে? ওদের পরিবার সম্বন্ধেও খুব বেশি সুনামও শুনিনি—বড্ড বেশি স্বাধীন হাব-ভাব।

তুমি লিখেছো, রঞ্জনের নিজের খুব ইচ্ছে, কিন্তু ও ছেলেমানুষ, ওর ইচ্ছের কী দাম? যদি এখনো সময় থাকে, এ-বিয়ে ভেঙে দেয়াই ভালো মনে হয়। তুমি হঠাৎ আমাদের কারো সঙ্গে পরামর্শ না-ক'রে কথা দিয়ে ফেললে কেন, বুঝলাম না।'

'পুঃ—আমি কয়েকদিনের জন্য ঢাকা যাওয়াই ঠিক করলুম। তুমি একা মানুষ,—এই একটা এত বড়ো শোক পেলে—এখন তোমার একার বুদ্ধিতে কিছু করা উচিত না। আমি গিয়ে পৌঁছনো অবধি অপেক্ষা কোরো।'

হে বিজয়ী বীর

রঞ্জনের বড়-দি লিখেছে পাটনা থেকে :

'শ্রীচরণেষু,

মা, রঞ্জনের বিয়ে ঠিক করেছো শুনে খুব খুশি হলুম। বাবা নেই, এখন ও বিয়ে করলেই তোমার ঘর আবার ভরে। ওর বিয়েতে যাবার জন্য এখন থেকেই মনটা নাচছে। কিন্তু যে-রকম মানুষ তোমাদের জামাইটি, ছাড়তে চাইবে কিনা কে জানে। মা, তুমি ওঁকে নিজে একটু লিখো। যাওয়া না-হ'লে আমার যে কী কষ্ট হবে তা কী বলবো। খোকা ভালোই আছে।'

রঞ্জনের ছোড়-দি লিখেছে শিলং থেকে :

'মা, তুমি কী যে এক-একটা কাণ্ড করো, তার ঠিক নেই। মিলির সঙ্গে রঞ্জনের বিয়ে! মিলি কি কোনোদিক দিয়েই ওর যোগ্য? দোহাই তোমার, এ-বিয়ে ফিরিয়ে দাও, বলো তো আমিই ওর যোগ্য বৌ খুঁজে দিতে পারি।'

রঞ্জনের জ্যাঠ্‌তুতো দাদা রানীগঞ্জে ইঞ্জিনিয়ার। নিজের কাজ ছাড়া আর কোনো বিষয়েই তাঁর খেয়াল নেই। তাই তাঁর স্ত্রী জবাব দিয়েছেন চিঠির :

'শ্রীচরণেষু,

মেজ কাকিমা, কেশববাবুদের সম্বন্ধে সব খবরই আমি জানি। কয়েক বছর আগে তিনি দানাপুরে এক হাসপাতালে কাজ করতেন বাবার সঙ্গে। কিন্তু আপনি ছেলের বিয়ে ঠিক করেছেন—আপনি কিছুই জানেন ব'লে তো মনে হচ্ছে না। ওঁদের বাড়ি যে চট্টগ্রাম জেলায়, তাও কি আপনি জানেন না? চাটগাঁর অনার্যের সঙ্গে

নবীনগঞ্জের ব্রাহ্মণের বিয়ে! লোকে তো ওদের ভদ্রতা ক'রে ব্রাহ্মণ বলে! আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? একমাত্র ছেলে আপনার—বংশটাকে এমনি ক'রে নষ্ট করবেন? আমি ঠিক জানি, মেজকাকা বেঁচে থাকলে এ-বিয়ে হ'তে পারতো না। তাঁর আত্মাকে এমনি ক'রে কষ্ট দেবেন?'

শেষের এই চিঠিটাই মৃণালিনীকে কাতর ক'রে দিলে। তাঁর আত্মাকে কষ্ট! তিনি যেন স্পষ্ট অনুভব করলেন, তাঁর স্বর্গস্থ স্বামী অব্যক্ত কষ্টের মূক তিরস্কারে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন। বিছানায় শুয়ে-শুয়ে অনেকক্ষণ কাঁদলেন তিনি। না, এটা হ'তে পারে না—এটা হবার নয়। কিন্তু রঞ্জনকে কিছু বলতে সাহস পেলেন না তিনি। অপেক্ষা করলেন।

দু-দিন বাদেই এলেন সুখময়, রঞ্জনের কাকা। রোগা মানুষ। মাথার চুল পাৎলা হ'য়ে আসছে। খুব আস্তে-আস্তে কথা বলেন।

রঞ্জনের পিসিমা সুদক্ষিণা এসে উঠেছিলেন তাঁর এক দেওর-পোর বাড়ি। বিকেলবেলা তিনিও এলেন। বিশাল বপু। অতি কষ্টে চলাফেরা করেন, শরীরের ভার নিয়ে। এবং সেই অনুপাতেই ভারি তাঁর গলার নিরেট সোনার হার। শাড়িটা তাঁকে চেপে ধ'রে রাখতে রীতিমতো হাঁপিয়ে উঠছে।

আর এলো রঞ্জনের মেজদি কমলা। ঢাকাতেই থাকে সে। বোনেদের মধ্যে তারই একটু গরিব ঘরে বিয়ে হয়েছে।

রঞ্জনের ডাক পড়লো সেই জ্ঞাতিসভায়। সুখময় কথা আরম্ভ করলেন: 'ছাখো, রঞ্জন, তোমার বাবার অবর্তমানে আমরাই এখন তোমার অভিভাবক।'

রঞ্জন বললে, 'নিশ্চয়ই।'

'তবে এ-কথাও ঠিক যে তুমি সাবালক হয়েছো। তুমি শিক্ষিত, বুদ্ধিমান। কারো মুখাপেক্ষীও তুমি নও, তুমি স্বাধীনভাবে কিছু করতে গেলে কেউ তোমাকে বাধা দিতে পারে না।'

'সে তো সত্যি।'

'তবে তোমার কাছে এটুকু আমরা আশা করি যে আমাদের একেবারে জিগেস না-ক'রে তুমি কিছু করবে না। আমরা যা করবো, যা বলবো, তা তোমারই ভালোর জন্যে। তোমার ভালো ছাড়া আর-কিছু আমরা চাই না। এটা তুমি বিশ্বাস করো তে?'

'নিশ্চয়ই!'

'আর এটাও সত্য যে তোমার ভালো যাঁরা কামনা করেন, তাঁদের মনে কষ্ট দিলে শেষ পর্যন্ত তোমারও ভালো হবে না।'

'তোমার বাবার আত্মাকে কষ্ট দিলেও তোমার অমঙ্গল,' বললেন মৃণালিনী।

'তোমার বাবার আত্মাকে কষ্ট দিলেও মঙ্গল হবে না তোমার,' সুখময় প্রতিধ্বনি করলেন। 'তোমার বাবার ইচ্ছা স্মরণে রেখেই সব সময় তোমার চলা উচিত। তিনি বেঁচে থাকলে যাতে দুঃখ পেতেন, এমন কাজ কি তুমি করতে পারো?'

আঃ, এরা সবাই এসেছে তাকে জোর ক'রে এ-বিয়েতে ঠেলে দিতে, এদের ইচ্ছার চাপে তাকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিতে। ঠেসে ধরেছে তাকে চারিদিক থেকে, এদের জ্ঞাতিত্বের দাবি পাথরের মতো চেপে

আছে তার বুকের উপর। রক্তের সম্পর্কে এরা সংঘবদ্ধ, পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠায় এরা নিষ্ঠুর; এরা সংহতিতে পরাক্রান্ত, এরা ভীষণ। আতঙ্কিত চোখে রঞ্জন এর মুখ থেকে ওর মুখের দিকে তাকালো। কোনো করুণা নেই কারো চোখে। শাদা দেয়ালের মতো সব মুখ। এরা এসেছে এদের গোষ্ঠীগত শক্তির অন্ধতায় তাকে ব্যাহত করতে, মিলির সঙ্গে তার বিয়ে দেবার জন্য শরণ নিচ্ছে তার বাবার আত্মার —কোনো সন্দেহ নেই এদের, যে সেই আত্মা তাদেরই দলভুক্ত। হাঃ! তামাশা বটে! এরা জানে না, এরা তো জানে না যে তা হ'তে পারে না—তার সমস্ত মৃত পিতৃগণের আত্মিক শক্তি একত্র করলেও তা কখনো ঘটানো যাবে না।

'কিন্তু হয়েছে কী?' কারো মুখের দিকে না-তাকিয়ে রঞ্জন জিগেস করলে।

'তোমার বিয়ের বিষয়ে—' সুখময় আরম্ভ করলেন।

তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সুদক্ষিণা ব'লে উঠলেন, 'কেশববাবুর মেয়ের সঙ্গে তোমার—'

'আঃ, তুমি থামো দিদি, আমাকে বলতে দাও। শোনো রঞ্জন, এটা তুমি জেনো যে অন্তত আমার মতামত খুবই উদার। কোনো সেকেলে সংস্কার আমার নেই। আজকাল যে ছেলেরা নিজেরা দেখে-শুনে বিয়ে করছে, এটা আমার ভালোই লাগে। ছেলেরা আজকাল যে-বয়সে বিয়ে করে, তাতে তা-ই তো হওয়া উচিত। আমি, এমন কি, অসবর্ণ বিবাহ পর্যন্ত সমর্থন করি। আস্তে-আস্তে দেশে তা চ'লে যাচ্ছে —আরো চলবে। তাছাড়া উপায় কী আজকাল? তোমার ইচ্ছায়

বাধা দেয়া আমাদেরও ইচ্ছে নয়। তোমার নিজের বুদ্ধি হয়েছে, যথেষ্ট শিক্ষা পেয়েছ, তুমি যেমন ভালো বোঝো করবে। কিন্তু আমরা তোমার স্বজন। কিছু করবার আগে আমাদের অনুমতি তুমি চাইবে, এটুকু আমরা আশা করি এখনো। তোমার মা-র মনে ব্যথা দিয়ে তুমি কিছু করবে না, এটাও আশা করা অন্যায় নয়। তুমি আমাদের বংশের গৌরব। তোমার জন্য আমাদের সকলের ভাবনা। তোমার ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল ব'লে আমরা কল্পনা করি। তোমার যাতে জীবনে প্রতিষ্ঠা হয়, তা-ই আমাদের চেষ্টা। বিবাহ জীবনের একটা প্রধান ঘটনা। ব্যক্তিগত সুখ ছাড়াও, তা থেকে আনুসঙ্গিক মঙ্গল হ'তে পারে। পণ-প্রথার আমি বিরোধী; কিন্তু অনেকে আছেন, যাঁরা দিতে ইচ্ছুক, উৎসুক। দিতে তাঁরা পারেনও। জানি না তুমি এ-সব কথা ভেবে দেখেছো কিনা। তুমি বলতে পারো তোমার অর্থের অভাব নেই। কিন্তু তুমি ছেলেমানুষ। কিছুকাল পরে তুমি বুঝবে যে অর্থের অভাব সব সময়ই আছে। আর তাছাড়া—'

সুখময় দম নেবার জন্য থামলেন। সেই ফাঁকে রঞ্জন বললে, 'কিন্তু—'

হাত তুলে বাধা দিলেন সুখময়।—'থামো। আমাকে শেষ করতে দাও, তারপর তোমার যা বলবার আছে বোলো। তোমার কথা শোনবার জন্যই আমরা আজ এখানে এসেছি। যা বলছিলাম—এ-প্রসঙ্গে অন্যান্য কথাও ভাববার আছে। অনেক সময় এমন হয় যে আমরা খুব প্রত্যক্ষ-ভাবে যাকে দেখতে পাই, তাকেই সবচেয়ে ভালো মনে হয়। তুলনা করবার কথা মনে ওঠে না। তারই মতো কি তার চেয়েও ভালো যে

অনেকে আছে কি থাকতে পারে, তা ভুলে যাই। সান্নিধ্যজনিত মোহ জন্মায়। সেটা কাটিয়ে ওঠা সহজ হয় না।'

'কিন্তু একটা কথা—' রঞ্জন আর-একবার চেষ্টা করলে।

'একটু অপেক্ষা করো, আমি শেষ ক'রে নিই। তুমি এখন বিয়ে করো, এটা আমরা সবাই চাই। আমাদের পক্ষে সেটা পরম আনন্দের কথা। আর, তোমার স্ত্রী সর্বসুলক্ষণসম্পন্না সুন্দরী হোক, এই আমাদের একমাত্র কামনা। তোমার জন্য বাংলা দেশের একটি শ্রেষ্ঠ মেয়ে আমরা খুঁজে দেবো—তুমি যদি বলো। তোমার সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে পারলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করবে অনেকেই। আমার মনে হয়, তুমি নিজের মূল্য ঠিক বুঝছো না। সেইজন্য হাতের কাছে যা পাচ্ছো তারই জন্য তোমার এত আগ্রহ।'

'কিন্তু আমি তো—'

'আর-একটু, আর-একটু। আমার হ'য়ে এসেছে। কেশববাবুর মেয়েটি সুশ্রী, কিন্তু সুন্দরী নয়। তাছাড়া সে প্রায় তোমার সমবয়সী হবে। স্ত্রীলোকের যৌবন বড়ো ক্ষণস্থায়ী। সে তার শ্রেষ্ঠ বছরগুলো পার হ'য়ে এসেছে এর মধ্যেই। আর পুরুষ তো স্ত্রীলোকের যৌবনকেই বিয়ে করে—প্রথমে তো তা-ই। তার উপর মেয়েটির সম্বন্ধে আমাদের ধারণাও খুব ভালো নয়। তুমি বলতে পারো, ও-সব পাঁচজনের বাজে কথা, কিন্তু আরো তো কত মেয়ে আছে, যাদের সম্বন্ধে পাঁচজন কিছু বলে না। রঞ্জন, আমাদের বংশে অনেক খুঁজে, অনেক বেছে একেবারে নিখুঁত, সর্বাঙ্গসুন্দর বিবাহের রীতি প্রচলিত। তোমার কাকিমার সঙ্গে বিয়ে হবার আগে আমার প্রায় তিন বছর ধ'রে কথাবার্তা চলেছিলো।

নানা জায়গায়। রঞ্জন, তুমি তাড়াতাড়ি কোরো না, তুমি ভেবে ছাখো। এ ছাড়া আমার কিছু বলবার নেই। এখন তুমি বলো, কেন তুমি প্রমীলাকে বিয়ে করতে চাও।'

'কিন্তু আমি তো তা চাই না,' এতক্ষণে রঞ্জন বলতে পারলো।

'আমরা তো শুনেছি,' সুদক্ষিণা শানানো গলায় বললেন, 'যে তুমি এ-মেয়েকে বিয়ে করার জন্য খেপে গেছো।'

'আস্তে দিদি, আস্তে। রঞ্জন, তোমার মা লিখেছিলেন যে তোমারই এ-বিয়েতে ইচ্ছে, সেইজন্যেই তিনি এটা ঠিক করছেন। নয়তো তাঁর নিজের যে খুব আগ্রহ আছে, তা নয়। এমন ভালো মা সংসারে কারো হয় না।'

'মা কেমন ক'রে জানলেন আমার মনের কথা?'

'জেনেছেন নিশ্চয়ই। তোমারই সুখের জন্য তিনি এত সব করলেন, আর তুমি যদি উল্টে তাঁর উপর দোষ চাপাও, সেটা বড়ো অন্যায় হয়।'

'হ্যাঁ—ওরই তো ইচ্ছে,' সুদক্ষিণা বললেন, 'কে না জানে যে ওরই ইচ্ছে! ছেলেমানুষ—ফাঁদে পা দিয়েছে আর কি—। বোকা!'

'এ-কথা মনে করবার কোনো কারণ নেই যে—'

'এ-কথা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না যে তোমার মা তোমার মনের ভাব না-জেনেই এতদূর এগিয়ে গেছেন। আর তোমার ইচ্ছে ছাড়া তো আর-কোনো কারণই ছিলো না। তোমার মা নিজের গরজে প্রমীলাকে ঘরে আনতে চাইবেন, এ-কথা অবিশ্বাস্য। আমরা তোমার আপন জন, রঞ্জন: আমাদের কাছে তুমি মনের কথা গোপন কোরো না।'

'আমি তো তা-ই বলছিলুম—'

'ওঁরাও তো কম সাংঘাতিক লোক নন,' সুদক্ষিণা ব'লে উঠলেন, 'দিব্যি চুপে-চুপে ছেলেকে পটিয়েছেন!' 'আচ্ছা, আচ্ছা,' কমলা এই প্রথম কথা বললে, 'রঞ্জন কী বলছে বলতে দাও না ওকে।' তিন বোনের মধ্যে কমলাই রঞ্জনের প্রিয় ছিলো বরাবর। মেজদি বুঝবে, যদি কেউ বোঝে। রঞ্জন তার দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চেয়ে বললো, 'তুমি এঁদের বুঝিয়ে বলো তো, মেজদি—'

'বোঝাবার আর কী আছে', সুদক্ষিণার স্বর বেজে উঠলো, ছুরির মতো ধারালো, 'সবই বুঝি আমরা। তুমি একটা গাধা—ওরা নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে তোমায়। তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে। তা যদি না হ'তো, কোথাকার চট্টগ্রামের এক মগের মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা তুমি ভাবতে পারতে না।'

কমলা বললে, 'মিছিমিছি ভদ্রলোকদের নামে গালমন্দ ক'রে লাভ কী, পিসিমা? তোমার তো কোনো ক্ষতি করেননি তাঁরা।'

'ইশ, বড়ো যে আদিখ্যেতা!' একটু মিষ্টি ক'রে টেনে-টেনে সুদক্ষিণা বললেন, 'তা তো হবেই কমলা! বিদ্যঘরের চাটুয্যেদের বৌ না তুমি? তোমার শ্বশুরের জ্যাঠার শূদ্রানির সঙ্গে সেই ব্যাপারটার কথা কে না জানে? কী না জানি তোমার শ্বশুর-কুলের কীর্তি।'

কমলার মুখ ছাইয়ের মতো হ'য়ে গেলো। রঞ্জন ব্যাকুল স্বরে ব'লে উঠলো, 'তুমি যাও, মেজদি, এখান থেকে চ'লে যাও।'

কিন্তু কমলা উঠলো না। কপালে একবার হাত বুলিয়ে আস্তে-আস্তে বললে, 'এ-সব বাজে কথা ব'লে লাভ কী! মা, তুমি এক কথায় বলো এ-বিয়েতে তোমার মত আছে কি নেই।'

'মতের কথা ওঠেই না,' সুদক্ষিণা ব'লে উঠলেন, 'যাদের কুলের কোনো ঠিকঠিকানা নেই—রঞ্জনের বাপ যদি আজ থাকতো, তাঁর কাছে এ-কথা তুলতে কেউ সাহস পেতে তোমবা! আর সে নেই ব'লেই যা খুশি তা-ই করবে—আমি তো তা হ'তে দিতে পারি না!'

'মা, বলো!' কমলা মা-র মুখের দিকে তাকালো।

মৃণালিনী বললেন, 'আমি কী বুঝি বল? আমার শরীর ভালো নেই, আমার মন অবসন্ন। ঠাকুর-ঝি—ঠাকুর-পো—তোমরা পাঁচজনে মিলে যা ভালো বোঝো তা-ই করো।' বলতে-বলতে তিনি আঁচলে চোখ মুছলেন।

'কিন্তু মা, তুমি যে ওঁদের কথা দিয়েছো!' ব'লে উঠলো কমলা।

'তাতে কিছু এসে যায় না,' সুখময় অনেকক্ষণ পর কথা বললেন। 'যদি বিয়ে না হবার হয়—হবে না! এমন কত হ'য়ে থাকে! বিয়ের তারিখের আগের দিনও কত ভেঙে যায়। কিন্তু হঠাৎ কিছু ঠিক ক'রে ফেলা কাজের কথা নয়। ভাবতে হবে—'

'ভাববার আর কী আছে এতে,' সুদক্ষিণা বললেন, 'এ-বিয়ে হ'তে পারে না, এ তো সোজা কথা। যারা কৌশলে ছেলে পাকড়ায়, তাদের কথা দেয়ারই বা মূল্য কী? কী করবে ওরা, শুনি? ভেবেছিলো খুব একটা বাজিমাৎ করলে—এখন মরুক কপাল চাপড়ে। কুলে শীলে ধনে মানে এমন ছেলে পাওয়া কি আর মুখের কথা! মেজ-বৌ, তুমি আমাকে বলো, আমি কালই আমার বড়-জাকে চিঠি লিখে দিচ্ছি—মুখের কথাটি খসালে এক্ষুনি তাঁরা সব ঠিক ক'রে ফেলেন।'

'কী বলো, বৌঠান?' সুখময় তাকালেন মৃণালিনীর দিকে।

'আমি আর কী বলবো!' মৃণালিনী ক্লান্ত স্বরে বললেন, 'বলেছি তো, তোমরা যা ভালো বোঝো তা-ই করো।'

'শোনো, রঞ্জন'---এবার সুখময় চোখ দিয়ে বিঁধলেন রঞ্জনকে।

'এটা তুমি ঠিক জেনো,' ধীর, সুদৃঢ় স্বরে বলতে লাগলেন সুখময়, 'যে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে আমরা সত্যি চাই না। তুমি যদি সত্যি স্থির ক'রে থাকো যে এ-বিয়ে করবে, তাহ'লে করো। তোমার যদি মনে হয়, এ-বিয়েতেই তুমি সুখী হবে, এ-বিয়ে না-করলে কিছুতেই সুখী হবে না, তাহ'লে করো। এমন যদি হয় যে ন্যায়ত তুমি ও-বিয়ে করতে বাধ্য, তাহ'লে করো। এমন কোনো কারণ যদি ঘ'টে থাকে যে-জন্য এ-বিয়ে তোমার না-ক'রে কোনো উপায় নেই, তাহ'লে করো। কিন্তু যদি তা না হয়, যদি তুমি মনে করো যে এ-বিয়ে তোমার না-করলেও চলে, যদি কোনোরকম বাধ্যতা না থাকে, যদি বিশেষ কোনো কারণ না ঘ'টে থাকে; যদি এমন মনে হয় যে, অন্য-কোনো মেয়েকে বিয়ে করলেও তুমি সুখী হ'তে পারবে, তাহ'লে তুমি এ-বিয়ে কোরো না। কারণ এতে আমাদের কারোরই অন্তরের সায় নেই; এতে তোমার স্বর্গত পিতার আত্মার অসন্তোষ সাধন করবে। আমাদের যা বলবার বললাম, এখন তুমি ভেবে-চিন্তে জবাব দাও।'

ব'লে সুখময় চুপ করলেন। রঞ্জন খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো নির্বোধের মতো। তারপর ক্ষীণ হাসি ফুটলো তার মুখে। বললে, 'আঃ।' আর-কিছু বললে না। আস্তে আস্তে উঠে চ'লে গেলো উপরে তার শোবার ঘরে। শুয়ে পড়লো বিছানায়, শুয়েই ঘুমিয়ে পড়লো। গাঢ় সে-ঘুম, শিশুর ঘুমের মতো। এখন আর কেউ তার কিছু করতে পারে না।

পরের দিন মৃণালিনী চিঠি লিখে পাঠালেন প্রমীলার মা-কে: 'আত্মীয়দের মত হ'লো না এ-বিয়েতে। রঞ্জনের বাবার অবর্তমানে তাঁরাই ওর অভিভাবক। তাঁদের কথা ঠেলতে পারি না কিছুতেই। আমাকে ক্ষমা করবেন।'

রঞ্জনকে ডেকে তিনি বললেন, 'মিলির সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'তে পারে না। কারোরই মত নেই।'

রঞ্জন চুপ। তার মুখে ফুটে উঠলো একটা অর্থহীন, নির্বোধ হাসি।

'তোমার অন্য বিয়ে ঠিক করছি শিগগিরই। প্রস্তুত থেকো।'

শিগগির! শিগগিরই—তাও কত দূরে! কত দেরি তারও! ততদিন সে অপেক্ষা করবে না। আর অপেক্ষা করবে না সে। আর দ্বিধা করবে না—এবার সে পালাবে, পালাবে অতসীকে নিয়ে, অনেক, অনেক দূরে, কোনো নির্জনে, কোনো নতুন দেশে, যেখানে কোনো চেনা মুখ নেই, যেখানে রাস্তায় বেরোলে কারো সঙ্গে কথা বলতে হয় না। আঃ, অতসীকে ছাড়া সে বাঁচবে কেমন ক'রে?

সেই দিনই বিকেলে কেশববাবু এলেন। সঙ্গে নীহার, হাতে মৃণালিনীর চিঠি। চিঠিটা রঞ্জনের সামনে রেখে তিনি জিগেস করলেন, 'এ-চিঠি তোমাকে জানিয়ে লেখা হয়েছে?'

রঞ্জন চিঠি প'ড়ে বললে, 'না।'

'তাহ'লে এ-চিঠি তুমি অস্বীকার করছো?'

'না।'

'না!' নীহার ব'লে উঠলো, 'আপনি কি বলতে চান যে বিয়ে হবে না?'

'কেমন ক'রে হবে?' গভীর শান্তির স্বরে রঞ্জন বললে।

'কেমন ক'রে! আপনারা কি খেলা পেয়েছেন নাকি?'

'তুমি থামো, নীহার,' কেশববাবু বললেন, 'আমি বলছি।'

রঞ্জন বললে, 'কী বলতে এসেছেন আপনারা?' সে যেন স্বপ্নের ভিতর থেকে কথা বলছে, ঠিকমতো বুঝতে পারছে না কিছুই। কেশববাবু তার মুখের দিকে তাকিয়ে নরম স্বরে বললেন, 'হঠাৎ কী হ'লো, বলো তো? আমাদের কি কোনো দোষ হয়েছে—না কি কেউ বলেছে কিছু?'

রঞ্জন একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, 'আপনারা কি খুবই দুঃখিত হয়েছেন?'

'তুমি বলছো কী, রঞ্জন, এ-চিঠি পাবার পর মিলির মা এখনো ভাত ছোঁননি। বলো তো কী হ'লো হঠাৎ?'

রঞ্জন কী-একটু ভাবলো, সূক্ষ্ম হাসি ফুটে উঠলো তার ঠোঁটে। নরম গলায় বললে, 'কিছু ভাববেন না আপনারা। সব ঠিক হ'য়ে যাবে।'

'তাহ'লে তুমি—?' কেশববাবুর গলা কেঁপে গেলো আগ্রহে।

'সব ঠিক হ'য়ে যাবে। আমার এক বন্ধু আছে—চমৎকার ছেলে, নতুন প্রোফেসরি পেয়েছে ইউনিভার্সিটিতে। তাকে আমি রাজি করাবো! আমার চেয়ে অনেক ভালো সে।'

কেশববাবু মূঢ়ের মতো তাকিয়ে রইলেন। নীহার ব'লে উঠলো, 'আপনি রসিকতা করছেন কিনা বুঝতে পারছি না, রঞ্জনবাবু!'

'রসিকতা?' রঞ্জন ব্যাকুলভাবে ব'লে উঠলো, 'না, না—, সত্যি বলছি। সে প্রায়ই আসে আমার এখানে, যে-কোনোদিন আপনারা তাকে দেখতে পারেন। খু-ব ভালো সে, চমৎকার!'

'কী বলছেন আপনি?' তীব্রস্বরে ব'লে উঠলো নীহার। 'আপনার কি মাথা-খারাপ হয়েছে?'

'কেন, মাথা-খারাপ কেন?'

কেশববাবু বললেন, 'তোমার হাতেই যে মেয়েকে দিতে চাই আমরা, তুমি তাকে গ্রহণ না-করলে—'

'এদিকে,' নীহার বললে, 'এদিকে শহরময় যে বিয়ের কথা রাষ্ট্র হ'য়ে গেছে। এখন আপনি দিব্যি আর-একজনের হাতে মেয়েটিকে গছিয়ে দিয়ে স'রে পড়তে চাচ্ছেন। বাঃ!'

কেশববাবু বললেন, 'যদি নিতান্ত ভুল বুঝে না থাকি, আমাদের বরাবর ধারণা হয়েছে যে মিলিকে তুমি মনে-মনে পছন্দ করেছো। মিলিরও ঝোঁক ছিলো তোমার দিকে। আমরা তাই এ-বিষয়ে এগিয়েছিলুম, অন্যকোনো চেষ্টাই করিনি। এখন তুমি যদি—'

'অত কথায় কাজ কী, বাবা,' নীহার ব'লে উঠলো, 'ওঁকে তুমি স্পষ্ট ব'লে দাও যে বিয়ে করতেই হবে।'

রঞ্জন যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে নীহারের মুখের দিকে তাকালো। 'কী বলছেন?'

'এ-বিয়ে আপনাকে করতেই হবে—বুঝেছেন? সবাই জেনে গেছে বিয়ের কথা—এখন মিলি আপনার স্ত্রীর মতোই।'

একটা ক্লিষ্ট, অসহায় ভাব ফুটে উঠলো রঞ্জনের মুখে। তার চোখের পাতা পড়লো কয়েক বার।

'তুমি ভদ্রসন্তান,' কেশববাবু আস্তে-আস্তে বলতে লাগলেন, 'তুমি উচ্চশিক্ষিত, তোমাকে আর বেশি কী বলবো? তুমি এখন বিয়ে না-

করলে কী যে বিশ্রী কাণ্ড হবে, তা তুমি কি আর বুঝতে না পারো। কিন্তু হঠাৎ তোমাদের মত বদলালোই বা কেন? এ-সব গুরুতর ব্যাপারে এমন ক্ষণে-ক্ষণে মত বদলালে কি চলে? এই তো সেদিন তোমার মা নিজের হাতে লিখে পাঠালেন—তোমারই নাকি ইচ্ছে, তোমার মা-রও আপত্তি নেই। তবে আর কী? তা-ই যদি হয়, তা-হ'লে এ-বিয়ে হ'তে পারবে না কেন? যদি তোমাদের কাছে তোমার আত্মীয়দের কথার এতই মূল্য, তাহ'লে গোড়াতেই তাঁদের জিগেস করাটা কি উচিত ছিলো না? আর তাও, তাঁদের আপত্তিটা কী যদি জানতে পারতুম, সাধ্যমতো চেষ্টা করতে পারতুম সেটা খণ্ডাতে। এমনও তো হ'তে পারে যে সে-সব আপত্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, যুক্তিহীন। আর তা'ছাড়া, তুমি তো কারো মুখাপেক্ষী নও, তুমি ইচ্ছে করলে স্বাধীনভাবে একটা কাজ করতেই বা পারবে না কেন? আত্মীয়দের সঙ্গে মনোমালিন্য চিরকাল থাকে না, কিন্তু যদি কাউকে মনে-প্রাণে আকাঙ্ক্ষা ক'রে থাকো, তাকে হারাবার ক্ষতি চিরকালের। রঞ্জন, তুমি কি তা হ'তে দেবে? তোমার পৌরুষের কি এটুকু জোর নেই যে সাহস ক'রে নিতে পারবে না—যা তুমি চাও? একটু বিরোধিতাতেই কি ভেঙে পড়বে? এ-রকম কত হয়—আরো কত হবে জীবনে। বাঁচবার এই তো আনন্দ—বিরোধ অতিক্রম ক'রে জয়ী হওয়া। পুরুষের ধর্মই তো এ-ই। রঞ্জন, আমাদের সমাজে আজকাল যে-রকম বিবাহ প্রচলিত, পুরাণে কি কখনো তার উল্লেখ পাবে? সেই আগেরা কি কখনো অন্যের কথায় বিয়ে করেছেন—কিংবা করেননি? তাঁরা ছিলেন বীর—স্ত্রীকে তাঁরা জয় করতেন—প্রকাশ্য শক্তি-পরীক্ষায়, কি বীর্যে, কি

প্রেমে। প্রকৃত বিবাহ তো তা-ই। রঞ্জন, তুমি কি শেষ পর্যন্ত ভয় পাবে, পেছিয়ে যাবে—লোকের কথায়? তোমার সত্য অধিকার নেবার যোগ্যতা কি নেই তোমার? কিন্তু আমরা তো জেনেছি যে তুমি অত ভীরু নও। আমার তো মনে হয় তোমার সংকল্প যদি বা টলে, ভেঙে পড়বে না কখনোই।'

রঞ্জন মুগ্ধ হ'য়ে শুনছিলো, শেষের কথাগুলো ভালো ক'রে শুনতেই পাচ্ছিলো না। যেন এক নেশায় ধরেছে তাকে। তার সারা শরীর এলিয়ে পড়ছে অবসাদে। আর সে ভাবতে পারে না, আর কিছু অনুভব করতে পারে না, সে আর নেই। তার মাথার দু'পাশে যেখানে নীল দুটো শিরা রক্তের চাপে টিপটিপ করছে, দু'হাত দিয়ে সেখানটা চেপে ধ'রে সে চুপ ক'রে ব'সে রইলো। হঠাৎ মনে হ'লো, তার অসম্ভব মাথা ধরেছে।

একটু পরে কেশববাবু আবার বললেন, 'তাহ'লে তুমি বলো, রঞ্জন—তুমি যা বলবে তা-ই হবে, তোমার একটি কথার উপরেই একটি মেয়ের, একটা পরিবারের সুখ দুঃখ ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।'

যেন একটা মূর্ছার ভিতর থেকে রঞ্জন উত্তর দিলে, 'আচ্ছা, তা-ই হোক।' সে কী বললো, শুনতে পেলো না নিজেই। শুধু এটা বুঝতে পারলো যে এতক্ষণে শেষ হ'লো, এতক্ষণে সে ছাড়া পেলো, বাঁচলো। আর কোনো কথা শুনতে হবে না, জবাব দিতে হবে না কোনো কথার। বাঁচলো।

এগার

পরিপূর্ণতা

'অনেক দিন দেখা নেই। কেন আসো না? কী হয়েছে? কী তোমার এত কাজ? তুমি কি বোঝো না, তুমি কি বোঝো না? একবার এসো এ-চিঠি পেয়েই, পায়ে পড়ি তোমার।'

লিখে অতসী ছিঁড়ে ফেললে। এ-চিঠি কি পাঠানো যায়? না, মনে-মনে সে যত চিঠি লিখেছে রঞ্জনকে, তার একটাও লেখা যায় না, লিখলেও পাঠানো যায় না। যদি বলবার কথা এতই আছে, তাহ'লে বলা এত কঠিন কেন? যদি প্রেম এলোই, তবে কেন এই ছেদ, কেন তা হ'তে পারে না বৃষ্টি-ধূসর শ্রাবণের অরণ্যের মতো নিরবচ্ছিন্ন? কিছুতেই যে তৃপ্তি হয় না, কী ক'রে আমি নিজেকে নিঃশেষে দিতে পারি তার কাছে? আমি যে নিজেকে লুটিয়ে দিতে পারি তার পায়ে, দিগন্তসীমায় শ্রাবণ-মেঘের মতো—আমি যে তার উপর ঝ'রে-ঝ'রে পড়তে পারি অজস্র, অফুরন্ত, নিষ্ঠুর বর্ষণে। কেন আসে না সে? কেন এসে আমাকে তুলে নিতে পারে না একটি সম্পূর্ণ ফুলের মতো তার হাতের মুঠোয়, কেন নিংড়ে নিতে পারে না আমার পরমতম আত্মার সৌরভ—কেন সে আমাকে পরিপূর্ণ, আচ্ছন্ন, বিলুপ্ত ক'রে দিতে পারে না তার প্রেমের বিদ্যুৎময় অন্ধকারে? একবার আসুক সে। আমি তার পা ঢেকে দেবো আমার এলো চুলে—আমি তার পা এনে রাখবো আমার বুকের উপর, বুকের মাঝখানে—আমি যে ম'রে যাচ্ছি কেন সে একবার আসতে পারে না?

হে বিজয়ী বীর

একটা খবর পর্যন্ত নেই। যদি সে এক লাইন লিখেও পাঠাতো—তাহ'লেও প্রতীক্ষায় মধুর হ'য়ে উঠতে পারতো অতসীর দিন আর রাত্রি। আ, প্রতীক্ষার সেই তীব্রতা, সেই তীব্রতা,—প্রতি মুহূর্তে অনুভব করা, সে আসছে, কাছে আসছে, রক্তের মধ্যে তার পদধ্বনির সুর। কিন্তু একেবারে নিঃশব্দ। একটা খবরও কি পাওয়া যায় না কোনো রকমে? কেমন আছে সে কে জানে।

সে দিন সন্ধেবেলা, সরোজ হঠাৎ চোখ তুলে তাকালো অতসীর দিকে, যেন কিছু কথা বলবে। কিন্তু অতসীই প্রথম কথা বললে: 'সরোজ, তুমি তো এখানে-ওখানে যাও শহরে—না?'

'কেন বলো তো?'

'আচ্ছা, এমন হয়নি যে তোমার দু-একবার দেখা হ'য়ে গেছে—রঞ্জনের সঙ্গে?'

'না, হয়নি তো।'

একটু চুপচাপ।

অতি মৃদুস্বরে, কুণ্ঠিতভাবে অতসী বললে, 'তুমি যদি দু-একদিনের মধ্যে খেলার মাঠের দিকে বেড়াতে যাও, ওর একটু খোঁজ নিয়ে আসতে কি খুব অসুবিধে হবে তোমার?'

সরোজ চুপ।

অতসী আবার বললে, 'পারবে একটু খোঁজ এনে দিতে? অনেক দিন আসে না—না কি কোনো অসুখই করলো? আমাদের একবার খোঁজ নেয়া তো উচিত। পারবে?'

'পারবো।'

পরিপূর্ণতা

'রাগ কোরো না আমার উপর, তোমাকে শুধু কাজের কথা বলি।'

সরোজ জবাব দিলো না, আবার চুপচাপ।

তারপর, আকাশ যখন অন্ধকার হ'য়ে এলো, অতসীর মুখ আর ভালো ক'রে দেখা যায় না, তখন সরোজ বললে, 'আজ একটা কথা শুনলুম—রঞ্জনবাবুর বিষয়ে।'

হঠাৎ অতসীর মেরুদণ্ড দিয়ে একটা দ্রুত কম্পন নেমে গেলো। 'কী?' বলতে গিয়ে গলা কেঁপে গেলো তার।

'শুনলাম তাঁর নাকি বিয়ে।'

'এ-কথা আবার কোথায় শুনলে?' অতসীর কণ্ঠস্বরে যেন প্রাণ ফিরে এলো।

'অনেকেই বলছে।'

'অনেকে তো অনেক কথাই বলে!' অতসী হালকা গলায় হেসে উঠলো।

'সত্যি নাকি—'

'তা হলোই বা,' অতসী হাসলো। 'ভালোই তো।'

আর-কিছু বললো না সরোজ। পরদিন বিকেলে সে গেলো রঞ্জনের বাড়ি। রঞ্জন তখন বন্ধুদের নিয়ে বাইরের ঘরে ব'সে। সসংকোচে সরোজ দরজার ধারে এসে দাঁড়ালো। তাকে দেখে একটু ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলো রঞ্জন। তাড়াতাড়ি উঠে এসে সরোজের কাঁধে হাত দিয়ে তাকে নিয়ে গেলো বাইরে। নিচু গলায় জিগেস করলে, 'কী খবর?'

'অতসী পাঠিয়ে দিলে আমাকে।'

অতসীর নাম উচ্চারিত হবার সঙ্গে-সঙ্গে রঞ্জনের বুকের মধ্যে

হাতুড়ির বাড়ি পড়লো। দু-বার বড়ো-বড়ো নিশ্বাস নিয়ে বললে, 'আমি—আমি এই শিগগিরই—বড্ড ব্যস্ত ছিলুম ক-দিন—' কথা শেষ করতে পারলে না।

'কিছু বলবো ওকে গিয়ে?'

'বলবেন—বলবেন যে ভালোই আছি।'

মুহূর্তের জন্য চোখোচোখি হ'লো দু-জনের। হঠাৎ রঞ্জন মুখ ফিরিয়ে নিলো, আর কিছু না ব'লে ফিরে গেলো।

সে ফিরে যেতেই অতসী জিগেস করলে, 'পেয়েছিলে ওকে?'

'হ্যাঁ, ভালোই আছে।'

অতসী একবার তার চোখের দিকে তাকালো।

'শিগগিরই আসবে বোধ হয় একদিন।'

'খুব ব্যস্ত বুঝি?'

'মনে তো হ'লো।'

'তুমি জিগেস করলে না কিছু?'

'বেশিক্ষণ ছিলুম না; অনেক লোক ছিলো ঘরে।'

'কারা?'

'আমি চিনি না তাদের।'

'তা একটু কি আর বলতে না পারতে!'

সরোজ কথা না-ব'লে অন্যদিকে চ'লে গেলো।

বাদলার সন্ধ্যা। আকাশে মেঘ ছড়ানো। হাওয়া দিচ্ছে জোরে; বৃষ্টি পড়ছে থেমে-থেমে। ঘরে ব'সে-ব'সে অতসী অশান্ত হয়ে উঠছিলো, কেবলই তার চোখ যেন জলে ভ'রে উঠতে চায়। সন্ধের আগেই

পরিপূর্ণতা

অন্ধকার নামলো। কোনো কাজ করবার নেই, কিছু ভাববার নেই, সে যেন তার জীবনের প্রান্তদেশে এসে দাঁড়িয়েছে। হিরণ্ময়ী রান্নাঘরে ব'সে লুচি ভাজছিলেন, তার গন্ধ ভেসে-ভেসে আসছে। একবার মা-র কাছে গিয়ে বসলো অতসী। তিনি বললেন, 'খাবি নাকি একখানা গরম-গরম?' 'না মা, এখন থাক,' ব'লে উঠে এলো সেখান থেকে। গেলো বারান্দায়। সেখানে বৃষ্টির ছাঁট। এলো ঘরে, সেখানে অন্ধকার। কোনোখানে যেন আর-কিছু নেই—এই মেঘের ধূসরতা আর বৃষ্টি ছাড়া আর-কিছু নেই। সমস্ত সৃষ্টি চাপা পড়েছে তার নিচে। সময় থেমে গেছে।

আবার সে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। ভিজতে-ভিজতে একটি ছোটোখাটো মানুষের আবির্ভাব—ডাক-পিওন। ছাতা আর ছেঁড়া বর্ষাতিতে জড়োসড়ো লোকটা যেন কেমন দেখতে। মা গো, অতসীর বুকের ভিতরটা হঠাৎ কেমন ক'রে উঠলো।

পুরু খামের একটা চিঠি। অতসী তুলে দেখলে—তারই নাম লেখা। হঠাৎ তার হৃৎস্পন্দন যেন থেমে গেলো। একটু স্থির হ'য়ে সে ছিঁড়লো খামটা। তারপর সেই অতি ক্ষীণ আলোয় পড়লো:

'আমাকে ক্ষমা করো। যা হয়তো শুনেছো কি শিগগিরই শুনবে, তা সত্যি। আমাকে ক্ষমা করো—এ ছাড়া আর কিছুই আমার বলবার নেই।

সঙ্গে যেটা পাঠালুম সেটা যদি তোমার কোনো কাজে লাগে, নিজেকে ধন্য মনে করবো।'

হে বিজয়ী বীর

চিঠির সঙ্গে আটকানো একটা সবুজ ইম্পিরিয়ল ব্যাঙ্কের চেক—সেটার তলার দিকে গোটা তিনেক শূন্য অতসীর চোখে পড়লো। চিঠিটা হাতে নিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইলো, মৃত্যুর মতো স্তব্ধ।

তারপর হঠাৎ তার বুকের মধ্যে এক উদ্দাম, উন্মত্ত, ভয়ংকর বাসনা লাফ দিয়ে উঠলো—রঞ্জনের জন্য। ব্যথায় টনটন ক'রে উঠলো তার সমস্ত বুক, বাসনার হিংস্রতায়। আঃ, রঞ্জন, রঞ্জন, তুমি আমার, তুমি আমার। আমাকে ছেড়ে কোথায় যাবে তুমি? আমি তোমাকে ভ'রে রাখবো নিজের মধ্যে—আমি পূর্ণ ক'রে নেবো তোমাকে, সম্পূর্ণ ক'রে। কোথায় মুক্তি তোমার? আমি আমার দু-হাত দিয়ে, আমার সমস্ত জীবন দিয়ে তোমাকে আঁকড়ে ধ'রে থাকবো—যতক্ষণ না রহস্যের সর্বশেষ আবরণ উন্মোচিত হয়, যতক্ষণ না মৃত্যুর অন্তিম সীমায় সমস্ত বিশ্ব আলোময় হ'য়ে ওঠে।

চিঠিটা খ'সে প'ড়ে গেলো অতসীর হাত থেকে। কী সুন্দর তুমি রঞ্জন, কী রহস্য তোমার শরীরে! সেই শরীর আমার, আমি তা নেবো। অতসীর তাকে স্পর্শ করতে হবে এই মুহূর্তে, নয়তো সে বাঁচবে না। তাকে স্পর্শ করা, তাকে অনুভব করা—উত্তপ্ত সংস্পর্শে তার সঙ্গে এক হ'য়ে যাওয়া। আ—! সমস্ত জীবন দিয়ে দিলেও এ-বাসনার তৃপ্তি নেই। এই শরীরে, শরীরের এই জীবনে কতো আর ভালোবাসার ক্ষমতা! জীবনকে দু-হাতে তুলে নিয়ে ভেঙে ফেলো, জীবনের কেন্দ্রস্থলে, রঞ্জনের সেই সুন্দর, নরম গলার উপর দু-হাত চেপে ধ'রে আস্তে-আস্তে নিঃশেষে নিংড়ে তাকে শেষ ক'রে দাও। সে-ই তো চরম। একবার অতসীর সে-ইচ্ছে হয়েছিলো, কিন্তু তখন সে

তা পারে নি, তখনও সে তাকে যথেষ্ট ভালোবাসেনি। কিন্তু এখন—এখন তাকে তা করতেই হবে। রঞ্জনকে হত্যা করতেই হবে—নয়তো এত ভালোবাসা সে সইবে কেমন ক'রে?

আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাস্তায় বেরোলো অতসী। বৃষ্টি। বৃষ্টির ফোঁটা পড়লো তার মুখে, সূক্ষ্ম সূচীমুখের মতো। অতি সূক্ষ্ম কোনো আদরের মতো, তার মুখের উপর। মুখটি সে তুলে ধরলো বৃষ্টির কাছে। তার মুখ, তার সূক্ষ্মাগ্র ক্ষুদ্র বক্ষদুটি—অঞ্জলির মতো কোনো নামহীন দেবতার কাছে। বৃষ্টি পড়ুক, বৃষ্টি পড়ুক তার সমস্ত শরীরে। এমন সূক্ষ্ম, এমন তীব্র-মধুর স্পর্শ—অতসীর চোখ ফেটে তপ্ত অশ্রু বেরিয়ে এলো। অন্ধ হ'য়ে গেলো দৃষ্টি। দৃষ্টিহীন, সে এগিয়ে চললো সেই অন্ধকারের ভিতর দিয়ে।

হাওয়ার জোর বাড়লো, ঝড় উঠলো আশ্বিনের। সে ভিজে গেছে শাড়ি-জামা পেরিয়ে চামড়া পর্যন্ত। শীত ঠেলে উঠছে তার হাড় থেকে। কিন্তু তাতে কী। এই তো সে চলছে, নির্জন, অন্ধকার প্রান্তরের উপর দিয়ে। ভয় নেই তার, কোনো ভয় নেই। সে ঠিক যেতে পারবে পথ চিনে। সে জানে তার পথের শেষ। তার আত্মা নিজেকে আনন্দে মেলে দিয়েছে এই হাওয়ায়, নিশানের মতো। এই তো শ্রেষ্ঠ অভিসার—চরম মিলনের, চিরন্তন পূর্ণতার উদ্দেশে এই যাত্রা। কাছে এলো সেই মিলন। এখনই সে রঞ্জনকে পাবে তার দু-হাতের মধ্যে, স্পর্শ করবে তার শরীর, এখনই সে তার গলা আঁকড়ে ধরবে নির্মম, নিঃশেষ আলিঙ্গনে—আঁকড়ে ধরবে দু-হাত দিয়ে, দু-হাত দিয়ে তার বাসনার স্বর্ণফল, যতক্ষণ না তাকে নিষ্কাশিত ক'রে তার সেই দুর্লভ

ঐশ্বর্যময় প্রাণটিকে দু-হাতের মধ্যে অঞ্জলি ভ'রে তুলতে পারে, শেষ বিন্দু পর্যন্ত, শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো অতসী। সামনে রেল-লাইন। সে কোন পথে এলো? না, ঠিক আছে, ঐ তো ইউনিভার্সিটির লম্বা শাদা অস্পষ্ট আভাস। ঠিক এসেছে সে,—আর-একটু পরেই—আঃ! রঞ্জন, আমি যে তোমাকে এত ভালোবাসি, তা আমিও কখনো জানতুম না। তোমার আকাঙ্ক্ষায় আমি চূর্ণ হ'য়ে গেলুম যে। তুমি আমার, তুমি আমার। চিরকালের জন্য তোমাকে আমি আমার করবো। কিন্তু ওটা কী—ঐ যে দূরে সবুজ আলো আকাশের নিচে? গুমগুম শোনা যাচ্ছে না হাওয়া? ট্রেন! অতসী একটু থামলো—গাড়িটা কাছে আসছে—চ'লে যাক।

অন্ধকারকে বিদীর্ণ ক'রে এগিয়ে এলো আলো। হাওয়ার চীৎকার ছাপিয়ে লৌহগর্জন মুখর ক'রে তুললো প্রান্তর। মুগ্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো অতসী। এই আলো সে দেখেছিলো রঞ্জনের প্রেমের অন্ধকার থেকে, এই শব্দ তাদের হৃদয়ে তুলেছিলো প্রতিধ্বনি—সেই রাত্রে। সে-রাত্রে এই রেলগাড়ি চ'লে গিয়েছিলো তাদের বুকের উপর দিয়ে—তারা ম'রে গিয়েছিলো। কেন তারা আবার বাঁচলো? সেই রাত্রি কেন চিরকাল হ'লো না? সেই মুহূর্ত কেন মিশে গেলো না মৃত্যুর সঙ্গে? কিন্তু সেই রাত্রিই তো আবার এসেছে আকাশ ভ'রে, তার আত্মাকে পরিপূর্ণ ক'রে—সেই তো গুরুগুরু ধ্বনি তার বুকের মধ্যে, সেই তো বিশাল, উন্মাদ জন্তু ঝাঁপিয়ে পড়ছে তার বুকের উপরে। কাছে, আরো কাছে। রঞ্জন, রঞ্জন, রঞ্জন, কী ক'রে তুমি

পরিপূর্ণতা

আমাকে এত ভালোবাসতে পারলে? অন্ধকারের সমুদ্র দুলে উঠলো চারদিক থেকে, তরঙ্গে-তরঙ্গে চিরকালের অশ্রান্ত কল্লোল। আর আমি একে শেষ হ'তে দেবো না। এই শেষ হোক, তোমার রহস্যের মধ্যে এই শেষ নিমজ্জন। আমি ঝাঁপ দেবো। এই অন্ধকারে, সময়হীন অন্তহীন এই অসীমের বুকের মাঝখানে।

অতসী ঝাঁপ দিলো।